কবিশেখর কালিদাস রায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ও রি য়ে ণ্ট বু ক কো ম্পা নি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২ কলিকাতা ১২

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ-কবিতা প্রকাশিত হল। আগে প্রকাশিত আহরণ, আহরণী, সন্ধ্যামণি, দন্তরুচি কৌমুদী ও বর্তমান গ্রন্থকে একত্রে কবিশেখরের কাব্য-সংগ্রহ রূপ গ্রহণ করলে অন্যায় হবে না। সামান্য কিছু-সংখ্যক কবিতা বাদ পড়লে বুঝতে হবে যে কবি সেগুলো সংগ্রহযোগ্য মনে করেন না। প্রবীণ কবিদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ-কবিতা প্রকাশ করেছেন। সে-সব নির্বাচনমূলক, কবির পছন্দমত নির্বাচিত কবিতার সমষ্টি। কবি-শেখরের শ্রেষ্ঠ-কবিতা অন্য রীতিতে সঙ্কলিত। ১৯২০ সালের আগে লিখিত কবিতা যেমন এতে আছে তেমনি আছে একেবারে আধুনিক কালে লিখিত। এর সুবিধা এই যে গত পঞ্চাশ বছরের কবিতার পরিচয় অল্প আয়তনের মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ কবিতাটি লিখিত তার উল্লেখ না থাকায় পাঠকের পক্ষে কালানুক্রমিকতা অনুসরণ সব সময়ে সম্ভব নয়। সংগ্রহ-গ্রন্থে কবিতা-বিন্যাসের দুটি নিয়ম সম্ভব, কালানুক্রমিক বা বিষয়ানুক্রমিক, তবে সব ক্ষেত্রেই কবিতা রচনার সময়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে, হয় কালানুক্রমে নয় বিষয়ানুক্রমে কবিতাগুলি বিন্যস্ত হবে।

কবিশেখর পঞ্চাশ বছরের উপর কবিতা লিখছেন। তাঁর অনেক কবিতা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পাঠক-সমাজের সম্মুখে আছে এবং আদরণীয় হয়েই আছে। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনের যুগে এ কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে এই সব কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কিন্তু কবিশেখরের সম্বন্ধে আমাদের অনুযোগ এই যে স্থায়িত্বলাভের একটি সহজ পন্থা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য এমন একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়নি যাতে তাঁর এক বা একাধিক কবিতা নেই। এর ফল হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পাঠ্যপুস্তকের কবিরূপে পরিচিত। পাঠ্যপুস্তকে কবিতার স্থানলাভ যে অগৌরবের এমন বলি না, কিন্তু যখন সেটাই প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তখন চূড়ান্ত বিচারে কবিখ্যাতির অন্তরায় ঘটে। পাঠ্যপুস্তকের উপরে নির্ভর না করে যদি কিছুকাল অপেক্ষা করতেন, তবে যে-আসন আজ লাভ করেছেন তার চেয়ে নীচুতে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হত না নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের

কবিতা যখন পাঠ্যপুস্তকে সঙ্কলনযোগ্য বিবেচিত হত না, তখনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠকসমাজে সক্রিয় আগ্রহ ছিল, অনেক সময়ে সে আগ্রহ আস্তিন গুটানো হাতাহাতিতে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী কাল তাঁকে এমন সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, জল ও হাওয়ার মত জীবনধারণের নিত্য উপাদানে তিনি পরিণত হয়েছেন যে, সেটা অনেক সময় আগ্রহের অভাব বলেই মনে হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কিছু প্রভেদ আছে। বিদ্যালয়ের কিশোর মন বিনা বিচারে স্বীকার করে নেয় আর সেই সহজ স্বীকৃতির সংস্কার পরবর্তী কালে কবিকে গভীর ভাবে গ্রহণের অন্তরায়ে পরিণত হয়। অথচ কবিশেখরের কবিতায় এমন ভাবের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও হাসির তির্যক ছটা আছে যে পরিণত মনের গ্রহণযোগ্য বিষয়। কবিশেখর সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজ যদি যথেষ্ট সচেতন না হয়ে থাকে, তাঁকে যদি যথোচিত স্পৃহণীয় আসন না দিয়ে থাকে, তবে সে দায়িত্ব অনেক পরিমাণে স্বয়ং কবিকেই বহন করতে হবে। আমাদের অনুযোগের কারণ এই যে বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে সাহিত্যসমাজে প্রবেশ করবার সহজ পন্থা বেছে নিয়ে কবি নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, সেই সঙ্গে বাংলা কাব্যের প্রতিও। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে যে কয়জন major কবির উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে কবিশেখর তাঁদের অন্যতম।

নব্য বাংলাসাহিত্যে great বা মহাকবি দুজন, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অনেকেই major কবি, minor কবির সংখ্যা আরও বেশি। যখনই কোন কবিকে major কবি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখনি বুঝতে হবে যে তাঁর মধ্যে কিছু স্বকীয়তা আছে, সমকালীন মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বকীয়তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদন-প্রভাবিত, তাই বলে তাঁদের স্বকীয়তা লোপ পায়নি, পথ কেটে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের সকলেই রবীন্দ্র-প্রভাবিত। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম—এমন আরও অনেক নাম করা যেতে পারে। কবিশেখরও রবীন্দ্র-প্রভাবিত, তৎসত্ত্বেও তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট। এই স্বকীয়তা কী এবং কোথায় দেখিয়ে দেওয়াই সমালোচকের কাজ, সকলকে একসাপটা রবীন্দ্রানুসারী বলে যৌথভাবে সমাধিস্থ করলে সহজ সমাধান হয় বটে, কিন্তু সে তো মুর্দাফরাসের কাজ। কবিশেখর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়েও যে রবীন্দ্রানুসারী নন, তাঁরও যে একটি অনতিদীর্ঘ কক্ষপথ আছে সেটাই দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

মহাকবিরা Poetic diction তৈরি করে নেন, সেই শব্দসম্ভার তাঁদের প্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশ করে। আবার অনেক সময়ে সেই Poetic diction সংস্কারে পরিণত হয়ে তাঁদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ যুগে মধুসূদন নব্যকাব্যের Poetic diction তৈরি করলেন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনার পরে যে নতুন কাব্য লিখতে পারলেন না তার কারণ তাঁর সদা-জাগ্রত সমালোচক-মন বুঝল যে তাঁর তৈরি Poetic diction অতিক্রম করে যাওয়ার উপায় তাঁর নেই, পরবর্তী কাব্য-রচনা প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী কাব্যের অনুকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বিপুল Poetic diction তৈরি করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্লঙ্ঘ্য সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। গদ্য কবিতা রচনা এই সংস্কার-লঙ্ঘন প্রয়াস। আরোগ্য, রোগশয্যায়, জন্মদিনে প্রভৃতি একেবারে জীবন-শেষের কয়েকখানি কাব্যে পাঠক যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের স্বাদ পায় তার কারণ, নিজের রচিত ভাষা-সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত, ও নজরুল ইসলাম কিছু কিছু Poetic diction বা ভাষা-সংস্কার তৈরি করেছেন। বাকি সকলেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথের Poetic diction গ্রহণ করেছেন (কখনো কখনো বৈষ্ণব কবিদের Poetic diction ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। ‘আধুনিক কবিতা’র যদি কিছু মূল্য থাকে তবে তা রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভাষা-সংস্কার লঙ্ঘন চেষ্টায়)। এখানেই প্রধানত রবীন্দ্রপ্রভাব। যুগধর্মোচিত রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও পূর্বোক্ত major কবিগণ স্বকীয় প্রভায় উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতায় অবশ্যই রবিরশ্মির দিব্যপ্রভা নেই, কিন্তু গৃহদীপের স্নিগ্ধ ভাস্বরতা নিশ্চয় আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তার চেয়েও বেশি আছে।

রবীন্দ্রযুগের মাঝখানেই একবার দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দ্র ও আষাঢ়ের বজ্রচকিত অট্টহাস্যে পাঠক-সমাজকে চমকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তার পরে নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর প্রলয় ছন্দের আলোয় ও আলোড়নে আর একবার সচকিত করেছিলেন পাঠক-সমাজকে। সত্যেন্দ্র দত্তর বিচিত্র ছন্দের ভুজঙ্গপ্রয়াসে এখনো চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে। এ সবই সত্য। কিন্তু বজ্র, বিদ্যুৎ ও ধূমকেতুর প্রচণ্ড ভাস্বরতা নেই বলেই গৃহদীপের মূল্য কিছু কম নয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই… হয়তো সেখানেই তার যথার্থ মূল্য।

কবিশেখরের কবিতার বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করবার আগে তাঁর জীবনীর একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক। জীবনী আলোচনাতে সেইসব ঘটনার উপরেই জোর দেব বর্তমান লেখকের মতে তাঁর কবিধর্মগঠনে যার কিছু প্রাসঙ্গিকতা থাকা সম্ভব।

১৮৮৯ সালে জুলাই মাসে কবিশেখর জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। কবির পিতৃনিবাস বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই গ্রামে। এ অঞ্চলে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির জন্মস্থান তবু পুত্রের নামকরণ হল কালিদাস। হয়তো পিতার সংস্কৃত কাব্যপ্রীতি এর কারণ। কারণ যাই হোক, সংস্কৃত কবিদের নামে সন্তানগণের নামকরণের রীতিটি আজো প্রচলিত আছে কবিশেখরের পরিবারে। পিতৃনিবাসের আব-হাওয়া থেকে প্রাপ্ত বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের সঙ্গে মিলেছে পিতার নিকট থেকে পাওয়া সংস্কৃত কাব্যের প্রতি প্রীতি। অন্ততঃ দুটো ধারাই পাশাপাশি বর্তমান তাঁর কাব্যে।

স্বগ্রামে মাইনর স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে বালক কবি এলেন বহরমপুরে। এখানকার মিশনারী স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজে কাটে তাঁর বাকি শিক্ষাজীবন। কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করে জীবিকা-অর্জনে নিযুক্ত হলেন তিনি। কিন্তু তার আগে কিছুকাল কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে গেলেন। কবিশখরের রচনার সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান গভীর ও ব্যাপক, সংস্কৃত অলঙ্কার ও ব্যাকরণেও তাঁর প্রবেশ অসামান্য। খুব সম্ভব চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই এই জ্ঞান অর্জিত হয়।

এবারে কবিশেখরকে যেতে হয় রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে, সেখানেই তিনি পরে প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল কাটে সেখানে। কবিশেখরের কাব্যে বাংলার পল্লীর যে চিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার উন্মেষ বাল্যকালে স্বগ্রামে হয়ে থাকলেও এই সময়ে তার বিকাশ ঘটে মনে করলে অন্যায় হবে না। সাত বছর পরে উত্তরবঙ্গের পাট তুলে দিয়ে কবি চলে এলেন দক্ষিণ বঙ্গে, এগার বছর কাটান বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে। অবশেষে কলকাতার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে এল শহরতলী থেকে খাস কলকাতা শহরে আর ১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কাটল ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে অন্যতম শিক্ষক পদে। এই সময়ে দক্ষিণ কলকাতায় 'সন্ধ্যার কুলায়'

নামাঙ্কে স্বগৃহ নির্মাণ করে কবিশেখর স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হন কলকাতা শহরে।

শিক্ষকতা করবার সময়ে কবি পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। খুব সম্ভব অর্থের বিচারে তাঁর উদ্যোগ সফল হয়েছে, কিন্তু গোড়াতে আমরা যে অনুযোগ তুলেছিলাম তার মূল এখানে। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেই কবি ক্ষান্ত হননি, নিজের কবিতাও সঙ্কলিত করে দিয়েছেন। এই সূত্রে বিদ্যালয়-জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে—শিক্ষক, কবিশিক্ষক ও উদ্যোগী পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলক বলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য কিন্তু কবি-জগতে যে আসনখানি তাঁর স্বাভাবিক অধিকারে প্রাপ্য, সেখানে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

আসল প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে কবিশেখরের অন্যান্য শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা আবশ্যক। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা আদৌ বিদ্যালয়ের 'পাঠ্যপুস্তক' বা কলেজের 'নোটবই' শ্রেণীর রচনা নয়। এ সব গ্রন্থে গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও চিন্তার পরিচয় আছে। ইদানীং কবি রম্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন। চণক সংহিতা, রঙ্গচিত্র ও চালচিত্র নামে কবির তিনখানি রম্যরচনাগ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই সব রচনার মূল কবিশেখরের কবিতায় আছে। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস, সামাজিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার চিত্র অনেক এঁকেছেন তিনি কবিতায়—সেই হাস্য ও ব্যঙ্গ, সেই ভূয়োদর্শন ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই সব রম্যচিত্র-গুলোকে। বেশ বুঝতে পারা যায় উচ্চশ্রেণীর গল্পলিখিয়ের কলম ছিল তাঁর হাতে, প্রথম জীবনে তিনি তার ব্যবহার করেননি, হয়তো নিজেই সচেতন ছিলেন না, তবু দেখা যাচ্ছে যে সে কলমে মরচে পড়েনি। কেনই বা পড়বে, বাণীর রাজহংসের পাখনা তো ষ্টিলের নিব নয়। এই রচনাগুলোর সঙ্গে কবির এক শ্রেণীর কবিতার গভীর আত্মীয়তা অনুভব করি বলেই এত কথা বলতে হল। বয়সে প্রবীণ এবং সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত কবিশেখরের পরবর্তী কালের জীবন নানা সূত্রে সুপরিজ্ঞাত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত; সন্ধ্যার কুলায় গুণগ্রাহীদের যাতায়াতে মুখরিত; বললে অত্যুক্তি হয় না যে সাধনার সিদ্ধিরূপে কবিশেখর ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে এখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করে এবারে আসল প্রসঙ্গে প্রবেশ করব।

বাল্যকালে দেখতাম গাঁয়ের ছেলেরা আমাদের বাড়ীতে এসে ঘুড়ি তৈরি করবার জন্য 'বঙ্গবাসী' কাগজ চাইতো। তখনকার দিনে 'বঙ্গবাসী' ছিল সমধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। তাই তাদের কাছে সংবাদপত্র মাত্রই ছিল 'বঙ্গবাসী'। এযুগে রবীন্দ্রকবিতা সমধিক প্রচারিত, তাই এক শ্রেণীর সমালোচকের চোখে সব কবিতাই রবীন্দ্রকবিতা অর্থাৎ কি না রবীন্দ্রানুসারী কবিতা। এ সেই গ্রাম্য বালকের দৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয় বড়ালের কোন কোন কবিতায় আছে তবু তাঁরা নিশ্চয় রবীন্দ্রানুসারী নন। এযুগের সমস্ত কবির কাব্যেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাব আছে, এমনকি "রবীন্দ্র-বিরোধী" কবিগণের কাব্যেও আছে, তাই বলে তাঁরা সকলেই যে রবীন্দ্রানুসারী এমন নয়। সাহিত্য সমালোচনায় বাঁধাবুলি বড় সহজে চলে। পাঠকেরা লেখকের গায়ে একটা লেবেল আঁটা দেখতে চায়, তাতে তাদের চিন্তার ভার লাঘব হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারী লেবেলের কাজ করে। কবির প্রতি অবিচার হল কি না সে তর্কে প্রবেশ করছে কে?

আগে major কবি বলে যে সব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সকলেরই অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র কক্ষপথ আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মূল কোথায় আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলতঃ রোমান্টিক। এর বিপরীত একটা রস আছে যাকে বলা যেতে পারে Domestic বা গার্হস্থ্য রস। এই গার্হস্থ্য রসের গুণেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য। Poetic diction এবং ছন্দে মিল থাকা সত্ত্বেও গার্হস্থ্য রসের উপস্থিতি হেতু তাঁদের স্বতন্ত্রতা। এযুগে দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস যে পরিমাণে গার্হস্থ্য রসের কবি সেই পরিমাণে তাঁরা স্বতন্ত্র, সেই পরিমাণে তাঁরা অ-রোমান্টিক অর্থাৎ অ-রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি সহজেই এ কথাটা বুঝেছিল। তিনি কবিশেখরের কবিতা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—"তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কবিশেখরের কাব্যে কবিগুরু বাংলা দেশের একটি কল্যাণমধুর গৃহের ছবি দেখতে পেয়েছেন। এখানেই গার্হস্থ্য রসের পরিচয়। কবিশেখরের কাব্যে রোমান্টিক রসের কবিতা নেই এমন বলি না। এযুগে কবিতা লিখতে বসলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা ক্ষমতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কখনো না কখনো রোমান্টিক কবিতা লিখতে হবেই। তবে তাঁর সমবয়স্কদের মধ্যে কবিশেখরের রোমান্টিক কবিতার ন্যূনতা

সহজেই চোখে পড়ে। তুলনায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রোমাণ্টিক কবিতার সংখ্যা অনেক বেশি, যদিও কোন কোন মহলের মতে তিনি প্রধান "রবীন্দ্রবিরোধী" এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার গঙ্গোত্রী। রবীন্দ্রনাথের শরৎ কবিতার পাণ্টা জবাবে লিখিত শরতের বঙ্গভূমি এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের পাণ্টা জবাবে গঙ্গাস্তোত্র নাকি ঘোরতর অ-রোমাণ্টিক ও বাস্তববাদী। কিন্তু সত্যি তাই কি? বিষয়ের প্রকৃতি দিয়ে কাব্যের প্রকৃতি বিচার করলে চলবে না, ঐ বিষয় নির্বাচনের মূলে কবিত্বের যে প্রেরণা আছে তাই দিয়ে কবিতার প্রকৃতি বিচার করতে হবে। রোমাণ্টিক দৃষ্টি জগতের দিকে "তেরছ নয়নে" তাকিয়ে দেখে, তাই সমস্তই তার চোখে অভিনব। অভিনবত্ব সৃষ্টি রোমাণ্টিক কবিতার মূল কথা। অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময় বাড়াবাড়ি ঘটে, অবাস্তবতা আসে, উদ্ভট ও অদ্ভুতের (queer) আমদানী হয় এবং অবশেষে রোমাণ্টিক কবিতা লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রেরণাতেই রোমাণ্টিসিজমের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকারে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যতীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারে করতে চেষ্টা করেছেন। ছোট ছেলেরা খেলবার সময় মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে পরিচিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এ-ও রোমাণ্টিক অভিনবত্ব সৃষ্টি-প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। যতীন্দ্রনাথের এ দুটি কবিতা ছোট ছেলের মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে জগৎদর্শন। অবাস্তব সত্য—কিন্তু অভিনব নিঃসন্দেহ। পূর্বোক্ত major কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও করুণানিধানে রোমাণ্টিক গুণ সবচেয়ে বেশি, তারপরে যতীন্দ্র বাগচিতে, এই গুণ সবচেয়ে কম কুমুদরঞ্জনে ও কবিশেখরে। রোমাণ্টিক গুণ সবচেয়ে কম আবার গার্হস্থ্য রস সবচেয়ে বেশি। আর সেইজন্য তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী না হয়ে রবীন্দ্রস্বতন্ত্র।

উদাহরণ সমালোচনার সার। কবিশেখরের কাব্য থেকে কয়েকটি ছবির টুকরো উদ্ধার করে দিচ্ছি, গার্হস্থ্য রসের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

বারো বছরের গোটা গ্রামখানি
এ বুকে রয়েছে জাগি,
সেই এঁধো ডোবা পড়ো খড়োঘর,
প্রাণ কাঁদে তার লাগি।

আবার—

নর-নারী প্রেতমূর্তি ভোগে শুধু জ্বরে,
খাদ্য আছে সাধ্য নাই, খায় তাহা, শুধু পথ্য করে।
তাহারা ভাতের চেয়ে সাগুদানা খায় বেশিদিন,
সাগুর চেয়েও বেশি খায় কুইনিন।

অপিচ,

বিজলির বাতি জ্বলে বড় বড় শহরে
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।
দীনের কুটীরে গ্রামে, বস্তির ভিতরে
দীপশিখা জ্বলিতেছে চিরদিন।

এবং

হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্ত পদে সন্তরণ ছাড়ি।
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্ক ক্ষেতে জলসেচ সারি।

আরও আছে—

মাঝে মাঝে শোনা যায় শিশুর কাঁদন আর
কুকুরের ডাক

উদাহরণ তুলে দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়, এমন কি কবিতার নাম লিখতে গেলেও তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়বে, তাই মাত্র কয়েকটি কবিতার নামোল্লেখ করছি।

ছা-পোষার হাল, ধ্বংসাবশেষ, কৈশোর-স্মৃতি, জীর্ণ সৌধ, কৃষকের শোক, প্রভৃতি যে কোন কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে গার্হস্থ্য রস বলতে কি বোঝাতে চাই। সমালোচকের ভাষ্যের চেয়ে কবির ভাষার গুণ বেশি, তাই একটি শ্লোক উদ্ধার করে দিয়ে নিজের দায়িত্ব লাঘব করি।

রবীন্দ্রনাথের গানে পরিতৃপ্ত কান
তবু ভাল লাগে আজো নিধু দাশু শ্রীধরের গান।
কতই বিলাস হর্ম্যে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভাল লাগে সেই তকৃতকে বেঁশো ঘরখানি,
পাঁশ-টিপি বাঁশ ঝাড় কলাবনে ঘেরা
বাঁধা যার চারিপাশে, রাঙচিতা বেড়া॥

অধিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ও আইডিয়াল, নিধু, দাশুরথি শ্রীধর এবং সেই সঙ্গে আমরা যোগ দিতে পারি কবিশেখর, কুমুদরঞ্জন, দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি domestic ও রিয়াল; ক্ষণিকায় ও ছিন্নপত্রাবলীতে পল্লী-বাংলার যেমন চিত্র আছে তেমন আর কোথাও নেই; তবে সে সমস্তই রোমান্টিক ও আইডিয়াল। পূর্বোক্ত কবিগণ অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তার মূলগত ভেদ। বলাবাহুল্য এ ভেদ গুণে নয়, রসে। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতাটির সঙ্গে কবিশেখরের শাজাহান মিলিয়ে পড়লে ভেদটা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। কবি চরাচরে যে দিকেই তাকান না কেন, সতত ও সর্বত্র তাঁর চোখে পড়ে মধ্য বিন্দুতে বিরাজমান একখানি গৃহ, যে-গৃহ অত্যন্ত রিয়াল, অত্যন্ত পরিচিত, যার মাটির দেয়ালে আঙুলের ছাপগুলো এখনো মিলিয়ে যায়নি, মিলিয়ে নেওয়া যায় মানুষটির হাতের সঙ্গে। এই গৃহের মাধ্যাকর্ষণেই বিধৃত কবির জগৎ, বলা বাহুল্য সে জগৎ রবীন্দ্রের সৌরজগৎ নয়। যোজনপ্রমাণ যে মাপকাঠিতে সৌরজগতের মাপজোক চলে সে মাপকাঠির প্রয়োগ এখানে চলবে না, এখানে সমস্তই বালখিল্য মাপের, এবং তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আশা-আকাঙ্ক্ষা গৃহসংসারের ক্ষুদ্র আঙিনার সঙ্কীর্ণ দিগন্তে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তবু তারা কম সত্য, কম সুন্দর নয়। সাহিত্যের সাত মহলা ভবনে এরও একটি সম্মানের আসন আছে। আর এ আসনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

রোমান্টিক কাব্যের আলোচনা করতে বসলেই ইংরাজি সাহিত্যের Romantic Revival-এর কবিদের ইতিহাস মনে পড়ে যায়। যেন সেখানেই রোমান্টিক মনোভাবের উৎস। এ কথা সত্য নয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই রোমান্টিক কাব্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে—কেননা রোমান্টিক প্রেরণা মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক ও সর্বজনীন বৃত্তি, যুগধর্মে কখনও প্রবল কখনো অন্যথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে দেখা যাবে যে এখানে দুটি ভিন্ন অথচ সমান্তরাল প্রবাহ আছে। একটি গীতি-কাব্য অন্যটি আখ্যায়িকা কাব্য, কাজের সুবিধার জন্যে বলা যেতে পারে একটি পদাবলীকাব্য অন্যটি মঙ্গলকাব্য, আপেক্ষিক বিচারে একটির রোমান্টিক প্রেরণা, অন্যটির Domestic প্রেরণা। অপ্রাপ্ত, অপ্রাপ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রত্যহ রোমান্টিক কাব্যের সামগ্রী আর করায়ত্ত, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রাত্যহিক Domestic বা গার্হস্থ্য রসের সামগ্রী। বৈষ্ণব গীতিকাব্যে এবং মঙ্গলকাব্যে মোটের উপরে এই প্রভেদ।

তবে এ ভেদ অচল-অচল নয়। বৈষ্ণব কাব্যে বাৎসল্য ও সখ্য রসাশ্রিত পদগুলোর Domestic মনোভাবের দিকে ঝোঁক, আবার মঙ্গল কাব্যের কোন কোন আখ্যায়িকায় যেমন মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ঝোঁকটা রোমান্টিকতার দিকে। সব দেশের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এরকম ভিন্ন প্রেরণার যুগ্ম প্রবাহ দেখতে পাওয়া যাবে। নব্য বাংলা সাহিত্যেও এই দুই ধারা সমান্তরালে বহমান। এ যুগে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ও প্রতিভায় রোমান্টিক কাব্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে, অন্য রসের ধারা ক্ষীণ। ক্ষীণ কিন্তু একেবারে নগণ্য নয়, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যে (গদ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) এই রসের প্রবাহ। এঁরা মূলতঃ কেউ রবীন্দ্রানুসারী নয়, রবীন্দ্র-স্বতন্ত্র। গোড়াকার এই কথাটি না বুঝলে এঁদের কাব্য ভুল বুঝবার আশঙ্কা। তাই কিছু দীর্ঘ প্রচেষ্টা করতে হল।

ইংরেজ কবি Cowper-এর কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ফরাসী আলঙ্কারিক Sainte-Beuve বলেছেন যে Cowper হচ্ছেন "the poet of quiet rural and domestic life." কবিশেখরের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে এ বর্ণনা মিলে যায়, তিনিও পল্লীজীবনের ও গার্হস্থ্য রসের কবি। এ দিকটা আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু দেখছি যে পূর্বোক্ত আলঙ্কারিক Cowper-এর কাব্যভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা-ও মিলে যাচ্ছে কবিশেখরের কাব্যভাষার সঙ্গে এবং সে বিষয়ে আমার ধারণার সঙ্গে। "Every man conversant with verse writing knows, and knows by painful experience, that the familiar style is of all styles the most difficult to succeed in. To make verses speak the language of prose without being prosaic……is one of the most ardous tasks a poet can undertake." কবিশেখরের কাব্যের ভাষা ও তার চালচলন সম্বন্ধে এ কথা মোটের উপরে সত্য। তাঁর ভাষা সর্বদা গদ্যের গা ঘেঁষে চলেছে কিন্তু কোথাও সংঘাত ঘটেনি। একে তো কাব্যের বিষয়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদাসিদে আটপৌরে, তার উপরে ভাষার এ হেন গদ্য ঘেঁষা চাল, খুব সূক্ষ্মদর্শীর কাছে ছাড়া এমন কাব্যের সমাদর হওয়া কঠিন। এদিকে যুগধর্মেও আছে মস্ত অন্তরায়। নজরুলের আগ্নেয় মদিরা, সত্যেন্দ্র দত্তর শার্দূল-বিক্রীড়িত, রবীন্দ্রনাথকে আর এ বিষয়ের মধ্যে ধরছি না, এমন অবস্থায়—

'আগ্রা আসি মনে পড়ে, গিয়েছিনু দূরবর্তী গ্রামে,
শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ যখন সে অস্তে নামে নামে"

কিম্বা—

"ধানকে করে পরিণত বাড়া ভাতে।
এঁটো কাঁটা বাড়তি বাসি তার বরাতে।"

কিম্বা—

"ব্যথা যে অবুঝ বড় যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে"

এমন আটপৌরে নিরলঙ্কার ভাষার কি আশা-ভরসা। গার্হস্থ্যরস-প্রধান কাব্যে এ যে গৃহলক্ষ্মীর নিঃশব্দ অলক্ষ্য পদসঞ্চার। খুব সম্ভব কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন, তাই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের প্রেরণায় তিনি 'পাঠ্যপুস্তক'কে আশ্রয় করেছিলেন। এখন ভাবছি ভালই করেছিলেন, দুঃসময়ের বন্যায় একেবারে ভেসে যাননি। আজ যখন সাল-তামামিতে হিসাব-নিকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি যে কবিশেখর 'পাঠ্যপুস্তকে'র কবি নন, কাব্যে একটি চিরন্তন ধারাশ্রয়ী এ যুগের একজন major বা প্রধান কবি, রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও যিনি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিশেখরের কবিধর্ম ও কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। এবারে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ও তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত কবিদের স্থান নির্ণয় প্রচেষ্টা। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ বর্তমান যুগে—যখন সমস্ত মূল্য ও পূর্বসংস্কার সত্যঃপাতী। তৎসত্ত্বেও দু'একটি কথা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। দুটি কারণে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-সংক্রমণের মধ্যে তাঁরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বিরাজমান বলে; দ্বিতীয়, নিজেদের কৃতিত্বের দাবীতে। এ বিষয়ে পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম, এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য হারায় নাই; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যখন ক্লান্তিপাত ঘটিতেছিল তখন ইঁহারা ও ইঁহাদের মত কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্য

সংস্কারটিকে সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে যে ব্যবধান ইঁহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই। কেবল এই কারণেই তাঁহাদের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এইসব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে। উচ্চাঙ্গ কাব্যরস বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্ত্যপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই ; কিন্তু রবাহূত, অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্নে ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও জাতিভেদ ছিল না। সেকাল কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে ; সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিঃপ্রাঙ্গণের আয়তনও বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাদের কি হইবে ? একশ বছর আগে মধুসূদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস-বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে। এমন যদি কখনও হয় যে, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদের সাকুল্যই খাসমহলের ভোগে লাগিয়া যাইবে, আর প্রবেশানধিকারীর দল ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক মুখে, তবে সেই সরস্বতীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।....

"যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তত্ত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্র সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তর্ক উঠিবে যোগ্যতমের সংজ্ঞায়। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সাহিত্য যেমন গতানুগতিককে সহ্য করে না, তেমনি খাপছাড়া ও অদ্ভুতকেও বহন করে না। খাপছাড়া ও অদ্ভুত কিছুদিনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও চিরদিনের পাট্টা তাহাদের

নাই। সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যটিকে যেমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এমন আর কিছুতে নয়।

এখন গতানুগতিক ও অদ্ভুতের মাঝখানের স্থান খুব প্রশস্ত। সেই-স্থানে যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের মার নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের স্থানও সেখানে, আবার major ও minor poet-গণের স্থানও সেখানে ; মহাকবি ও অন্য পর্যায়ের কবিগণ এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে আশ্রিত, অনেক সময়েই গায়ে গায়ে বিরাজ করে ; কেবল অকবি ও কুকবিগণের সেখানে স্থান হয় না। সমসাময়িক বহুঘোষিত ও বিচিত্রকীর্তি অনেক কবি ও কবিতা যখন খাপছাড়া ও অদ্ভুত বলিয়াই তলাইয়া যাইবে, তখনও ইঁহাদের সরল, প্রাঞ্জল, বাঙালীর পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখে, আশা-আনন্দে এবং গার্হস্থ্য রসে সমুজ্জ্বল যে কবিতাগুলি টিকিয়া থাকিবে তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়।”

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পসারী ও পসারিনী...	৯৯
শরতের আবাহন ..	১০০
চলার গান ...	১০১
রসচক্রের শরৎচন্দ্র ...	১০২
ক্ষমা-ধর্ম	১০৪
পূর্ণচন্দ্রের উদ্দেশে ...	১০৮
মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা ...	১০৯
গভীর রাতের রহস্য	১১০
পূজার দিনে ...	১১১
জলকমল ও স্থলকমল	১১২
আদর্শ মানুষ ...	১১২
নারদ ...	১১৩
পেটের ভোট ...	১১৬
রক্ষক ও ভক্ষক ...	১১৭
ভবভূতির সীতা ...	১১৯
গীতাপাঠ ...	১২০
মৃদঙ্গ ...	১২২
গাভীর ব্যথা ..	১২৩
সোমপায়ীর গান ...	১২৪
মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে	১২৫
বিষদৃষ্টি ...	১২৭
দর্পহরণ ...	১২৮
ভগবানের প্রাপ্য ...	১৩০
আকিঞ্চন ...	১৩১
মৃত ...	১৩২
ভিক্ষা ও দীক্ষা ...	১৩৩
কালিদাসের বর্ষা ...	১৩৪
খণ্ডকপালী ...	১৪০
দপ্তরী ...	১৪২
শরতের ব্যথা ...	১৪৪
জীর্ণ সৌধ ...	১৪৫
বিশ্বশিল্পীর সন্তান ...	১৪৬
বিশ্বকর্মা ...	১৪৭
অর্ধকাশী ...	১৪৯
কালিদাসের শরৎ ...	১৫১
গজপুরী গিরিসঙ্কটে	১৫৬
লালাবাবুর দীক্ষা ...	১৬০
মৌলিকতা ...	১৬৪
কালিদাসের হেমন্ত...	১৬৫
মাতৃহৃদয় ...	১৭০
পিতৃহৃদয় ...	১৭১
শহীদ স্মরণে ...	১৭২
বৈশাখী সন্ধ্যায় ...	১৭৪
আকাশ-প্রদীপ ...	১৭৬
মীরকাসেমের বিদায়	১৭৭
মমতাজ ...	১৮১
কবিয়াল ভোলা ময়রা...	১৮২
কালিদাসের শিশির ঋতু	১৮৩
গোষ্ঠলীলা ...	১৮৭
গঙ্গাতীরে ...	১৮৯
ছা-পোষার হাল ...	১৯১
প্রেমের মর্যাদা ...	১৯৩
সমুদ্রতীরে ...	১৯৪
শঙ্কর ...	১৯৫
কালিদাস ...	১৯৬
বিদ্যালয়-পথে ...	১৯৯
পল্লী থেকে নগরে ...	২০২
রুপার বাসন ...	২০৪
কালিদাসের বসন্ত ...	২০৬
কাঁটাল ...	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অষ্টাপদী

গান

হাসির গান

কবিতার দিন

বল্‌ছ ত কবিতার দিন গেছে ফুরিয়ে
কি করে বল না তারে এড়াবে ?
আকাশের নব মেঘ তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে
আন দিকে আঁখি ছুটি ফেরাবে ?
দেখবে না শরতের ভরা নদী, কূলে যার
কাশবন ভরা গাঙশালিকে ?
ঠেলবে কি ছয় ঋতু আনবে যে উপহার
তাদের সে ফোটা ফুল-ডালিকে ?
চাবে না কি তারাভরা নিশীথের গগনে ?
যাবে নাকি সৈকতে বারিধির ?
কানে তুলো দিয়ে রবে কুলায়ের কূজনে
শুনবে না প্রেমালাপ কপোতীর ?
কচি মুখে হাসি নিয়ে কোলে এসে পড়লে
শিশুর গালের চুমা হারাবে ?
অকারণে প্রিয়া তব অভিমান করলে
তারে কি ধমক দিয়ে তাড়াবে ?
বলছ ত কবিতার লীলা হ'ল বন্ধ,
লীলা যে ছড়ানো সারা ভুবনে।
কালা যদি না-ই হও, না-ই হও অন্ধ
কবিতা এড়াবে বল কেমনে ?

যুঁই-এর গন্ধে

নগরপথে যেতে যেতে গন্ধ মধুর পেয়ে
শেঠের কুঠির গেটের পরে চম্‌কে দেখি চেয়ে—
যুঁই ফুটেছে, পেলাম তাদের হাসির নমস্কার
অঙ্গে আমার করল হঠাৎ রোমাঞ্চ-সঞ্চার
ঠাণ্ডা পরশ তার।

আমার কানে মিঠে গলায় যুঁইএর গন্ধ কয়
"চিনতে পার? জানি কবি তোমার পরিচয়।
কিন্তু একি! তোমারো নেই বিন্দু অবসর,
তুমিও হায় সবার মতো করছ অনাদর!
ভাবছ আমায় পর!

শোনো তবে, তিনশ' বছর আগেও ছিলে কবি,
এই জনমে ভুলে গেছ সেই জনমের সবি।
তোমার বেঁশো খড়ো ঘরের গুঞ্জিত অঙ্গনে
যুঁইএর মাচা বাঁধা ছিল পুঁইএর মাচার সনে
পড়ছে তা কি মনে?

কাজলা ঋতুর বাদলা বাতাস এমনি ছিলাম ভ'রে
চিনতে পার কিনা দেখ বাতাস টেনে জোরে।
শর-কলমে তুলোট 'পরে লিখতে ব্রজ-গীতি,
যেতাম রয়ে তাতেও হয়ে ঝুলন-দোলার স্মৃতি
লীলার রসে তিতি।

যুঁইএর মতই ফুটতো সে গীত, একটু সুবাস দিত,
বিদায় নিলেও জীবন-ধারায় রাখতো সুরভিত।
সে সব গীতি গুঞ্জরিয়া গাইতে আঙিনায়,
তৃপ্তি পেতে অলির মতো, তাতেই হ'ত সায়
ফুরিয়ে যেত দায়।

শ্বাসবায়ুতে আমিই পশি অন্তরে তোমার,
ঘুম ভাঙাতাম তোমার হৃদয়-কুঞ্জে রাধিকার,
প'রে খোঁপায় যূথীর মালা রাধার দূতীসমা
একটি পাশে রইত ব'সে তোমার প্রিয়তমা,
যূথী-বনের রমা।

বর্ণে ছিল স্বর্ণচাঁপা আঙুলগুলি তার,
কিসের গন্ধ বিলাত তা যূথী না চম্পার?
কেশে তাহার বেশে তাহার, তাহার শ্বাসে হাসে,
ভাষায় তাহার ভূষায় তাহার কিসের সুবাস ভাসে
আজ তা মনে আসে?

তোমার পাশে পোষা কপোত আসত উড়ি উড়ি,
ডাকৃত দূরে থেকে থেকে ডাহুকী দাহুরী।
তোমায় ঘেরি চাল গড়ায়ে ঝরত বারিধারা,
তারি ফাঁকে দেখতে ধরায় মায়ায় সালঙ্কারা
ত্রিতাপ দাহ-হারা।

মেঘের ধ্বনির তরঙ্গেতে গগন যেত ভরি,—
দেখছ ঘড়ি? ছিল না ভাই সেদিন কোন ঘড়ি।
পবন, ভুবন, জীবন ছিল মন্থরতায় ভরা,
সহজ ছিল দিনের খেয়া সন্তরণেই তরা,
তরুণ ছিল ধরা।

সত্যি তখন কবি ছিলে, এ যুগ তোমার নয়,
সব ভুলেছ, গীতি লেখাও ভুললে ভালো হয়।
বন্ধু এ কাল আমারো নয়, এ নয় মোদের ঠাঁই,
দেশ বা কালের সঙ্গে মোদের সঙ্গতি যে নাই।
বিদায় তবে যাই।"

কবির ভাষা

ভক্ত চায় করিবারে ভক্তি নিবেদন
দেবে বা মানবে,
হৃদয়ে আকৃতি তার করি সংবরণ
রহে সে নীরবে।
আমি কবি, কণ্ঠে তার ভাষণ যোগাই,
বাণী ফুটে মুখে
পুষ্পসম, গন্ধ পায় ছন্দে তার, তাই
স্পন্দ জাগে বুকে।

লঘু যে করিতে চায় করিয়া বিলাপ
হৃদয়ের ভার,
ঝরায় নয়নে অশ্রু শোকের সন্তাপ,
ভাষা নাই তার।
আমি কবি, কণ্ঠে তার বচন যোগাই,
শোক পায় রূপ,
তাহারে সুরভি করে ধূম-মাল্যে তাই
হৃদয়ের ধূপ।

প্রেমিক করিতে চায় প্রেয়সীর সাথে
প্রেম আলাপন
শরতের প্রাতে কিংবা বসন্তের রাতে,
জানে না ভাষণ।
আমি কবি, ভাষা দিই ললিত মধুর
গদ্‌গদ রসে,
মুখে তায় হাসি ফুটে মানিনী-বধূর
তাহারি পরশে।

জননী করিতে চায় দুলালে সোহাগ,
ভাষা কোথা পাবে ?
থামে না রোদন তার কমে না ক রাগ,
কিসে সে ভুলাবে ?
আমি কবি, ভাষা দিই, সুর দেয় তারে
মায়ের অন্তর,
শিশুমুখে হাসি ফুটে—ফুলের নীহারে
যেন রবিকর।

গাগরিভরণ

গাগরিভরণে এসেছিলে তুমি আমার জীবন-দীঘিতে,
গা ডুবায়ে জলে উদাসিনী হলে কী গীতে ?
শুনিতে শুনিতে তন্ময় হ'য়ে
ডুবি আকণ্ঠ গেলে তুমি র'য়ে,
হ'ল নাক ফেরা, সাঁজের তপন ডুবিল দেখিতে দেখিতে।

তব মুখখানি কমল হইয়া ফুটে আছে দেখি প্রভাতে,
আলো করি দীঘি অপরূপ নব শোভাতে।
তব কেশপাশ হ'ল শৈবাল
গাগরি তোমার হয়েছে মরাল,
দীঘির সলিল করে উত্তাল পাখার ঝাপট-আঘাতে।

একটি কমল সহস্রদল, পরিমল অফুরন্ত,
মধু গলে তায়, সে ধারায় নেই অন্ত।
মধু হয়ে গেল এ দীঘির জল,
বাসিত করিল তারে পরিমল,
বাণীর বাহন হইয়া মরাল করে তারে প্রাণবন্ত।

অভিসারিকা

নতুন হয়েছে বিয়ে ঘোরেনি বছর,
তখনো রোজই রাতে মোদের বাসর।
দিনে তুমি সংসারে পরিচারিকা,
নিশীথকুঞ্জে মোর অভিসারিকা!
মনে পড়ে শাঙনের বাদল রাতি
গৃহকোণে মিটিমিটি জ্বল্‌ত বাতি।
ডোবায় বেঙের ডাকও লাগত মিঠে
আসত জানলা ফাঁকে জলের ছিটে।
যুঁইএর গন্ধে ভরা বাতাস নিয়ে,
ভাবতাম, কখন বা আসবে প্রিয়ে।

ডেকে ডেকে সারা হ'তো কপোতগুলো,
সহসা আসতে তুমি মাথায় কুলো।
শাঙনে আঙিনা কাদা পঙ্কে ভরে
পঙ্কজ ফুটিয়ে সে পঙ্ক 'পরে,
এসে ত্বরা কুয়া-পাড়ে ধুতে যে চরণ,
রিনি ঝিনি কর্‌ত সে বারতা বহন।
নিয়ে জ'লো বাতাসের ঝাপ্‌টা কেশে
ভেজানো দরজা ঠেলে আসতে শেষে।

বলতাম 'এত দেরি! যত বাজে কাজ!'
বলতে 'কোথায় দেরি তাড়াতাড়ি আজ।
খাওয়া দাওয়া শেষ আজ সকাল সকাল,
ঘড়ি দেখ সবে সাঁজ, হায়রে কপাল!'
শুকাতো না বাদলায়, চুল এলো তাই
আজিও তেলের বাস সে চুলের পাই।

বলতাম, 'ছেড়ে ফেল শাড়ীটা ভিজে,
ভোগাবে অসুখ হলে ভুগবে নিজে।'
বলতাম, 'কত শাড়ী তোরঙ্গ ভরা,
একখানা বা'র ক'রে পরো না ত্বরা।
যখন পরার কথা নীলাম্বরী
তখন মানায় এই আটপহরী ?'
এতে তুমি মোর 'পরে রাগতে ভারি
বলতে, ভাঙব কেন পোশাকী শাড়ী ?

বলতাম খুলে ফেল গয়নাগুলো,
নিশ্চয় ওরা নয় নরম তুলো।
ফুলের গয়না যার পরার কথা
কঠিন ধাতুতে তার কেন মমতা ?
বলতে ফুলিয়ে ঠোঁট দুলিয়ে আঙুল
'মালিনী একটা রাখো যোগাবে সে ফুল।'

চাবির রিঙটা খুলে টেবিলে থুয়ে
প্রদীপ নিভাতে যেতে মুখের ফুঁয়ে।
বলতাম, 'ওকি করো দাও জ্বলতে
বরং উস্‌কে দাও ওর শলতে।
এই নিয়ে আরো কত কলহের ছল—
মিলনের ক্ষীরে মধু যোগাত কেবল।

লাগত বাদলা রাত মধুর বড়,
করত নিভৃত ঘর নিভৃততর।
আকাশ বাতাস মেঘ মাততো রাতে
জোরে জোরে কথা বলা চল্‌ত তাতে।
চমকাতো বিদ্যুৎ ধমকাত মেঘ—
ভাঙাত তোমার মান সভয় আবেগ।

মেঘের ডাকের কী যে আসল মানে
নব দম্পতী ছাড়া কেইবা জানে ?
নতুন প্রেমের হয়ে চির পরিবেষ
মনে হতো এ বরষা হ'ক না অশেষ।

দুর্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন বিহিত কর্মভাগ।
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্বাসা আসে দুর্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয় না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায় নি পানীয়, হরিণী শস্পদল,
দুর্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল ?

কোথা নরপতি লালসা-লালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-ব্যসনে আছ সারাবেলা হেলা করি রাজকাজে?
কোথা শূরবর, ভুলেছ সমর প্রেয়সীর কর ধরি ?
দুর্বাসা আসে,—দুর্বলচেতা, জাগো মোহ পরিহরি'।

ভুলি দেব-দ্বিজপূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন!
ভোগ লালসার মোহে কে ভুলেছ গৃহলক্ষ্মীর ব্রত।
দুর্বাসা আসে, নিজ সাধনায় হও সবে তদ্‌গত।

আসিছে মূর্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটীকুটিল মুখ,
শিরে জটাবন, নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি।

ছাত্রধারা

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে,
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

ভালোবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন তর্জন করি' শিখাই প্রহর ধরি',
থাকে নাকো, হায়, কোনো স্মৃতি !

ক'দিনের এই দেখা— সাগরসৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট ছোট দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার
নব নব পদ-তাড়নায়।

জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, তাই ভাবে
পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
দু'দিন একত্রে মাতে, মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার, আর কথা-মালা।

রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে— 'বেঁচে বর্তে থাকো সুখে,'
স্পর্শ করি' কেশগুলি তার।

ভাবিতে ভাবিতে যাই— কি নাম ? মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কত দিন আগে ;
স্মৃতিসূত্র ধরি' টানি, কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।

ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখাশোনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় 'দলে', মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে ?

এ জীবন ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'য়ে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায়।

স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
ভাসে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
ভুলে যাই হট্টগোল অট্টহাসি কলরোল,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি।

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে রয় ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।

কেহ বাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি,
মুখে কালো ছায়াখানি রাখি'।

স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহকোণ, স্নেহময় ভাইবোন—
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

আর সবি গেছি ভুলি', ভুলি নি এ মুখগুলি,
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারি-ভারি, ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

অজন্তার চিত্র-দর্শনে

এ চিত্রটি বিশ্বে অতুলন—
গোপা আনিলেন ভিক্ষা ভিখারীরে করিতে অর্পণ
রাহুলের হাত দিয়া। আপনার প্রাসাদ দুয়ারে
এ ভিখারী তথাগত সমাগত ভিক্ষা মাগিবারে।

আর এক চিত্র পড়ে মনে,
সে চিত্র-ও অপূর্ব ভুবনে।
আপন সতীর কাছে ভিক্ষুপতি অন্নমুষ্টি যাচে
পাতিয়া করোটি-পাত্র। সে চিত্রও ম্লান এর কাছে।
পরিমূর্ত এতে ত্রিশরণ,
ত্রিশরণে করি জয় এ যে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
সে কোন শ্রমণ শিল্পী যেবা কৃচ্ছ্র তপ আচরণে
দিব্যশক্তি প্রজ্ঞাদৃষ্টি লভিল নয়নে,
এই চিত্র করিয়া অঙ্কন
অর্হত্ব করিল লাভ জীবন্মুক্ত হ'ল যেই জন।

আপন পঞ্জরতলে এ ভারত রাখিয়াছে ভরি'
যত্নে এই প্রত্নরত্নে বহু বর্ষ ধরি'
অতুল ঐশ্বর্য তার সর্বাঙ্গের তাও তুচ্ছ গণি
এই চিত্রে ভাবি তার প্রাণ-বজ্রমণি।

ভারতে চিনিতে যদি হয়,
এই চিত্র দিবে তার বিশ্বমাঝে পূর্ণ পরিচয়।
নহে চৈত্য, নহে মঠ, নহে স্তম্ভ, স্তূপ,
ভারতের গূঢ় মর্ম এই চিত্রে লভিয়াছে রূপ।

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে—অশ্রুজলে ভরে দু'নয়ন।
কারুণ্য বিস্ময় শমে মিলাইল কোন রসায়ন?
কোন' রসতত্ত্ব আজো পায়নিক তাহার সন্ধান,
সর্বরসাতীত রস দেহ আত্মা করে মুহ্যমান।
এই কি সাত্ত্বিক রস যাহা ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর?
ঊর্ধ্ব পানে ধায় কেন পাখা মেলি এ জড় অন্তর?

তুচ্ছ মনে হয় এই সমারোহ-স্পর্ধিত সভ্যতা।
তুচ্ছ ভায় শত রাষ্ট্র উত্থানের পতনের কথা।
লুপ্ত পুর জনপদ, শূন্য ভায় ঐশ্বর্য-সুষমা,
সেই শূন্যে জাগে শুধু সুগতের বদন-চন্দ্রমা।
এই চিত্র বিশ্বে অতুলন,
নত করে উদ্ধতেরে, শ্লথ করে ভবের বন্ধন।

বন্ধুর কণ্টকপথে সংকটের সহ করি' রণ,
যষ্টিভরে ষষ্টিপার হইয়াছে এ পঙ্গু-জীবন।
সহিয়াছি দুঃখশোক, বহিয়াছি দেহে বহু রোগ,
শূলরূপে বিদ্ধ ভুলে করিয়াছি কত দণ্ডভোগ।
ভিক্ষার ঝুলিতে নিত্য লভিয়াছি ধিক্কার, লাঞ্ছনা,
নিতান্ত বাঞ্ছিতজনও করেছে বঞ্চনা।
তারা শুধু আনন্দেরে স্বাদুতর করেছে আমার।
বেদনার ফাঁকে ফাঁকে তবু বার বার
যে আনন্দ পাইয়াছি এ জীবনে মম
ভাদ্রের মেঘের ছিদ্রে হেমরৌদ্রসম,
সেই আনন্দের কথা অকপটে না করি স্বীকার
আজিকে বিদায় নিলে ক্ষমা নাই তার।

আনন্দ দিয়াছে মোরে প্রেয়সীর প্রেম শুভ্রশুচি,
নব শিশু নন্দনের কুন্দদন্তরুচি।
আনন্দ দিয়াছে মোরে সৌহার্দের হৃদ্য আলাপন,
রসজ্ঞের শ্রদ্ধা-নিবেদন।
আনন্দ দিয়াছে মোরে সারস্বত ব্রতের সাধনা,
রস-ব্রহ্ম সুন্দরের ছন্দে আরাধনা।
স্বজনের স্নেহভালবাসা,
আনন্দ দিয়াছে সে-ও যার কাছে করিনি প্রত্যাশা।
মধুচক্রে মকরন্দ ভুলায়েছে মক্ষীর দংশন,
ভুলালো কণ্টক-ক্ষত গোলাপের গন্ধ বিনোদন।
কূজন, গুঞ্জন, মন্দ্র, জল-কলতান
আনন্দ অঞ্জলি মোরে সন্ধ্যা প্রাতে করিয়াছে দান,
কর্ণপুটে করিয়াছি পান।

আনন্দ দিয়াছে এই সৃষ্টিযজ্ঞে ভোগ্যের সম্ভার
ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য বিস্তার,
অফুরন্ত মাধুরী-ভাণ্ডার।
রূপে, রসে, গন্ধে স্পর্শে পরিতৃপ্ত করেছে বসুধা
হরি' ইন্দ্রিয়ের তৃষা, অন্তরের ক্ষুধা,
বসু পাই, না-ই পাই বসুধার পাইয়াছি সুধা।

আনন্দ বিছাল' দেহে রৌদ্রদাহে বট-তরুচ্ছায়া,
জুড়াল' জাহ্নবীজল জীর্ণ শ্রান্ত কায়া।
আনন্দের দানসত্র খুলিয়াছে মেঘ, চন্দ্র, রবি,
কত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, কবি।
পুষ্পে ভৃঙ্গসম তৃপ্ত, তাঁহাদের শুভসঙ্গ লাভ'।
আত্মাও আনন্দদানে করিয়াছে মোরে আত্মহারা,
আমারি অন্তর-উৎসে উৎসারিল যেই রসধারা,
যে আনন্দ দিল তাহা, দিব্যানন্দসম।
স্মরণে রোমাঞ্চ জাগে সর্ব অঙ্গে মম।

খেয়াঘাটপথে সেই আনন্দের স্মৃতি
দূর করে সর্ব তাপ, দুঃখ, পাপ, ভাবনা ও ভীতি;
তাই মোর খেয়াঘাট-পথের পাথেয়,
আনন্দময়ের পদে অর্ঘ্য তাই, তাই সত্য শ্রেয়ঃ।
মনে হয় যত দুঃখ পাইয়াছি সবি মিথ্যা মায়া,
এ চিত্তের ভিত্তিগাত্রে আনন্দেরই ছায়া।

কালিদাসের নিদাঘ

দিনকর-কর চণ্ড প্রখর রত চরাচর পরিদাহনে।
তড়াগবাপীর ক্ষীয়মাণ নীর আজি ঘন ঘন অবগাহনে।
গততাপখেদ চারু দিনান্ত, মন্মথবেগ ক্রমে প্রশান্ত,
সুন্দর শুচি চন্দ্র-মরীচি স্পৃহণীয়-রুচি আজিকে চোখে,
দেখ দেখ প্রিয়ে ফিরিল নিদাঘ এ জীব-লোকে।

শশীর শিশির-কিরণাঞ্চিত নিশীথিনী আজ হ'লো বাঞ্ছিত।
ধারাযন্ত্রের ধারায় স্নিগ্ধ মন্দিরে দিবা যাপিছে কেহ;
কেহ চন্দন অঙ্গে মাখিয়া জুড়ায় দেহ।

কম্পিত প্রিয়াধর-চুম্বিত মধুপান করি কৌতূহলে
রচি সুখাসন সুবাসিত শীত হর্ম্যতলে,
বীণায় করিয়া মদন-দীপন সুর আলাপ,
ভোগীরা জুড়ায় নিদাঘতাপ।

দেখ দেখ চেয়ে প্রাণেশ্বরি—
মেখলা-মুখর সূক্ষ্ম দুকূলে চারুনিতম্ব শোভন করি'
চর্চিত করি' হরিচন্দনে মণ্ডিত করি হারবন্ধনে,
উরোগিরিযুগে লোভন করি',
করি স্নান শেষ পরি চারু বেশ ধূপধূমে কেশ করি বাসিত,
কৃতপ্রসাধনা পৌর ললনা করে প্রসাদনা দয়িত-চিত।
মৃগাক্ষীদের লাক্ষার রাগ চরণে ভায়,
হংসচঞ্চু বরণ তায়।

শ্রোণিভারনত তাদের চলন, মন্থর যেন হাঁসেরি মতন
নূপুর তাদের চরণে রাজে।
প্রতি পদপাতে রুনু ঝুনু মনোহরণে বাজে।
রাজহংসীরা পলায় লাজে।
হংসকাকলী মঞ্জীরে তুলি চলিয়া যায়,
কত না হৃদয় দলিয়া যায়।
শুধু ভোগী কেন কঠোর যোগীরও মন ভুলায়।
শিহরে অঙ্গ আঁচল বায়।

যৌবনবতী প্রমদাগণ
ধরে না আজিকে উরু' পরে আর গুরু বসন।
স্তন'পরে আজ ধরিয়াছে তারা তনু দুকূল।
স্বেদবিন্দুতে মণ্ডিত দেহসন্ধিমূল।
চন্দনরসসিক্ত শীতল ব্যজনবায়,
কম্বুকণ্ঠ-লম্বিত সিত হার-প্রভায়
বীণাবাদনের সহ মূর্চ্ছিত কলঝঙ্কৃত গীতস্বনে
প্রমদারা যেন জাগায় নিদ্রাগত মদনে।
দেখ দেখ চেয়ে চন্দ্রাননে।

চপলার মত হেমমেখলায় বিমণ্ডিত নি-তম্বতট,
প্রপাত-ধারার মত নামে তায় দুকূল-পট।
হরিচন্দনপঙ্কে রচিত অঙ্গরাগ,
তুষারশুভ্র হারবলয়িত উরোজ-চূড়ার অগ্রভাগ,
বিলাসিনীগণ, শৈলচূড়ার অনুকরণে
আজি শোভা পায় মনোহরণে।

সৌধশিখরে সুন্দরীগণ নিদ্রা যায়,
কৌমুদীতলে নৈশ বায়।
মুখারবিন্দ করি দরশন চন্দ্রমা লাজে পাণ্ডুবরণ
করিয়া ধারণ দ্রুত দিগন্তে অস্ত যায়
মহিমা-লোপের আশঙ্কায়।

দেহ দহে দাহ, উষ্ণ সমীর বহে তায় ধূলিপটল বহি।
মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে তপ্ত মহী।
প্রিয়াবিরহে
যেই দয়িতের নিয়ত সে দাহ হৃদয় দহে,
তাহার বিরহ দ্বিগুণ বাড়ে,
গৃহের বাহিরে নয়ন মেলি সে চাহিতে নারে।
এ নিদাঘে কেবা বাঁচায় তারে ?

ভবনান্তরে চেয়ে দেখ সখি কি কৌতুক,
নিদাঘ কেমন করে ঘনায়িত মিলন-সুখ,
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যার মত, সুন্দরী যত কামিনীগণ,
করে আনন্দ সন্দীপন
বিভ্রমময় স্মিত-সুমধুর দৃষ্টিপাতে
ফিরে পেয়ে আজ স্বগৃহে প্রবাসী হৃদয়-নাথে।

* * *

ঘূর্ণিতে ভরে চূর্ণ বালু
তৃষ্ণাকাতর মৃগকদম্ব শুষ্ক-তালু
হেরি মর্দিত-কজ্জলনিভ জলদ-উদয় দিগঙ্গনে
জল ভাবি তারে ছুটিছে বনে,
হের সে দৃশ্য, মৃগ-নয়নে।

সূর্যকিরণে তপ্ত বায়
হইয়া কাতর ধূলিময় পথে দগ্ধকায়,
ভুজগ ত্যজিয়া কুটিল গতি
শিখীর বিতত কলাপ-ছায়ায় করে বসতি।
সেথা ঘনঘন ত্যজিছে শ্বাস,
ভুলে গিয়ে শিরে উদ্যত তার সর্বনাশ।

হোমানলসম জ্বালাময় রবি-কিরণপীড়নে অঙ্গ জ্বলে,
শিখীরা ক্লান্ত অহিগণে নিজ কলাপতলে
করিয়া লক্ষ্য, আপন ভক্ষ্য মুখের আগে
পাইয়াও তারা আজি তেয়াগে।

পশুরাজ আজি হতোদ্যম ভুলিয়া গিয়াছে স্ববিক্রম,
রসনা তাহার বাসনা ত্যজেছে কম্পিত শিরে কেশরপাশ ;
ব্যাত্ত বদনে ঘনঘন শুধু ত্যজিছে শ্বাস।
অতি নিকটেই হেরি করিযূথ বিহরে বনে
আগ্রহ নাই আক্রমণে।

তৃষ্ণাকাতর করীরা মগ্ন সলিলপানে,
এতই বিভোর, যদিও জানে
কেশরী তাদের নিকটে রয়, তবুও তাহারা করে না ভয়।
বন্য বরাহ রৌদ্রের দাহ সহিতে না পারি হয়ে আকুল
খুঁড়িয়া তুলিছে মুস্তামূল,
শুষ্ক-পঙ্ক তড়াগখাতে মুখাঙ্কুশের ঘন আঘাতে ;
এড়াইতে যেন দ্বিপ্রহরের দাহের দায়,
ভূতলগর্ভে পশিতে চায়।

সরোবরনীরে গজযূথ নামি আজি সমবেত বিমর্দনে
করিছে আবিল সলিল শুণ্ড-সন্তাড়নে।
ধ্বস্ত ছিন্ন মৃণালমূল ত্রস্ত সারস হংসকুল
শৈবালদল পিণ্ডীভূত ও মণ্ডীকৃত,
গণ্ডী ছাড়িয়া কারণ্ডবেরা উড়ে যায় দূরে ভীতচকিত।

বিষ, বহ্নি ও তপনতাপের ত্রিতাপে তাপিত ভুজগগণ
বিলোল রসনাযুগলে পবন করে লেহন।
খর-রবিকর-বর্ষতলে
শিরোমণিগুলি ত্রিগুণিত তেজে ফণায় জ্বলে!
ভুলি স্বধর্ম, আপন ফণারি তলায় দেখে,
তবুও স্পর্শ করে না ভেকে।

জ্বলে দাবানল প্রবল প্রদাহে শস্পপ্ররোহ দগ্ধ তায়,
তরুর পর্ণ শুষ্ক লুলিত তপ্ত বায় ;
যেখানে যেটুকু রস ছিল সবি বাষ্পময়,
বনস্থলীর দৃশ্য বিশ্বে জাগায় ভয়!
তরুগাত্রের রুক্ষপাণ্ডু পত্র খসে,
পল্লবহীন বৃক্ষে বসিয়া পক্ষী শ্বসে
করে প্রতীক্ষা মরণতরে।
কপিকুল ছুটে গিরিনিকুঞ্জে শরণ তরে।
সভয় গবয় জলসন্ধানে ঘুরিয়া মরে।

কেবল পিপাসু শরভদল
করভের মত ঋজুলম্বিত কণ্ঠে পিয়িছে কূপের জল।

এখানে ওখানে সহসা অনল জ্বলিয়া উঠে,
প্রবল পবনে সবল হইয়া কাননে ছুটে।
নব বিকসিত কুসুম্ভসম তাহার শিখা,
করিতেছে গ্রাস শরফুলকাশ বনলতিকা।

ধ্বংসলীলায় সে অনলশিখা গিরিকন্দরে সহসা জ্বলে,
শুষ্ক বংশ ভীষণ শব্দে বিদারি' চলে,
তৃণ প্রান্তরে ছড়ায়ে পড়ে
কাননোপান্তে মৃগকদম্বে আকুল করে।
শাল্মলীবনে ঝলমলি' নাচে দ্বিগুণ বলে,
কোটরে কোটরে কনকের মত আভায় জ্বলে।
বনস্পতির শীর্ষে শীর্ষে রচে যেন সেতু শত শিখায়
এমনি করিয়া সমগ্র বনে ব্যাপ্তি পায়,
দিগ্‌দিগন্ত দীপ্ত তায়।

গবয়-কেশরি-গজ-শার্দ্দুল সহসা সখ্য করিয়া লাভ,
ত্যজিয়া আজিকে বৈরিভাব
গিরিকন্দর হইতে সহসা বাহিরে এসে
আশ্রয় লয় নদীর আয়ত পুলিন-দেশে।

দাবানল যেথা জ্বলিছে জ্বলুক, বিফল করো না এ সাঁজবেলা।
তোমার যোগ্য নিদাঘ-ভোগ্য ক'রো না হেলা।
আজি প্রিয়ে তব তৃপ্ত নাসিকা পাটল ফুলের গন্ধ লাভে,
শীতল সলিলে স্নানের আরাম এ ঋতু ভিন্ন কখন পাবে?

কৌমুদীরাশি কোন্ কালে এত বিতরে সুখ,
কুসুমের মালা এমন করিয়া জুড়ায় বুক?

তাই বলি প্রিয়ে, ক'রোনাক এই নব নিদাঘের নিশি বিফল,
ললিত মধুর সঙ্গীতে আজি মুখর কর এ সৌধতল,
সঙ্গিনী সহ অঙ্গে ধরিয়া চীনাংশুক,
সম্ভোগ কর নিদাঘ-সুখ ॥

প্রাচীন ভারত

প্রাচীন যুগের এই ভারতের ইতিহাস পড়ি
পরিতৃপ্ত নহে মন, জন্মে ক্ষোভ তথ্য-দৈন্য স্মরি'।
ভগ্ন-শীর্ণ শিলালিপি, জীর্ণ মুদ্রা, তাম্রের ফলক,
দূর হ'তে ভাসাভাসা দেখে শুনে চীন-পর্যটক
টিপ্পণী যা লিখে গেছে কড়চায় কবে লীলাচ্ছলে,
ইষ্টক-শিলার স্তূপ মিলেছে যা, খননের ফলে
—এইত সম্বল শুধু। তাই দিয়ে জোড়া অতি ক্ষীণ
সূত্রহারা, ছন্নছাড়া, পরম্পরা-শৃঙ্খলাবিহীন,—
কৃচ্ছ্রলব্ধ ইতিবৃত্ত, তাতে মন তৃপ্তি নাহি মানে।

মনে হয় ধমনীর রক্তধারা ঢের বেশী জানে
এর চেয়ে। উড়ে যায় সেই যুগে কল্পনা আমার,
শিল্পসাহিত্যের পথে, ব্যাহত কে করে গতি তার?
স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ভ'রে তোলে সব ব্যবধানে
প্রাচীন ভারতে পুনঃ গড়ে তোলে নব উপাদানে।

সে স্বপ্নে ভারতে হেরি নরনারী বাসন্ত উৎসবে
মাতে ফাল্গুনের দিনে। নব মেঘোদয় হয় যবে
গগন-দিগন্ত ভরি, দূতরূপে মেঘেরে বরিয়া

কুটজ কুসুমরাশি অর্ঘ্য দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া
পাঠায় বিরহী তার দয়িতার লাগি আকিঞ্চন।
উদয়ন-কথা কয় গৃহদ্বারে গ্রামবৃদ্ধগণ।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তারা জীবনেরে করে উপভোগ,
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি দৈন্য, নাহি শোক-রোগ।

অর্হৎ শ্রমণগণ শ্রাবকের দ্বারে দ্বারে গিয়া
দশশীল ব্যাখ্যা করে। আভরণ সজ্জা বিসর্জিয়া,
পরিয়া চীবরবেশ, নটীগণ হয় মহাথেরী,
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ। ছিন্ন করি সংসারের বেড়ী,
জুটে দলে দলে গৃহী সংঘারামে। বুদ্ধের শরণ
লভিয়া তাহারা করে ভিক্ষুব্রত দৈন্যেরে বরণ।

এদিকে স্বগৃহে রচি ব্রাহ্মণেরা অর্ধ তপোবন
পরাবিদ্যা লয়ে করে সারস্বত জীবন যাপন।
প্রতিটি মুহূর্ত তারা জীবনেরে করে যে সফল,
নাহি ক্ষোভ, নাহি লোভ, নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোলাহল।

অতীতের সে ভারত নিত্য মোরে দেয় হাতসানি
সে ভারতে ফিরিবার উপায় যে নাই তাহা জানি।
দূরগামী পাখী পুনঃ ফিরে আসে আপনার নীড়ে।
নদী কি তেমনি কভু তার পিতৃগিরিগৃহে ফিরে?
এ যেন মরুতে রয়ে সুমেরুর হেমস্বপ্ন দেখা।
এ যুগে জনতারণ্যে মনে হয় যেন আমি একা।
নির্বাসন-দণ্ড সহি হায় কোন অপরাধে বুঝি,
মনের মানুষ যারা তাহাদের পাই না যে খুঁজি।

শোণিতে ধ্বনিত মোর তাহাদেরই কলকণ্ঠ ভাষ !
তাহাদেরি কেশবেশ-গন্ধে ভরে আমার নিঃশ্বাস।
তারা নাই, আছে সেই মেঘ, চন্দ্র, নদী, গিরি, বন,
করে মোরে জাতিস্মর, উচাটন করে মোর মন।

সে ভারত হেমপদ্ম তাহারি মৃণালকন্দ আমি,
পঙ্কে রহি তারি স্বপ্ন আমি হেথা হেরি দিবাযামী
টুটিয়া গিয়াছে আজ তার সে মৃণাল-দণ্ডখানি,
সূক্ষ্ম তন্তু ধরি তার এবে শুধু করি টানাটানি,
যত টানি তত বাড়ে, হায় মোর একি কর্ম্মভোগ।
ব্যবধান বাড়ে বটে, ছিন্ন তবু হয় না সংযোগ।

রামানুজ

(১)

রাম যাবে বনবাসে, ভরতের করে
রাজ্যধন সমর্পিয়া—বিমাতা চাহিয়া নিল বরে।
জুড়ি শর শরাসনে টঙ্কারিয়া করিলে হুঙ্কার—
"গেছে রাজ্য, ভুজবলে করিব তা' পুনরধিকার।
হলে প্রয়োজন,
যে-ই বাধা দিক তারে নির্বিচারে করিব নিধন।
রাম হবে বনবাসী স্বার্থমূঢ়া নারীর কথায় ?
ইক্ষ্বাকু কুলের চির বিহিত প্রথায়
বানপ্রস্থ পরিগ্রহ করিবেন বৃদ্ধ দশরথ,
এই হল পিতৃসত্য, এই সত্য পথ।"

একদিন রক্তমাংসে সঞ্জীবিত ছিলে যে মানুষ,
এই তার পরিচয়, হে মহাপুরুষ,
তারপর মর-নর-দেহী আর নহ,
হ'লে তুমি বাল্মীকির ভাবের বিগ্রহ।
তাই শক্তিশেলে
তোমার হ'ল না মৃত্যু প্রাণ ফিরে পেলে।

আদর্শ হইলে তুমি সর্বযুগে সকল জাতির,
সর্বদেশে, অসামান্য বীর।
যে বীরত্ব দেখাইলে তাই বিশ্বে শাশ্বত সম্পদ,
তুচ্ছ—তুচ্ছ তার কাছে মেঘনাদ-বধ।

(২)

সুপ্তবহ্নি-গিরি তুমি, শিলাঘন বক্ষ করি ক্ষত
যেই ভ্রাতৃপ্রেমধারা—শম দমে হইল উদ্‌গত
মিশি তাই সুরধুনী, নিরঞ্জনা, জর্ডনের নীরে
আত্মত্যাগী বীরদের বুকের রুধিরে,
আজ বিশ্বব্যাপ্তি লভি শত শাখে বহে সেই ধারা,
তাই বিশ্বভূমি আজও হয়নি সাহারা।
দশরথ কবে মৃত। দশরথ নয় আর পিতা,
পিতা দশশতরথ,—সব পরই আজ ভ্রাতা মিতা।
রাক্ষসেরা আস্ফালন করুক যতই ধরাধামে,
একদা বিজয়ী হবে তব ভ্রাতৃপ্রেমই পরিণামে।
ব্যর্থ হবে শত শত শক্তিশেলাঘাত
মেঘের আড়াল হ'তে সৃষ্টিধ্বংসী আয়ুধ-সম্পাত।

(৩)

পালিলে গুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে তুমি মহাশূর,
বিবেক দংশনে চিত্ত যদিও আতুর।
নয়নে বহিয়া গেছে সরযু-প্লাবন
গোপনে তা করেছ মোচন।
জগতের ইতিহাস করেছে স্বীকার
এই তো পরম ধর্ম ফলাফল না করি বিচার
নির্দেষ্টা, চালক, নেতা, শাস্তা, গুরু যা দেন আদেশ,
যত ক্ষতি হোক আর যত হোক ক্লেশ,
তাহাই তো প্রতিপাল্য। তাই মেনে চলা
সমাজ, বাহিনী, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠানে রেখেছে শৃঙ্খলা।

মারীচের মায়াজালে কি দারুণ সমস্যা তোমার !
ললাটে হানিয়া কর করিয়াছ শুধু হাহাকার।
সীতার পরীক্ষা লোকে বারবার দেখে রামায়ণে
তোমার পরীক্ষা হ'ল কত বার কয় জন গণে ?

(৪)

সসত্ত্বা সীতারে বনে রেখে এলে মিথ্যা ছলনায়
রামের নির্দেশে শেষে হয়ে নিরুপায়।
কাপুরুষ অশূরের লজ্জাভার মাথায় বহিলে
মহাশূর তাই তুমি, পার্থসম তাহাও সহিলে !
ধৈর্য সহ বীর্যের মিলন
বীরত্বের ইতিহাসে এও অতুলন।
শক্তির প্রয়োগ বটে বীরধর্ম জানে সর্বজন,
আরও বড় বীরধর্ম সমুত্থিত শক্তি সংযমন।

পিতৃসত্য পালনেরে জাবালি বলিয়াছিল ভ্রম,
বলেনি সে ভ্রান্তি মাত্র কঠোর সংযম।
যুগে যুগে এল কত মতবাদ, কত ধর্ম-প্রথা,
আজও ত্যাগ সংযেমেরে কেহ কভু বলেনি মূঢ়তা।
নিরীশ্বর যারা, তারা ধর্ম বলি করেছে স্বীকার
সংযমেরে, মানেনিকো অন্য ধর্ম আর।

(৫)

পরিমূর্ত হে সংযম, শিবধর্মময়,
জীবধর্মে উগ্রতপে করিলে কি জয় ?
চতুর্দশ বর্ষ ধরি কি কঠোর তপস্যা তোমার !
অনশন অনিদ্রা তো তুচ্ছ কাছে তার।
তোমার তাপস-নেত্রে ভ্রাতৃবধূ নারী নয়, দেবী—
পাইলে কি মহাশক্তি তাঁহারি চরণযুগ সেবি ?
চতুর্দশ বর্ষ ধরি বীর তব সংগ্রাম বরণ
জয়ী তুমি, তার কাছে লঙ্কাজয় গোষ্পদতরণ।
শ্রীরামের দীর্ঘ বনবাস
তপশ্চর্যা নয় তাহা, ছিল তার যৌবন-বিলাস।
তুমি নিলে তপস্যার ভার,
কপি-বলে নয়, তব তপোবলে সীতার উদ্ধার।
যেই সত্য পালিলেন রাম
দেশকাল পাত্রে তাহা পরিচ্ছিন্ন, হারায়েছে দাম।
স্বয়ংবৃত যেই সত্য, সত্যসন্ধ, করিলে পালন,
সর্বযুগে সর্বদেশে সত্য তাহা নিত্য চিরন্তন।

ধ্বংসাবশেষ

পূজার সময় সেটা, মাসীমার সাথে,
মনে পড়ে, তাঁদের সে ফুলগাঁয়ে গেলাম বেড়াতে।
বয়স তখন হবে বছর এগারো,
হয়তো বা কমই হবে আরো।
জমিদারবাড়ি পূজা, ভারি ধুমধাম,
প্রথম ধনীর গৃহে পূজা দেখলাম!
'দীয়তাং ভুজ্যতাম্',—হৃৎকম্পনী সেকি বাদ্যঘটা!
বেলোয়ারী ঝাড়ে ঝাড়ে, শামাদানে আলোকের ছটা!
ছাগ মেষ মহিষের খড়েগ বলিদান,
নালী দিয়ে রক্তের তুফান।
দেখলাম মা-তুর্গারে বানায়ে রাক্ষসী
সুরামত্ত অসুরেরা নৃত্য করে আস্ফালিয়ে অসি।
পূজার দালান
দেখলাম, হয়েছে তা পশুর শ্মশান।
যাত্রাগান, কবিগান, বাইনাচ, পাঁচালি, ঝুমুর—
সারাটি গ্রামের চোখে নিদ্রা করে দূর।
বয়ে আনে ভারে ভারে ভারী, বাঁকী, গাড়ি
জমিদারি থেকে ঘৃত, দধি, তুগ্ধ, ফল, তরকারি।
বাড়ির উঠান
আধখানা যেন হাট, আধখানা মৎস্যের মশান।
বাড়ি বাড়ি হাঁড়ি বন্ধ তিন দিন ধরি',
গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা, দধি, মাংস খায় সবে পেট ভরি,
বারোমাস খেয়েছে যে গুঁতো লাথি জুতোর প্রহার,
উড়ায় সে সব স্মৃতি করিয়া উদ্গার।

দশবিঘা জমি জোড়া দেখি নাই এত বড় বাড়ি,
দেখি নাই, পুরুতের এত লম্বা দাড়ি ॥
পঞ্চাশ বছর পরে গেলাম সে গ্রামে
রাস্তাটা হয়েছে পাকা, বাসে চ'ড়ে সহজে আরামে,
বিবাহের নিমন্ত্রণে আত্মীয়কন্যার।
দেখিনু স্বাধীন বঙ্গে শ্রী ফিরেছে সারা গ্রামটার।
অবাক হলাম দেখে জমিদার বাড়িটার রূপ
এখন তা লৌহ, কাষ্ঠ, ইষ্টকের স্তূপ,
প্রেতের তাণ্ডবে কিংবা বোমার আঘাতে।
উঠেছে অশ্বত্থ বট ন'বৎখানাতে,
ন'বৎ বাজায় আজো, তাদের শাখায়
পাখীরা সন্ধ্যায় প্রাতে, বানায়ে কুলায়।
নাটমন্দিরের কটি স্তম্ভ আছে খাড়া
ভগ্নচূড় দম্ভ যেন তারা।
চড়ানো খড়ের চাল একধারে ইঁটের দেওয়ালে
হোমভস্ম টিকা যেন গৌরাঙ্গীর পলিত কপালে।
সে বংশের দুটি শীর্ণ নরনারী করি সেথা বাস
দু'টি রুগ্ন শিশুশিরে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
নাই আর জানালা-দুয়ার,
ইট-কাঠ বেচি তারা কোন মতে চালায় সংসার।
সে সৌধের অঙ্গগুলি বাড়ি বাড়ি পৈঠা হয়ে রয়,
সতর্কতা শিক্ষা দেয় পদক্ষেপে, নিজে পেয়ে ক্ষয়।
মেয়েরা কাপড় কাচে ঘাটে ঘাটে তাদের উপরে।
উই-ধরা কড়িকাঠ চাঁছা খুঁটি এবে ঘরে ঘরে।
শুধালাম এক বৃদ্ধে—"একি!
বিরাট সে কোঠাটার হেন দশা কেন আজ দেখি?"

সে শুধু বলিল—"অষ্ট ম-কারের স্পষ্ট পরিণাম!"
আমি বলিলাম—
"ম-কার তো জানি পাঁচ, বাকি তিন? বলুন আমায়।"
সে বলিল—"মোসাহেব, মহাজন, মামলা,—মশায়!"
ভাবিলাম,—এ ধ্বংসাবশেষে
এই গ্রামে দলে দলে এসে
আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-গবেষক পুরাবৃত্তকার
বাঙালার ইতিহাস করুক উদ্ধার॥

চৌরঙ্গীর পথে

ট্রামে চড়ি যাই নিত্য ছাড়ি প্রাণাচার্যের আবাস;
পিছে রাখি কারা-পুরী ফেলি যেন মুক্তির নিশ্বাস।
বামে মোর উদার-প্রান্তর,
পিঞ্জর-শৃঙ্খল-মুক্ত দৃষ্টি মোর লভে নীলাম্বর।
সারি সারি বনস্পতিগণ
আধঘুমে অষ্টাদশ শতাব্দীর হেরিছে স্বপন।
পল্লব-হিল্লোল-চল তাদের নিশ্বাস
দুইশত বৎসরের কয় ইতিহাস।
এ পথে পথিক হাঁটে কম—
তাদের শীতল ছায়া দূর করে পতঙ্গের শ্রম।
দূর্বাঘন মাঠখানি নয়ন জুড়ায়
মনে হয় এই পথ যেন না ফুরায়।
এদিকে যানের বেগ বাড়ে অতিশয়,
'ভাল করে পেখন' না হয়।
বৃথাই আক্ষেপ করে অভাগা রসিক,
যা কিছু সুন্দর বিশ্বে তাই ত ক্ষণিক।

সারাটি নগরে শুধু কর্ম কোলাহল,
খেলার উল্লাসে ভরা মুক্তিতীর্থ মাঠটি কেবল।
এ মাঠ জাগায় মোর শৈশবের স্মৃতি,
প্রফুল্ল রাখালী-তৃপ্তি, উল্লসিত পল্লীভরা প্রীতি।
ধূলিধূমহারা শুচি দুর্লভ পবন
লভিয়া পিপাসু নাসা করে তাহা আকণ্ঠ সেবন।
আমি যেন দিই নিত্য যমুনায় পাড়ি,
ডাহিনে সৌধের মালা শোভে সারিসারি,
বামে শত শত ধেনু সুখে তৃণ করিছে ভোজন,
মথুরার পরপারে যেন বৃন্দাবন।

নিমগাছ

বড়ই মিঠা হলো যে নিমপাতা
নিমের ফুলের গন্ধ পেলে চমকে উঠে চাই,
পথে যেতে গুটিয়ে নিয়ে ছাতা
একটুখানি জুড়াই যদি নিমের ছায়া পাই।
মনে পড়ে নিরিবিলি তালপুকুরের ধার,
ঝোপে ঘেরা ঘাটে সে নিমগাছ।
ঝিকিমিকি বিকাল বেলা ছায়ার তলে তার
ছিপটি ফেলে বসে থাকা, ধরছি যেন মাছ।
চন্দনে নিম পরিণত, মিষ্ট নিমের পাতা
কেন? শুধু তুমিই জানো, অন্যে জানে না অ।

বিম্বফল

পল্লীবনের কোণে নগণ্য নিম্বতরুটি হেরি
তাহারে ধন্য করেছে বন্য বিম্বলতাটি বেড়ি।
ঝুলিছে তাহাতে অরুণ বরণ পক্ক বিম্ব-ভার
কি ধন অঙ্গে বুঝে কি নিম্ব তার ?

বুঝে সেকি কত ব্রজগোপিকার কত না বৈশালীর
কত মালবিকা শৌরসেনীর, কত না পাঞ্চালীর
বিম্বাধরের চুম্বন-সুধারাশি
কত না অতীত প্রণয়মথিত হাসি
পুঞ্জিত হয়ে, বিম্বিত হয়ে বিম্বগুলিতে জাগে
উষার অরুণ রাগে ?

দেখি আর ভাবি মনে
বিম্বাধরারা খেলিতেছে নাকি হোথা কোকনদ বনে ?
তাহা যদি নয়, মাতিল কি হোথা বাসন্ত উৎসবে
ফাগুয়া খেলায় অবন্তিকার সীমন্তিনীরা তবে ?

চঞ্চু আঘাত করে শুকপাখী মিটাতে কিসের ক্ষুধা ?
ও কি বুঝিতেছে ওতে জমা আছে কত অধরের সুধা ?
নব জন্ম কি লভি
শুক পাখী হয়ে এলো হোথা কোন' উজ্জয়িনীর কবি ?

ব্যোমের কবি

নীড়ের গানে, বনের পাখীর ভিড়ের গানে,
যা শুনি তার বুঝ্‌তে পারি সরল মানে।
তার মাঝে পাই বনের বাণী,
তরুলতার মনের বাণী,
পাখীর সুখের দুখের সে সব খবর আনে॥

শুনি তাতে নিত্য উষার আগমনী
শুনি তাতে দিবালোকের বিসর্জনী।
পাখীর ক্ষুধা তৃষার কথা
সেই গীতিতে জাগায় ব্যথা,
শুনি তাদের সহজ প্রেমের আলাপনী।

বুঝি নাক উড়ো পাখীর গানের ভাষা,
তার গানে রয় রহস্যময় কোন পিপাসা ?
মুক্ত উদার আকাশতলে
কি বার্তা সে দিয়ে চলে ?
চিন্তা কতই করে স্বতই যাওয়া আসা।

অসীম লোকের বার্তা কি রয় তাদের সুরে
কোন অজানার বাণী তারা বয় সুদূরে ?
মুক্তি সুখের তৃপ্তিধারা
মুক্তাসম ঝরায় তারা ?
তারা কি সব ব্যোমের কবি, বেড়ায় উড়ে ?

দিনশেষের গান

চিন্তা কি আর দিন তো এলো ফুরিয়ে।
ক্ষতি-লাভের খতিয়ানে দিই তুড়িতে উড়িয়ে॥
অস্তরবির বিদায়-কিরণ
ছড়ানো শেষ মুঠার হিরণ
ছন্দপুটে বন্দী করে যাচ্ছি রেখে কুড়িয়ে॥

বলাকারা ধায় অসীমে পাখছানিতে যায় ডেকে,
মনের ডানার ঝটপটি সার, উড়তে সে চায় তাই দেখে
দিগন্তের ঐ সন্ধ্যামণি
পাঠায় রঙিন আমন্ত্রণী
দূর সাগরের উদাস হাওয়া তপ্ত হৃদয় দেয় জুড়িয়ে॥

নেই কোন যান চলার পথে, সবার এ পথ হয় হাঁটিতে।
লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি খেয়া-নায়ের পারঘাটিতে।
বনের পাখী গায় পূরবী—
কয় তারা, 'ভয় কিসের কবি?'
ছায়ায় ছায়ায় পায়ে পায়ে শুকনো পাতা যাই গুঁড়িয়ে॥

জ্ঞানের চেয়ে কাজের চেয়ে ভেবেছিলাম কথায় সার,
ভাপে ভরা কথার ফানুস—তাও যে এখন লাগছে ভার।
চাই যে এখন নীরবতা,
ফুরিয়ে এলো আমার কথা,
কালের রাখাল ছাড়ল ধেনু, নটেগাছ সে খায় মুড়িয়ে॥

ভারতের বর্ষা

বরষা, এ দেশে বরষে বরষে সরসিত কর প্রাণ,
প্রাংশু নিদাঘ-দৈত্যের দাহ হইতে করিয়া ত্রাণ।
নবযৌবন-হিল্লোলে ভরো নদী পল্বল কূপ,
দাও প্রান্তরে বনকান্তারে শ্যামকান্তির রূপ।
তোমার পরশে জরতী প্রকৃতি কৈশোর ফিরে পায়,
তরুলতাতৃণ পাখী-পশু-মীনও পুনর্জীবনে ভায়।
অন্নদেবের হোমের কুণ্ডে হবি বর্ষণ কর',
স্তন্যের ক্ষীর দিয়া চাতকীর কণ্ঠের তৃষা হর'।

তব বর্ষণ রোমহর্ষণ সঞ্চারে দেহে দেহে,
প্রিয়জনগণে একঠাঁয়ে জড়ো কর তুমি গেহে গেহে।
ব্যোমদেব যেন সোম-তপনেরে গ্রহতারকারে ভুলি
বিরহ-তাপিতা ধরণীরে নিজ কোলে নিতে চায় তুলি।
রোদসী ভরিয়া উৎসবে উড়ে দামিনীদামের কেতু,
দ্যুলোক-ভূলোক-মিলনের পথে রচো তুমি মেঘ-সেতু।
সেই সেতু 'পরে নামে ঘর্ঘরে বজ্রপাণির রথ,
কল-কাদম্ব-গীতে মুখরিত সারা অম্বরপথ।

দিব্য দেশের দূতী তুমি, কভু সভ্য দেশের নও,
আমাদেরই কানে স্বপন-বারতা গোপন কথাটি কও।
সে দেশে এমন বিস্ময়ঘন বিশ্বের নবায়ন
করে কি কখনো কবির নয়ন হৃদয় বিস্ফারণ?

তোমার দৃষ্টি করে আমাদের সৃষ্টি-প্রেরণা দান,
বর্ষে বর্ষে রচি তাই মোরা তব বন্দনা গান।
যুগে যুগে তুমি ললাটিকা চুমি আমাদেরে কর কবি,
কাব্যজগতে অপূর্ব যাহা তুমিই দিয়েছ সবই।

অশেষ তোমার রসভাণ্ডার ভরে নিয়ে ডালি থালি
বহু শত কবি বহু শতকেও করিতে পারে নি খালি।
তব দানই হ'ল মোদের কাব্যে মৌলিক স্বকীয়তা,
অপরে জানে না তোমার সঙ্গে হয় যত গূঢ় কথা।
প্রকৃতি-মাতার পূজারী বলিয়া দেশে দেশে যারা খ্যাত,
তব ভাণ্ডারভরা উপচার তাহাদের অজ্ঞাত।
আমরা জিতেছি, অনাদৃত হয় হোক আর সব গান,
রবে তব গীতি ভরি সারা ক্ষিতি অক্ষয় অম্লান।

জন্মমাস

দীর্ঘ তপ্ত পথ বাহি আসিলে আষাঢ়
ধরাপরে, চরাচরে করি পুনঃ আশার সঞ্চার।
মেদুর মোহন ঘন তব ইন্দ্রজাল
স্বর্গে মর্তে ঘুচাইল মন্মুময় বহ্নি-অন্তরাল।
জ্বালাময় ব্যোমে ব্যোমকেশের নয়ন
জুড়াইয়া দিলে তুমি রসাঞ্জন করি বিলেপন।
স্বপ্ন দিয়া স্মৃতি দিয়া তুলিলে গড়িয়া
পুরাতন এ ভুবনে নূতন করিয়া।

উপশান্ত রুদ্রের শাসন
কূটজ কুসুমে গিরি রচিয়াছে তোমার আসন,
তোমারে জানাই বন্ধু সমতলে স্বাগত ভাষণ।
তুমি মুক্তিদাতা।
ধূলিতলে শুষ্ক বীজ অঙ্কুরিয়া তুলিতেছে মাথা।
অশনিবিষাণ শুনি আজি দলে দলে
দূর্বার দূর্বার সেনা মরুজয় অভিযানে চলে।
তোমার স্পর্শনে
ভূলোক পুলকাঞ্চিত কদম্ব হর্ষণে।
কাদম্ব বলাকা
তোমারে ভেটিতে ছুটে সঞ্চালিয়া পাখার পতাকা।
ভেকেরা মুখর হল, নয় আর ভুখারী ভিখারী,
নান্দীর বন্দনা গায় মহোৎসবে মাঙ্গল্য সঞ্চারি'।
চাতকীর কাকুতিতে বিশ্বতৃষা করিলে হরণ,
কেতকীর ভাঙ্গিল স্বপন।

আষাঢ়, তোমারে ভালবাসি ;
তুমি যে জাগাও মনে প্রত্নস্মৃতিরত্ন রাশি রাশি,
গুরুগুরু মন্দ্রে তব শুনি সেই মন্দাক্রান্তা তান,
দুরুদুরু করে বুক, উড়ু উড়ু করে মোর প্রাণ।
মনে জাগে সিপ্রা, রেবা, গম্ভীরার তীর।
বিন্ধ্যকূটে জম্বুবন, রামগিরিশির।
বলাকাপংক্তির মত জন্মজন্মান্তর
জাগে এ মর্মের মেঘে, তুমি মোরে কর জাতিস্মর।
তোমারি সে সান্দ্রঘন চন্দ্রাতপছায়ে
পাইলাম একদিন জননী ধরণী দুই মায়ে।

বর্ষার রূপ

বরষার রূপ দেখিতে পাই না নগরের জানালায়।
কল্পনা মোর পল্লী মাঠের আলি পথপানে ধায়।
চাল থেকে জল হাজার ধারায়
ঝালরের মত সেথায় গড়ায়।
তারি ফাঁক দিয়ে বরষার রূপ দেখিবারে সাধ যায়॥

পথ দিয়ে হেথা ছুটে জনধারা ছুটেনাত জলধারা।
টইটুম্বুর দীঘিটি হেথায় হয় না সোপানহারা।
কপোত এখানে ঘরের সাঙায়
মানিনী বধূর মান না ভাঙায়।
ভিজে পাখা ঝাড়ি চড়ুই ফুকারি আশ্রয় নাহি চায়॥

দাদুরীর গানে হয় না হেথায় মুখরিত সারা নিশি।
হয় না যূথিকা কেয়া কদমের গন্ধের মেশামিশি।
বৃথা ঝরে হেথা বিধাতার দান,
শীতল করে না কারো দেহ প্রাণ।
বর্ষা তো কালো পল্লীদুলালী হেথা না মানায় তায়॥

কুন্দ*

অতসী গাঁদা হেম-গরবে মগন সুখ স্বপনে,
দৈন্য-হিমে,—ফুল না ভুল?—জাগিনু হেথা গোপনে।
তাদের আভা লভিয়া মম
অশ্রু হলো ভূষণসম,
সকলে ক্ষম সাহস মম, বরিতে ঋতুরাজারে
পুষ্পময় শুভ্র লাজ আমি এ বন মাঝারে।

বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিনু যাহা তুষারে,
অলিরে সঁপি মাধুরীটুকু পরাগ সঁপি উষারে।
ফুটায়ে প্রিয়া-দন্ত-রুচি
কবিরে সঁপি হর্ষ শুচি,
রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি পরশে।
পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে হরষে।

ফুটেছি আমি, কচি কুঁড়িতে হয়নি মোরে ঝরিতে,
তুচ্ছ হোক—সবিত মোর পেয়েছি দান করিতে।
এ সুখময় সার্থকতা
গর্বে স্মরি! কিসের ব্যথা?
আদর প্রীতি উপরি পাওয়া না মেলে যদি কি ক্ষতি?
ফোটার সুখে বেদনা তৃষা লভেছে সবি তৃপতি॥

* কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ কুন্দের প্রথম কবিতা

বঙ্গভূমি

[গান]

নমি শ্যামা মৃগাজিন-বসনা।
কূজন-গুঞ্জ-কল-ভাষণা।
মঠে মঠে পূজা তব তটে তটে বৈভব,
দেশে দেশে তব যশোঘোষণা॥

ঘনবট-সুশীতলা, নবঘন-কুন্তলা,
সরসিজ-বিলোচনা, স্ফুট-নীপ-কুণ্ডলা,
উশীরাম্বুচর্চিতা ধূপদীপে অর্চিতা—
কুন্দকোরক-রুচি-দশনা॥

স্নেহ তব খনিভরা, তনুভরা বনভূষা ;
শ্রিতফণি-মণিমালা, ধৃতহেম-মঞ্জূষা ;
গিরি-বন্ধুরদেহা বেতস-কুঞ্জগেহা,
বিরচিত-মীনযূথ-রশনা॥

হ্রদনদগদ্‌গদ-মধুনাদবন্দিতা,
চমরীবীজিতকায়া মৃগমদগন্ধিতা,
সিন্ধুদোলনধৃতা, সুরধুনী-ধারাপূতা,
তুষার-সুশীত-সিতহসনা॥

সংবাদ পত্রপাঠে

অমৃতবাজারে মৃতের খবরই পড়ি প্রাতে বিধিমত,
সংবাদ পাই দুই-চার শত অন্তত হতাহত।
রেলে কলিসন, বিমান পতন, মোটর দুর্ঘটনা,
নৌকা ডুবিল লাগিল আগুন—পুড়ে গেল কতজনা।

জন চল্লিশ চাপা প'ড়ে গেল—খনিতে নামিল ধ্বস,
ভীষণ ডাকাতি, খাদ্যের বিষে মরে গেল জন দশ।
হরেক রকম দাঙ্গা জখম, সহসা বিস্ফোরণ,
আত্মহত্যা—তাতেও অক্কা পেয়েছে দু-চারজন।

এ ছাড়া মড়ক আছে,
কতক মরেছে, কতক ধুঁকছে, দুই-চারজন বাঁচে।
বড় বড় অক্ষরে
এসব জবর জরুরী খবর নিত্যই চোখে পড়ে।

মনটা বিষিয়ে থাকে,
হাসপাতালিয়া গন্ধ একটা বহুখন রয় নাকে।
চারিদিকে যায় পাওয়া
রাশ রাশ লাশে ভরা ধূমময় শ্মশানের আবহাওয়া।

স্মরণে রাখিলে সকাল বেলার অপ্রিয় সংবাদ
দিনের অন্ন হয়ে যেত বিস্বাদ।

এরই মাঝে রয়ে যন্ত্রের মত নিজ কাজ ক'রে যাই,
গল্পগুজব ঝগড়াও করি হাসি-খেলি খাইদাই।

সিনেমাও দেখি, কবিতাও লিখি, বলখেলা দেখি মাঠে।
প্রাতের খবর সব ভুলে রাতে ঘুমাই স্প্রিঙের খাটে।
ট্রামে বাসে যেতে সাথী হয় বটে দুর্ঘটনার ছায়া,
অফিস টেবিলে সব হয়ে যায় মায়া।
এ দেহ আরাম বিরাম যখন চায়,
সত্য ঘটনা উপন্যাসের ঘটনা হইয়া যায়।
প্রাতে খবরের কাগজ যাহারা পড়ে
এমনি করিয়া মৃত্যুর সাথে তাহারা দোস্তি করে।

চিতার ভস্মসারে ঘন হয়ে শ্মশানে গজায় ঘাস,
গোরু-ছাগলেরা পেট ভ'রে খায় নির্ভয়ে বারো মাস।
মরার মাথায় খুলি-তে যে জল ধরে
গ্রীষ্ম দুপুরে পাখি এসে উড়ে সে জলে তৃষ্ণা হরে।

মুর্দফরাশ তারই মাঝখানে ঘরকন্নাটি পাতে,
চিতার আলোয় তার ছেলেমেয়ে আমোদে খেলায় মাতে।
খবরগুলিরে কবরে পুঁতিয়া আমরাও ভুলে যাই,
এই দুনিয়ার শ্মশানে রহিয়া খাইদাই মাতি গাই।

একই ধারা প্রতিদিন
সব সয়ে যায়, মন হয়ে যায় কিণাঙ্ক-সুকঠিন।

মেঘের দৌত্য

কোন' রাজা যদি বলিত তোমারে—"শোন দেখি বলাহক,
শ্রীমন্তসেন সামন্তরাজ সীমান্ত-রক্ষক,
তার কাছে এই বার্তা জরুরি
নিয়ে যাও দেখি মিলিবে মজুরি!
জানো আমি রাজা, কোটি মানুষের অদৃষ্ট নিয়ামক!"

তা শুনি তোমার ধৈর্যচ্যুতি হইতই নিশ্চয়!
ভুবনবিদিত বংশে জনমি এত অপমান সয়?
একে যে প্রণয়ী তাতে যে বিরহী—
তাহার করুণ আবেদন বহি'
ধন্য হইলে, তুমি যে দরদী বিদগ্ধ রসময়।

ধন্য হইয়া যাত্রা করিলে তাই ত গর্বভরে,
বিজুরি চমকে গুরু গুরু ডাকে মাতাইয়া চরাচরে,
বারিকণা সহ তৃষিত ধরাতে
প্রণয়ানন্দ ছড়াতে ছড়াতে
নাচায়ে শিখারে ফুটায়ে কূটজ কদম্ব থরে থরে।

শুধু তাই নয়, যক্ষবধূর শুনেছিলে বর্ণনা,
তারে নিজ চোখে হেরিতে রসিক করনিকি কল্পনা?
ম্লান মুখে তার ফুটাইতে হাসি
ছিলে না কি, দূত, তুমি প্রত্যাশী?
ছিল না কি লোভ পাইতে তাহার আতিথ্য-বন্দনা?

মহামতি কেরী

কেরী, তোমায় কল্পনাতে হেরি এবং ভাবি
কী না তুমি ছিলে, তোমার কোন ব্রতে নাই দাবি।
জীবনপ্রাতে হাতে খড়ি হল তোমার তাঁতে,
দিনে তোমার জুতা সেলাই, চণ্ডী-পঠন রাতে।
ধর্মগুরু হলে শেষে চর্মকারুকর,
সূত্রধরের পুত্রবরে জানিলে ঈশ্বর।
নানা ভাষায় তাঁহার সাথে কইলে কত কথা,
বইলে তুমি চির জীবন ক্রুশ-বেধের ব্যথা।
ধর্ম দিয়ে করতে এলে পতিতে উদ্ধার,
ব্রত হল গোটা পতিত্ জাতির সংস্কার।
তার ভাষারে নিবেদিলে ইষ্টদেবের পায়,
দৈন্য বরণ করলে দীনা ভাষার মমতায়।
তাঁতীর ছেলে দেশী সূতায় করলে যা বয়ন
হল তাতেই গোটা জাতির লজ্জা নিবারণ।
জমিন পাইট করলে কৃষাণ, যে বীজ বপন তরে
সে বীজ বোনা হল না, তা রইল পড়ে ঘরে।
তৈরী জমি পেলাম মোরা সেটাই পরম লাভ,
ফলছে ফসল ঘুচছে তাতে মনের অন্নাভাব।
পারি নি স্থার নিতে তোমার ইষ্টদেবের বাণী।
এদেশে তা নয়কো নতুন, আগে হতেই জানি।
তুমিই বরং যা দিলে তা নতুন বটে গুরু,
সেই দানেতেই হল মোদের নতুন জীবন শুরু।
গড়লে তুমি যে বিচিত্র গির্জা-ঘরের ভিত,
বাণীর পূজা করছে সেথা শতেক পুরোহিত।

গোধূলি

পশ্চিম দিগন্তে রবি ডুবি ডুবি করি
এখনো ডুবেনি, অস্ত-সাগরের তরঙ্গ উপরি,
উঠে নামে, যেন নাচে। মেঘের চিকুর
ঢাকে, পুন মুক্ত করে দিগঙ্গনা-সীমন্তে সিঁদুর।

অন্যমনে দেখি তাই, ভুলে যাই দিবা-অবসান।
তুরন্ত ফিরিছে নীড়ে আকাশে উড়ন্ত যত গান।
রাখালের বেণু তোলে গোঠ-পথে পূরবীর সুর,
উদাসী পিয়াসী কানে লাগে সুমধুর।

ধেনুদল আসে ফিরে যেন দুধগঙ্গার তুফান,
বধূরা ফিরিছে ঘরে তুলি ঘটে কাঁকনিয়া তান।
হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্তপদে সন্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্কক্ষেতে জলসেচ সারি।

আলোক ফিরিয়া যায় দৃষ্টিপথ হতে ধীরে ধীরে,
ফেরার সময় এটা আমারেও যেতে হবে ফিরে,
কোথায় কে জানে?
যেথা হতে আসিয়াছি হয়তো সেখানে।
রক্তচন্দনাক্ত ভাল চেলাম্বর পশ্চিম গগন,
এই তো সে গোধূলি লগন।

এ জীবনে সুদীর্ঘ গোধূলি,
আসন্ন যে মহাযাত্রা বারবার যাই তাই ভুলি।

ধরার বন্ধনজাল ছেদিবার কিছু অবসর
দিতে বৃথা এ অধমে ডুবে নি কি দেব দিবাকর?

বিরহিণী

সখীরা চলে গেছে গা ধুয়ে ঘরে ঘরে
গাগরী ভরি কালো জলে,
এখনো দীঘিনীরে ডুবায়ে তনুটিরে
কে করে দেরি কোন্ ছলে?
দশনে কাটিতেছে পাপড়ি কমলের
কে অই করে জলখেলা,
গাগরী ভরে আর ঢালিয়া ফেলে জল
শুধুই ভরা আর ফেলা।
সারাটি দিন ধরে দহেছে খরতাপ,
শীতল জলে অবগাহ
আরামদায়ী বটে, কিন্তু ওর কেন
কিছুতে ঘুচিল না দাহ?

সন্ধ্যাতারকাটি কখন উদিয়াছে
চাহিয়া আছে তার পানে,
তীরের বেণুবনে জোনাকি চমকায়,
ঝিঁঝিঁরা ডাকে একতানে।
পাখীর কলরব থামিয়া গেছে, তারা
নীড়ের বাহিরে না রয়।
আঁধার ঘনাইছে ফিরিতে বনপথে,
ওর কি করিবে না ভয়?

বড়ই সাধ যায় শুধাই গিয়ে তায়
কে তুমি ঘাটে একাকিনী,
ফিরিয়া যেতে ঘরে কেন না টান পড়ে
তুমি কি তবে বিরহিণী ?

দীপশিখা

বিজলীর বাতি জ্বলে বড় বড় শহরে
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।
দীনের কুটীরে গ্রামে, বস্তির ভিতরে
দীপশিখা জ্বলিতেছ চিরদিন।

তিন শ' বছর আগে যতগুলি জ্বলিতে,
তারো বেশী জ্বলে আজ, কমে নাই।
কুটীর বেড়েছে ঢের তাই চাই বলিতে,
তোমার প্রতাপ আজো দমে নাই।

'বিজলীর যুগ এটা'—বিলাসীরা বলিছে,
সারা দেশে নজর যে পড়ে না।
দেখে না যে লাখ লাখ দীপ আজো জ্বলিছে
কাঙালে মানুষ বলি' ধরে না।

বিজলীতে শহরের রাতগুলি হোক দিন,
গ্রামে গ্রামে তুমি অমরতা পাও।
কুটীরের চন্দ্রমা রও তুমি অমলিন,
নয়ন না ঝলসিয়া আলো দাও।

প্রাঙ্গণে তুলসীর ডালে ডালে বাঁধি তার,
বিজলীর বাতি সাঁজে জ্বলিবে ?
মন্দিরে পূজারীর বাল্‌ব হাতে প্রতিমার
নিত্য আরতি কি গো চলিবে ?

দীপশিখা তব আলো পোড়া আঁখি জুড়াবে।
ফুরাল তোমার দিন কে বলে ?
আকাশে তারার দিন কখন' কি ফুরাবে
বিজলী জ্বলিছে বলি ভূতলে ?

বিশ্ববিরহ

বিশ্বনাথ, তব বিশ্বে তুমি বুঝি শাশ্বত বিরহী !
কত যুগ রবে তুমি এ বিরহ সহি ?
ষড়ৈশ্বর্য অধিগত, এত তব প্রচণ্ড প্রতাপ
তবু হায় বহিতেছ কার অভিশাপ ?
বুঝিবা প্রেমের রাজ্যে বিচিত্র বিধান,
সেথা তুমি অসহায় মোদেরি সমান !

জাগে অহরহ
গগনে গহনে মেঘে গিরিশৃঙ্গে তোমার বিরহ।
মেরুতে গম্ভীর রূপ মরুতে তা করে হাহাকার।
শুষ্কপত্র মর্মরিয়া বেণুবনে বহিছে বাতাস।
সে ত তব মর্মভেদী তাপিত নিশ্বাস !
তোমার বিরহলিপি তারার অক্ষরে
নিশি নিশি ছল ছল জ্বল জ্বল করে।

তব অশ্রুজল
প্রপাতধারায় নামে গিরিগাত্র ভেদি অবিরল।
তুমি যদি বিরহী না হবে
মানবজীবনে কেন এত আর্তি তবে?
তোমার মাথুর
করিতেছে নিত্য সর্ব জীবেরে আতুর।

প্রিয়া কি তোমার অভিমানে
দূরে রহি তব মর্মে শল্য শেল হানে?
মানভঞ্জনের তব সব আবেদন
দূতীমুখে ব্যর্থ হয়, হয় না সে প্রিয়ার তোষণ?

কবি তুমি, গাহিতেছ বিরহের গান
নদীনদে তাই বুঝি গদগদ সকরুণ তান?
বরষায় মেঘদূত, হংসদূত রচিছ শরতে,
নিদাঘে পবনদূত, অলিদূত বাসন্ত জগতে।
সেই গীতি অবিরত কর্ণে পশে আসি
অকারণে করিতেছে তাই বুঝি কবিরে উদাসী?

প্রিয়া যবে কণ্ঠলগ্না বক্ষ যবে তার দুরু দুরু,
তখনো তাহার মন তাই বুঝি করে উড়ু উড়ু।
এ বিরহ কবে হবে শেষ?
রহিবে না এ ভুবনে বিষাদের লেশ?
আনন্দময়ীর সাথে কবে তব হইবে মিলন?
শূন্যে নয়, করিবে হ্লাদিনী হ্রদে বিশ্ব সন্তরণ!

বিস্ময় ধর্ম

দীর্ঘ আয়ুর পথটি এলাম হেঁটে
দ্বিধাসংশয়ে জীবন তো গেল কেটে।
সমাধান কিছু পাইনিক খুঁজে বিজ্ঞানে দর্শনে
সংশয় তারা ঘনায় নূতন প্রশ্ন জাগায় মনে।
পরম সত্য কি যে তা হলো না জানা,
প্রখর রবির আলোক-ধাঁধায় হয়ে রহিলাম কানা।

গভীর নিশীথে মহাকাশে যত চাই
মহাবিস্ময়ে কিছুতে পাই না থাই।
মহাশূন্যের লাখ কোটি কোটি তারা
সবাই সূর্য, ভাবিতে একথা হয়ে যাই দিশেহারা।
বেদবেদান্ত পাঠের আমার হয় নাক প্রয়োজন,
বারি-বিম্বিত চন্দ্রের মত মনে হয় এ জীবন।

কোন্ কুহকীর হেরি এ ইন্দ্রজাল!
সকলি স্বপ্ন, মায়াময় দেশ-কাল!
মহাবিস্ময়ে ডুবে যায় মোর ইহলোক পরলোক,
আত্মা, জন্ম-জন্মান্তর, সংসার, তাপ-শোক,
স্বর্গ-নরক, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের ভেদ,
ষড়্‌দর্শন তন্ত্র-মন্ত্র বেদ।

মৃত্যুরে বুঝি ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ মাঝে লয়,—
গাঢ় সুপ্তিতে স্বপ্ন-লুপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।
বিস্ময়ঘন বিশ্বে বৃথাই সত্যের সন্ধান,
লবণ-পুতুল কেমনে জানিবে সিন্ধুর পরিমাণ?

তারার জ্যোতির অক্ষরে লেখা অসীম গ্রন্থখানি
যত পড়ি তত ডুবি রহস্যে ঘটে যে বুদ্ধিহানি।
উর্ধ্বে চাহিলে হেরি যে বিশ্বরূপ
তায় থরথর কাঁপে অন্তর মিলায় বস্তুস্তূপ।
মহা-বিস্ময়-সিন্ধুতে হয় চেতনার অবসান,
এ জীবন যেন স্বপ্ন-বিম্ব ক্ষণিক স্পন্দমান।

সকলি মিথ্যা জীবন ভুবন দেহ-গেহ কাল-দেশ ?
সত্য কি শুধু এই বিস্ময়াবেশ ?
এই জীবনের প্রান্তে আসিয়া হয় শুধু অনুভব,
ধর্ম কেবল সব্যসাচীর বিশ্বরূপের স্তব।
ভক্তি কর্ম জ্ঞানেরে অতিক্রমি
বিস্ময়ে যাঁর চরম প্রকাশ তাঁহাকেই শুধু নমি।

জলধর

(গান)

মিলনের দিনে গগন ভরিয়া কত বার এলে জলধর।
তোমারে চিনিনি তোমা পানে চেয়ে দেখিতে ছিল না অবসর।
নিভৃত কক্ষে প্রিয়া-বাহু-পাশে
রহি তন্ময়, আষাঢ় আকাশে
শুনিয়া কেবল গভীর মন্দ্র উদাসী হয়েছে অন্তর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন
শুনিয়াছি যেন দূর ক্রন্দন
অজানা ব্যথায় অজানা কারণে ব্যথিয়া উঠেছে পঞ্জর॥

বিরহের দিনে তোমারে আজিকে চিনিতে পেরেছি জলধর,
ইন্দ্রধনুর শিখিচূড়া শিরে তুমি যেন শ্যাম মনোহর!
বিরহে আমার জুড়াইলে আঁখি,
আজি তোমা প্রাণসখা বলে ডাকি,
বুঝেছি মিলনে যে নয় আপন বিরহে সে জন নহে পর।
তুমি সখা মোর বুঝেছ কি ব্যথা?
আনিয়াছ বুঝি প্রিয়ার বারতা,
আমারও বারতা প্রিয়ার সকাশে বয়ে নিয়ে যাও, জলধর॥

দর্পণে

দর্পণে দেখি না মুখ, সর্ব দর্প করে সে হরণ,
জরাজাল স্মরায় মরণ।
ধনীদের বৈঠকখানায়,
বড় বড় বিপণির দেওয়ালের গায়
বিরাজে দর্পণ যত গৃহসজ্জা লাগি,
সারা দেহটার ছবি অকস্মাৎ উঠে তায় জাগি।
চমকিয়া উঠি, যেন প্রেতমূর্তি দেখি
চক্ষু বুজি, ভাবি তায়,—একি—
সেই দেহ? যে দেহে একদা সাজি বর
বিবাহে চলিয়াছিনু পরিয়া টোপর!

চূর্ণ হয় সব অভিমান,
সব ক্ষোভ পায় অবসান।
কেন অনাদর
করে এত তরুণেরা, পাই তার যথার্থ উত্তর।

বীভৎস যা আপনারি চোখে,
তাহারে বাসিবে ভাল কেন অন্য লোকে ?
পদ্মবন ধ্বস্ত করে হস্তী যবে কে আনন্দ পায় ?
চক্ষু মুদি দর্শকেরা করে হায় হায়।
ভগ্ন জীর্ণ দেবতামন্দির
অনাদৃত। সেথা কভু ভক্তগণ করেনাক ভিড়।

মনের মাধুরী দিয়া অসুন্দরে বানাতে সুন্দর
পারে শুধু শিল্পী-কবি, অন্যে কেন করিবে আদর ?
মৃত্যু ছাড়া কারো ভাল লাগিবার নয়
এ দেহ, এ মনে তাতে রহে না সংশয়।
মহাপথ-যাত্রিবেশ মোর আত্মা করেছে ধারণ
চিনিতে পারে না তাই পুরাতন বান্ধব-স্বজন।
এই দেহ লুকাবার,—দেখাবার নয় ত সভায়
সংসারেও শোভা নাহি পায়।
তাই বুঝি বিবেচক স্থবিরেরা থাকে লুকাইয়া
সমাজ সংসার ছাড়ি দূরতীর্থে গিয়া।

শতবার্ষিকী রবীন্দ্র জয়ন্তী

বর্ষশতের শতদলে গুরু তোমায় বরণ করি
তোমার পাণি-কমলপুটের আশিসখানি স্মরণ করি।
পূজোপচার পাইনি খুঁজি
গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজি,
ডুব্‌ল তোমার দানের বানে পূজার উপকরণ-তরী।

(পুনর্লিখিত—১৯৬১)

প্রজাপতি, তোমার কৃপায় মোদের মানসজীবন গড়া,
মোদের হৃদয়স্পন্দদোলা তোমার ছন্দ-পরম্পরা।
তোমার ধ্যানের রশ্মিপাতে
এ চিৎসরোজ ফুটল প্রাতে।
তোমার সৃজন মূর্চ্ছনাতে মোদের ইহভুবন ভরা।

নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি,
নবীন ক'রে গড়লে ভুবন পুন মনোলোভন করি।
কুব্জা হলো অব্জ-বিভা,
অহল্যা তার তুলল গ্রীবা,
উর্বশীরে মুক্তি দিলে বল্লীজীবন মোচন করি।

কলির বুকে নবীন গন্ধ, অলির গানে ছন্দ নব,
মেঘের মুখে মন্দ্র নবীন অর্পিল আনন্দ তব।
অনীরিত অনেক বাণী,
অঝংকৃত অনেক গানই
শুনালে মূক জড়ের মুখে সম্ভবিল অসম্ভব-ও।

নূতন নূতন দ্বার বাতায়ন খুলে দিলে গগন গায়ে।
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার শুনি গহন ছায়ে।
মর্মে পেলাম নবশ্রুতি
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি,
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটিয়ে দিলে মনের কায়ে।

অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগলো ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্‌না হয়ে ঢাল্‌লো আলো।

ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে
তোমার তুলির টানটি জাগে,
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।

গহন নব রসের তব হ্রদেই অবগাহন লভি—
সান্ত্বনা পাই; সন্তরণে জুড়াই জ্বালার দাহন সবি।
সহনগুণে তাপবেদনা,
গৃহে রয়েই তপ সাধনা
বহন করাই আরাধনা শিখালে তা তাপস কবি।

তোমার জ্ঞানের সিন্ধুবেলায় বালকসম বালুই খুঁড়ি,
ফেনিল কেশর ঊর্মিকুলের সঙ্গে খেলি, কুড়াই নুড়ি।
হাটের বাটের লোকের ভিড়ে
মন লাগে না, তোমায় ঘিরে
কাজের শাসন উড়িয়ে দিয়ে গাই নাচি আর বাজাই তুড়ি।

হর-জটার মতন রসস্যন্দী তোমার হাতের তুলি,
কল্পরমার চুম্বে সরস চম্পাসম আঙুলগুলি।
বিহার তোমার পরিমলে
বিশ্ববাণীর হৃৎকমলে
বিশ্বকর্মা করেছিলেন তোমার সাথে কোলাকুলি।

আর্ত অভিশপ্ত দেশের ঘুমে আশার মূর্ত স্বপন,
তোমার বাণীর অন্তরালে সুপ্ত মোচন-মন্ত্র গোপন।
সকল পরাজয়ের মাঝে
তোমার বরাভয়টি রাজে,
ক্ষতিক্ষয়ের মরুর তলে জয়ের বীচন করলে রোপণ।

আজ নিখিলে ওতপ্রোত তোমার মুখের মন্ত্রবাণী,
করছে সাগর-তরঙ্গেরা দিগ্‌বিদিকে কানাকানি।
বার্তা চলে সূর্যে সোমে
উদ্‌ঘোষিত তূর্যে ব্যোমে,
পুলক জাগে রোমে রোমে, ভক্তভূলোক যুক্তপাণি।

হিমাচলের ধবল শিরে উড়ছে তোমার জৈত্র কেতু
গড়লে অপার পারাবারের এপার-ওপার মৈত্রসেতু।
দীক্ষা দিয়া প্রেমের বেদে
ঐক্য দিলে সকল ভেদে,
মিলন-ত্রিদিব সৃষ্টি তোমার এই ভারতের মুক্তিহেতু।

সার্বভৌম, কে বা তোমায় বন্দী করে গণ্ডীমাঝে?
বিশ্বনরের তীর্থে তোমার বৈশ্বানরীণ বিষাণ বাজে।
সিন্ধুকে কে বাঁধবে বাঁধে?
ইন্দুকে কে ধরবে ফাঁদে?
অতিমানব চরিত তোমার বিশ্বাতীত ব্যঞ্জনা যে।

অগ্নিবীণা ঝঙ্কারিলে মহাব্যোমের বজ্রাসনে।
সুরের আগুন ছড়িয়ে গেল পশ্চিমের ঐ দিগঙ্গনে।
দহিল তা ঐহিকতার
ধূম্র ধূসর বিশাল প্রসার,
জাগালে তার ভস্ম হতে শাশ্বত সেই সত্যধনে।

মানসলোকের রবি তুমি, বৃথাই তাকাই অস্তাচলে,
আজো কোটি কোটি চোখের পাতায় পাতায় শিশির গলে।

স্বপ্নসুখের আলোক হরি
এলো স্মৃতির বিভাবরী,
কোটি কোটি তারার দলে তোমার গীতির আলোক জ্বলে।

মানসলোকের হে দিবাকর, কোন লোকে আজ অরুণ হলে
কোন ভুবনের কমলগুলি তোমার পানে হৃদয় খোলে?
এই ভুবনের বর্ষাকাশে
ঘনঘটায় চাঁদ না হাসে,
ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ, জোনাক জ্বলে পাতার কোলে।

হেথায় বায়ু বিষায় আয়ু, কোথায় বায়ু বয় সুরভি?
কোথায় সুরু ভৈরবী সুর হেথায় গুরু শেষ পূরবী।
কোন সে ভুবন সগৌরবে
নিত্য মাতে মহোৎসবে
তপস্যাতে মগ্ন ছিল আঁধারে কোন ভুবন, রবি!

বর্ষশতের শতদলে তোমায় গুরু আজকে বরি,
ইহলোকের উদ্‌যাপিত লোকাতীত জীবন স্মরি।
আজকে উষার রক্তরাগে
তোমার স্মিতহাস্য জাগে।
প্রণাম করি সহস্রকর, সহস্রবার প্রণাম করি।

প্রেমের কবিতা

বলিলেন মিতা
"যৌবন ফুরালে কেন লেখ আর প্রেমের কবিতা ?
যত দিন সে যৌবন, প্রেম ততদিনই
তার পর প্রিয়া হ'ন সংসারে গৃহিণী।"

বলিলাম—"ভায়া,
যৌবন ফুরালে প্রিয়া আর ন'ন জায়া,
তখনি প্রেয়সী হ'ন। খাঁটি কথা বলিব তোমায়
আসল প্রেমের গীতি যৌবনান্ত হলে লেখা যায়।

আবেগে যৌবন সেত ফেনিল উচ্ছ্বাস
শান্ত হলে বেগ তার, তাই হয় রসের বিলাস।
কামনার কালিদহে যত পঙ্ক জমে
পঙ্কজ হইয়া ফুটে তাহাইত ভোগের প্রশমে।
ভুঞ্জনে গুঞ্জন কোথা ? ভুঞ্জনের পরিতৃপ্তি-স্মৃতি
অলিকণ্ঠে হয় প্রেম-গীতি।

প্রেম গঙ্গাজল বটে, বর্ষায় আবিল,
শরতে সে 'জল' হয় স্বচ্ছ শুচি নির্মল 'সলিল'।
জলে নয়, সে সলিলে হয় স্পষ্ট বিম্বিত হৃদয়
সে বিম্বে আসল প্রেম-কবিতার হয় উপচয়।"

কৈশোর-স্মৃতি
(কাশিম বাজার)

খাঁটিগঙ্গা হ'ল বিল, কাটি গঙ্গা অপনাম ধ'রে।
ব্যাধিত জীবন মোর তার তীরে যাপিনু কৈশোরে,
জীর্ণ গেহে, শীর্ণ দেহে। চারিদিকে যেথা গোরস্তান
বানপ্রস্থ নিল যেথা শেঠেদের সখের বাগান।
চারিদিকে বিদেশীর কুঠির কঙ্কাল,
সিদ্ধিবন, এঁধো ডোবা, বটচূড় মন্দির বিশাল,
কোম্পানীর শোষণের অস্থিচর্মসার এ শ্মশান,
সারা লোকালয়ে মশা বানায়েছে শ্রীমন্ত মশান।
নরনারী প্রেতমূর্তি ভোগে শুধু জ্বরে,
খাদ্য আছে সাধ্য নাই খায় তাহা, শুধু পথ্য করে।
তাহারা ভাতের চেয়ে সাগুদানা খায় বেশীদিন
সাগুর চেয়েও বেশী খায় কুইনিন।

মানুষের এই দশা, সবল কেবল তরুগণ
অনাময় দেহে তারা পালে জীবগণ।
পরিপক্ক ফল দোলে শাখাতে শাখাতে,
উড়ন্ত অতিথিগণ প্রতিদিন ফলাহারে মাতে।
তাহাদের নিত্য মহোৎসব,
কেহ গায়, কেহ নাচে, কেহ শুধু করে কলরব।

কৃকলাস, গোধা, বেজি, সর্প, কাঠবিড়ালী, তক্ষক
গণতন্ত্রে করে বাস ভুলি ভক্ষ্য অথবা ভক্ষক।

লতায় কুসুম ফুটে কেহ তারে করে না চয়ন,
পবনে মোদিত করে, শুধু তারা জুড়ায় নয়ন।
বৃন্তের ফুটন্ত ফুলে সুন্দরের চলে পূজারতি,
পুরোহিত হেথা প্রজাপতি।

এঁধো পুকুরের বুকে ফুটে ইন্দীবর,
পূতনার বুকে যেন গোপাল সুন্দর।
বসন্তে শিমুল জবা অশোকের গাঢ় রক্তরাগে,
বাগে বাগে হোলীলীলা চলে ফাগে ফাগে।

শরতে শারদ লক্ষ্মী নামেন নিশীথে অগোচরে
নিরখি বিলের বুকে পদচিহ্ন ফুল্ল থরে থরে।
ধূপগন্ধ পাই যেন রাতে
ছাতিম শেফালি তলে দেখি খই ছড়ানো প্রভাতে।
মানুষের দুঃস্থ দশা, প্রকৃতির ঐশ্বর্য সুরভি
দুয়ে মিলে সে কিশোরে করিল কি কবি?

ভাল্লুক

তুমি এলে লোকালয়ে হে বন্য ভালুক,
ফেলি মধু-চক্রে ভরা বনের তালুক,
তোমার লাগিয়া মক্ষী যেথা চাক রচে
ব্যর্থ যার দংশ তব লোমশ কবচে।

নাচায় তোমারে যেবা তাহার আদেশ
প্রত্যেক বর্ণটি দেখি তুমি বোঝো বেশ।
এত তুমি বুদ্ধিমান, সবি কি বিফল?
তোমারে পরিতে হ'ল দাসত্বশিকল!
বুঝিবে তোমার মূল্য অর্থনীতিবিদ্,
অন্নদাতা রূপে তুমি মানব-সুহৃদ্,
নগণ্য নয়ত তব নৃত্যকলারীতি,
বুঝি না, পায় না কেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি?

ভারতীয় সংস্কৃতিতে তব অবদান
এত বড়! পাবে না কি জাতীয় সম্মান?
সস্তায় পালিছে তোমা তোমার চালক,
দেখেছে ভেবে কি কেউ কে কার পালক?

বন থেকে ধরে এনে লক্ষ ভালুকেরে
আরণ্য দপ্তর কেন দেয়নাক ছেড়ে,
বেকার-সমস্যা পাবে কিছু সমাধান,
পাবে লক্ষ পরিবার অন্নের সংস্থান।
কিছু ব্যয় হবে, তাতো সংস্কৃতির খাতে,
নাচাতে তাদেরে আর বাঁচাতে খাঁচাতে।

কলিকাতার সেনেট হল

ব্যথা যে অবুঝ বড় যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে
শত শত শ্রমিকেরা, হর্ম্যে শুধু সে আঘাত নয়,
মর্মে পায় সে আঘাত সহস্র হৃদয়।
দানবীয় শক্তি দিয়ে এই যে ভাঙন
যাতে আজি চূর্ণ হয় সুপ্রাচীন দেব আয়তন,
এরো মূলে যুক্তি আছে, নয় অকারণে।
এ বোধে প্রবোধ তবু কই পাই মনে ?

সিমেন্টের যুগ এটা, ফুরায়েছে সুরখীর দিন,
উহার স্থাপত্য-রীতি নিতান্ত প্রাচীন,
যা কিছু প্রাচীন তারে ভাঙিবারই কথা,—
জরাজীর্ণে বুকে ধরি অশ্রুপাত মুগ্ধ দুর্বলতা।
শতঞ্জীব জরদ্গব জীর্ণ পিতামহে
পৌত্রগণ কত দিন সহে ?
সুসঙ্গত প্রাচীনের অপসার নব্যে দিতে ঠাঁই,
নিজে না ভাঙিয়া গেলে গাঁইতি চালানো তাই চাই।

বিশাল অঙ্কটি যার পুণ্য পীঠস্থান,
দীর্ঘ শত বর্ষ ধরি বাঙ্গলার যত সুসন্তান
জ্ঞানধর্মে দীক্ষা লভি যারে নিত্য করেছে প্রণাম,
—একাধারে চৈত্য, মঠ, বিহার, মন্দির, সংঘারাম—
সে আজিকে চূর্ণ হয়। হেরিতেছি পরিণাম তার
প্রত্যেক আঘাতে কাঁপি পৌরভূমি করে হাহাকার।

পূর্ণ হইবার আগে আয়ুষ্কাল—তাহার পতন,
বিলম্ব সহিবে কত যুগের জরুরি প্রয়োজন ?
যুক্তি আছে তাহা মানি, বেদনাও অহেতুক নয়,
বিরাটের এ পতনে কাঁদেনাক কাহার হৃদয় ?

পূর্ণ নাহি হতে আয়ুষ্কাল
প্রয়োজন-তাড়নায় অর্জুনের খর শরজাল
জরাজীর্ণ পিতামহে করেছিল মৃত্যুশয্যাহত ;
শত্রু মিত্র কার নেত্রে অশ্রুচ্ছ্বাস হয়নি উদ্‌গত ;
সেই অশ্রু শরদীর্ণ পৃথ্বী ভেদি' শীত প্রস্রবণ
গাঙ্গেয়ের তৃষাহরী ভোগবতী-ধারার মতন।

ইমারত

১

ইমারতী শিল্পী যারা তারা পায় লয়,
শিল্পীদের চেয়ে বড় তাদের সে দান।
যদিও গিরির তুল্য চিরন্তন নয়
মানুষের চেয়ে কিন্তু ঢের আয়ুষ্মান্।

বাদশা বেগম কত এখন মৃন্ময়,
ক্ষীণজীবী মানুষের কতটুকু প্রাণ !
ইমারতই তাদের ত দেয় পরিচয়,
তাজের মিনার দর্পে উড়ায় নিশান।

মানুষ দেখিতে কেহ দেশান্তরে যায় ?
ইমারত ছাড়া কী বা দেখিবার আছে ?
কবি ছাড়া প্রকৃতির পানে কেহ চায় ?
নবীন সভ্যতা শুধু ইমারতে বাঁচে।
হইত মানুষ গড়া আশ্রম কুটীরে
এখন তা হয় গড়া প্রাসাদের শিরে।

২

শুধু কর্ম নয়, ধর্ম-সাধনার তরে
আমরা ভক্তির দানে ইমারত গড়ি।
শিক্ষার আশ্রম হর্ম্য গ্রামে ও নগরে
গড়ি জড়ো করি যত ভিক্ষালব্ধ কড়ি।

সমাধিস্থ ইমারতে করিয়া উদ্ধার
তাহার ধ্বংসাবশেষ রাখি যাত্নঘরে,
গড়ে তুলি ইতিহাস কঙ্কালে তাহার
প্রাচীন সভ্যতা-লিপি তাহার পঞ্জরে।

দীনের সম্বল ঘর্মে ধরে হর্ম্য কায়া
শূন্য মাঠে যেন তুঙ্গ বল্মীকের স্তূপ,
কুটীর অরণ্য-মাঝে ধরে চারু রূপ
এ দরিদ্র দেশে রচে ঐশ্বর্যের মায়া।
ইমারতী আচ্ছাদনে প্রলেপের মত
ঢাকা থাকে কদর্যতা ক্ষয় ক্ষতি যত।

আলেকজান্দার

কোথা গ্রীস দেশ দূর ভূমধ্যসিন্ধুর পরপার,
কোথায় হিন্দু ভারতবর্ষ নাম-ও শোনেনি তার !
মাঝখানে কত রাজ্য কানন নদনদী পর্বত
দূর দুর্গম পথ,
ভাবেনি ভারত সেথা থেকে কভু আসিয়া দৈত্যদল
স্বর্গভূমিরে বানাইবে রসাতল।

এলো কি তাহারা লুটিবারে সম্পদ ?
করি কোন দোষ জাগালো কি রোষ নিরীহ পঞ্চনদ ?
বহুদিন হতে ছিল কি বৈরভাব ?
কোনটাই নয় ! শুধুই জয়ের মায়াগৌরব লাভ !
জাতির জন্য কাঁদে নাই প্রাণ, জিগীষার অভিমান
অর্জিতে আর মিটাতে খেয়াল, নয় একি অভিযান,
পরদেশে অকারণে
লাখো মুণ্ডের কন্দুকক্রীড়া করিতে রণাঙ্গনে ?
এই গ্রীকসভ্যতা !
তার কাছে হায় হার মেনে যায় বর্বরতার প্রথা।

নৃপতি সেকেন্দার
উদ্দেশে তব আছে কিছু বলিবার।
বিপাশা চন্দ্রভাগা বিতস্তা শতদ্রু ইরাবতী,
সবার সলিল রঞ্জিতে কেন এলে হে দৈত্যপতি ?

শ্মশান বানাতে মশান বানাতে আর্যগণের দেশে
আর্য হইয়া অনার্যরূপে কেন এলে অবশেষে ?
দশ বছরের বালক যখন এই ইতিহাস পড়ি—
গভীর ব্যথায় হাহাকারে হায় হৃদয় উঠিল ভরি।
বাইশ শতক দূর ব্যবধান, বিংশ শতাব্দীর
বালকেরো চোখে অঝোরে ঝরিল নীর।
জানিলাম শেষে ব্যাবিলনে এসে ইরাকের জলবায়ু
প্রতিশোধ নিল হরিয়া তোমার আয়ু।

পাইনিক সান্ত্বনা,
লক্ষ বুকের রক্তের ঋণ ঘুচেনিক এককণা।
ভুলিব কেমনে তুমি যে দেখালে পথ,
তার পর হতে লুণ্ঠকদের বলি হ'ল এ ভারত।
সর্বংসহ ইতিহাসে দেখি তুমিই মাথার মণি
সুসভ্য দেশে উদ্গীত আজো তোমারি জয়ধ্বনি।
আমার বালক-মতি
চিরদিন তরে বিরূপ হইল গ্রীকযবনের প্রতি।
যৌবনে কৈশোরে
গ্রীকগৌরব অনেক জেনেছি গ্রীক-ইতিহাস প'ড়ে—
জ্ঞান-সাধনায় কত তার অবদান !
লভিয়াছে গ্রীস জগদ্গুরুর স্থান,
শ্রদ্ধায় শির অবনত হয় স্বতঃ
কিন্তু হায়রে ! ঘুচেনাক সেই বালক-বুকের ক্ষত।

বালবুদ্ধিতে ভাবিতাম শুধু, মানুষ এমনো হয় ?
ব্যাঘ্রও শুনি ক্ষুধা না পাইলে জীবন কারো না লয়।

সর্পও শুনি, নাহি হয় যদি মর্দিত পদভরে
কারেও কখন দংশন নাহি করে।
পড়িয়া দেখেছি শক হূণ আর মোঙ্গলী ইতিহাস,—
তাহাদের ছিল লুণ্ঠন-অভিলাষ।
সভ্য বলিয়া গর্ব করেনি তারা
প্রচার করিতে চায়নিক তারা নব সভ্যতা-ধারা।

সম্মুখে তব আসিল যখন জ্বালানলময় রথ,
পশ্চাতে তব নিরীহ রক্তে কর্দমাক্ত পথ,
তার মাঝে তুমি শায়িত হে বীর ইরাকের প্রান্তরে
জয়কণ্টকে ভরা শয্যার 'পরে।
জানিতে বাসনা হয়,
নিজ মনে তব হ'ল কোন ভাবোদয়?
বুঝিতে কি তুমি পেরেছিলে নিজ পাপ?
করেছিলে অনুতাপ?

মনে হয় তুমি ভেবেছিলে ব্রত করিয়া উদ্‌যাপন
রেখে গেলে বুঝি মহা আদর্শ অনন্যসাধারণ!
গথ ভ্যাণ্ডাল সিমেটিক হূণগণে
ব্রতভার তুমি অর্পিলে মনে মনে?

এই বিশ্বের মানবেতিহাস মাঝে
স্বর্গ নরক দুইই পাশাপাশি রাজে,
সেই নরকেই অমর হইয়া আছ।
মৃত্যুর দূত, ইতিহাসে তুমি বাঁচো চিরকাল বাঁচো।

আসল কথা

ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চার পাতা ভরা চিঠি এলে
পত্রের মালিক তায় রেখে দেয় ফেলে,
ডাক দিয়ে বলে—"নটবর,
আসল কথাটা এর পড়ে দেখে বলত সত্বর।"
ঘণ্টা ধরে বাগ্মিকণ্ঠে অধ্যাপক দেন লেকচার,
ছাত্রেরা থামায়ে বলে,—"স্যার,
আসল কথাটা কি তা বলুন ত টুকে নি খাতায়,
পরীক্ষায় যা লাগে না হবে কি বা তায়?"
কবিতা শোনায় কবি, কবিতাটি ছোট খুব নয়,
দু'চরণ না শুনেই ঘড়ি দেখে শ্রোতা তারে কয়—
"আসল কথাটি কি তা বল কবিবর।
সিনেমায় যেতে হবে, 'হারি আপ', নেই অবসর।"
প্রিয়তমা কাছে এসে ঘেঁষে বসে কত কথা বলে
হাতখানি রেখে তার পতিটির গলে,
পতি কয়, "থাম থাম, আসল কথাটি বল খালি,
অবসর নেই মোর শুনতে ও তোমার পাঁচালী।"
আসল কথার যুগে বৃথা চারু কথার অঞ্জলি,
যন্ত্রের গর্জন মাঝে বৃথা কলকণ্ঠের কাকলী।
চায় না পল্লব শাখা পুষ্প কেহ, সবে ফল চায়,
সবুর সয় না কারো, না পাকিলে কিলিয়ে পাকায়।
কে শুনিবে কালোয়াতী ঘণ্টা ধরি কণ্ঠের বিলাস,
সবাই টিংক্‌চার চায়, শিশি ভ'রে সবেরই নির্যাস।
চায় না তটিনী কূপ, কল খুলে নলে পায় জল,
বিজ্ঞান যোগায় আজ হাতে হাতে যা কিছু আসল।

আগাছা

আগাছা তুমি যে ধরাজননীর অযাচিত পরিদান।
মানুষের যত অযতন তোমা করেছে আয়ুষ্মান্।
পোষ্যপুত্র নহ, হেসে উপেক্ষা সহ,
ধূলায় কাদায় গড়ে ওঠা যেন সাঁওতাল সন্তান।
ভ্রাতা উত্তম, বিমাতা ধ্রুবেরে পাঠাল নির্বাসনে।
পিতৃ-অঙ্কে আসন না পেয়ে ধ্রুব চলে গেল বনে।
তুমি কি ধ্রুবের মতো আছ তপস্যা-রত ?
একদিন তুমি অধ্রুবে জিনি বসিবে কি রাজাসনে ?

ভালবাসি তোমা, মোরি মত একই প্রকৃতির সন্তান,
ঠাঁই নয় তব প্রজাদের ক্ষেত, রাজাদের উদ্যান।
তুমিও আমারি মতো অকেজো অধম স্বতঃ,
মোর ভবনের চারিপাশে রয়ে কর আনন্দ দান।
অকেজো ? শুনি যে অকেজো কিছুই নয় এই দুনিয়ার,
শেষ হয়েছে কি বিজ্ঞানীদের সকল আবিষ্কার ?
একদা তাদের কাছে তোমাতে কি ধন আছে
পড়িবেই ধরা, তখন শুধুই চাষ হবে আগাছার।

সারা ধরণীই ছিল একদিন তোমাদের নিকেতন,
কোণ-ঠাসা করে রেখেছে আজিকে মানুষের প্রয়োজন।
চাও যদি আপনার ফিরে পেতে অধিকার
বিদ্রোহী হও কণ্টকায়ুধ করিয়া আস্ফালন।
তোমরা যেন বা বন্য মানুষ কাফরি আফ্রিকার,
ইয়োরোপ করে ক্ষেত কারখানা বাগানের বিস্তার ;
তোমাদের একে একে সরিয়ে বসেছে জেঁকে।
দাবি করো এবে সাম্য মৈত্রী জাতীয় স্বাধীনতার।

বাল্যসখী

দূর বেহারের একটি শহরে চৌদ্দ বছর গতে
হেরিলাম তারে বারাণসী হ'তে ফিরিয়া আসার পথে।
পাঁচটি ছেলের জননী হয়েছে স্বচ্ছল সংসারে,
ধীরা গম্ভীরা আজি মন্থরা মাতৃ-গরিমা ভারে।
রাণীর মতন করিছে শাসন সতত হাস্যমুখী
অতি দুরন্ত ছেলেদের শত সহিছে বায়না ঝুঁকি।
স্ত্রৈণ স্বামীটি কথায় কথায় করে ধমকের ভয়,
শুভঙ্করী সে স্ত্রীবুদ্ধিটির কাছে লভি পরাজয়।
প্রতিবেশিগণ নানা ভাবে পায় তার কাছে উপকার,
অতিথি ভিখারী যাত্রীর লাগি খোলা আছে তার দ্বার।
দাসদাসীদের করিছে শাসন, হিসাব লিখিছে ব'সে,
সকলে ব্যস্ত সদা তটস্থ তার কৃত্রিম রোষে।

আমিত অবাক! আমাদের সেই দুষ্টু চপল সোনা,
কেমন ক'রে সে এত বড় হয়ে করিছে গিন্নীপনা।
দেহে মনে সাজে গলার আওয়াজে বদ্‌লেছে বিল্‌কুল,
মাঝখানে একজন্ম তফাৎ,—মেলেনাক এক চুল।
দেখি চেয়ে চেয়ে বয়স কমায়ে ভাবি তারে ছোট ক'রে,
স্মৃতির সোনারে বড় ক'রে ভাবি—মেলেনাক জোড়ে জোড়ে।
মনে পড়ে সেই নব কৈশোরে ঘাটে মাঠে মাতামাতি
কাজলা দীঘির পাথারে সাঁতার—বটতলে খেলাপাতি।
শৈশবে সেই পূজার দালানে আগাডুম বাঘাডুম,—
আম-বাগানের ঠাণ্ডা দুপুর,—জাম কুড়ানোর ধুম,

পায়রা উড়ানো,—ঘুড়ি কাড়াকাড়ি—কথায় কথায় আড়ি,
রাগ অভিমানে চোখ ভরা বানে ভাব-ই যেত আরো বাড়ি।
মনে জাগে আজি একে একে ক্রমে বাকি সখীগুলি মোর,
সোনার মতন তাদের সবার নয়ত কপাল-জোর।
পনেরো বছরে শাঁখা শাড়ী ছেড়ে ফিরে এলো কেউ গাঁয়,
দুটি ছেলে রেখে ইহলোক থেকে কেউ চলে গেছে হায়,
পল্লী-কুটীরে খেটে খুটে কারো দু'বেলা জোটে না ভাত,
স্থবির রুগ্ন স্বামীর শিয়রে কেউ জাগিতেছে রাত।
বছর বছর বুকের বাছারে বিদায় দিতেছে কেউ,
কাহারো বুকের পাঁজরা ভাঙিছে নিত্য শোকের ঢেউ।
তাহাদের কথা, প্রীতি-স্মৃতি-ব্যথা মনে জাগে পাশাপাশি,
একটি সখীও সুখে আছে দেখি অশ্রুর ফাঁকে হাসি।

রহিনু ক'দিন, চলে দুই বেলা ভূরিভোজনের পালা,
বুনো ফল নয়—পাই তার হাতে খাঁটী মিঠায়েরি থালা।
পুতুলের ছেলে নয়-ক, তাহার পাঁচ জীবন্ত ছেলে
ঘাড়ে পিঠে মোর চড়িবার লাগি একে আর দেয় ঠেলে।
কেউ চড়ে কোলে, কেউ কাঁধে ঝোলে ; বেসামাল হই আমি।
চিনি না যাদের তাদের কথাই বলে যায় অবিরামই।
একটি দিনেই আপন বলিয়া কেমনে চিনিল মোরে,
জানিনা 'সোনার' কণায় কোথায় ছিল তারা ঘুমঘোরে।
সকালে বিকালে ? বাড়ী হতে টেনে রাজপথে নিয়ে যায়।
চলে কলরবে, অযথা গরবে সাথীদের পানে চায়।
ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে—মাষ্টারো গেল ফিরে,
সজোর বন্দী নজরবন্দী করি সদা রয় ঘিরে।
পরের চাকুরি,—নাচার, কি করি, এলো বিদায়ের বেলা,
ছেলেদের মুখ শুকাল সহসা, থেমে গেল হাসি খেলা।

সোনার নয়নও করে ছলছল,—আমিও পাষাণ নই।
বুদ্ধিমতী সে রাগ করা তার উচিত কেমনে কই?
বহুদিন হ'তে রুদ্ধ ছিল ত আত্মীয়তার ধারা,
বিবাহের পর হতেই সোনাও হইয়াছে দেশছাড়া।
আমি যে আসিব, করেনি ক আশা, ছিল না আসার কথা,
অযথা তাহার অভিমান, আর অযথা তাহার ব্যথা।
ছেলেরা কাঁদিয়া তাহারে কাঁদায়, চোখভরা অভিমানে
জননী সোনায় বালিকা সোনারে চিনিলাম মনে প্রাণে।

বলিল ভগিনী—"বিদেশ বিভূঁই, পড়ে আছি হেথা একা,
আপন জনের সঙ্গে এখানে ক্বচিৎ কখনো দেখা,
বারো বছরের গোটা গ্রামখানি এ বুকে রয়েছে জাগি,
সেই এঁধো ডোবা পাড়ে খড়ো ঘর, প্রাণ কাঁদে তারি লাগি।
পুরুষ মানুষ, কি যে ব্যথা তায়, তুমি কি বুঝিবে দাদা?
কেন এলে শুধু বেদনা বাড়াতে? এস গে—দিব না বাধা।"

একদিন যারে কথায় কথায় মেরেছি চাপড় চড়,
তার কাছে আজি মাথা হেঁট হয় মনে মনে করি গড়।
মা'র খেয়ে নিজে অপরাধী সেজে রহিত যে মুখ বুজে।
সে ভগিনী মোর কোথা গেল হায় দেখি নি কখনো খুঁজে।
তীর্থের পথে পেলাম আজিকে নবতীর্থের দেখা,
আমার জীবন-পুরাণে ইহার মহিমা-কাহিনী লেখা।

গির্জার ঘণ্টা

ঘণ্টা বাজে, মনটা কাজে লাগছে না।
ঘুমটা কারো ভাঙছে না, কেউ জাগছে না।
ঘণ্টা বাজে, একাই ক্বণন শুনছি তাই,
একটি-দু'টি করি রণন গুনছি ভাই।
ঝাঁক বেঁধে সব নিরুদ্দেশে যায় চ'লে,
ডাক দিয়ে যায় তারা আমায় 'আয়' ব'লে।
ভাষা তাদের ভাসা-ভাসা বুঝছি আর,
আসল মানে নিজের প্রাণেই খুঁজছি তার॥

ঘণ্টা বলে—হাতের বাকি নে সেরে।
মরীচিকার পিছন ধাওয়া দে ছেড়ে।
ঘণ্টা বলে—সকল বাঁধন কর্ ঢিলে,
গানের চরণ থাকুক পড়ে গরমিলে।
এখনো যে সরাইখানার টান ভারি,
ডাকছে শোন্ ঐ শিঙার ফুঁয়ে কাণ্ডারী।
ঘণ্টা বলে—পাড়ের কড়ির কৈ পুঁজি,
পাবি না তা আলমারিটার বই খুঁজি॥
রেখে দে তোর যুক্তি বিচার চুল চিরে।
ভুলাবি কি তাতে ঘাটের শুল্কীরে!
ঘণ্টা বলে—কণ্ঠাগত প্রাণটা যে
লাগবে কি আর খ্যাতি খাতির মান কাজে?
যাবে না বাগ্‌বিলাস ছটা সঙ্গে তোর।
ছন্দ অলংকারের ঘটা অঙ্গে তোর।
ক্ষোভ অভিমান ফেল্ মুছে, রয় যা জমা।
সবার কাছে বিদায় নিয়ে চা' ক্ষমা॥

নীড় ও আকাশ

ভালবাসো যদি এই শ্যামা ধরণীকে,
আলোয় আলোয় ভাল করে চেয়ে দেখ তার চারিদিকে
উপভোগ্যের ক'রে কত আয়োজন
তোমা নিতি নিতি তাহার প্রকৃতি জানায় আমন্ত্রণ।
দুদিনের এই মধুপ-জীবন খধুপ যাতে না হয়
প্রতিখন তার ক'রে তোলো মধুময়।

চেয়ো না চেয়ো না নিশীথ আকাশ পানে
উদাসী করার সে মায়ামন্ত্র জানে।
অসীম গগন লয়ে অগণ্য তারা
সহজ মানুষে ফানুস বানায়ে করে দেয় দিশেহারা।
ইঙ্গিত হানে কী যে কানে কানে কয়,
এ ভোগভূমির সকলি তুচ্ছ হয়।
তুচ্ছ হয় এ গৃহ সংসার, করে সে অন্যমনা,
হয়ে যায় এই বিরাট বিশ্ব একটি সরিষাকণা।

চেয়োনাকো নীলাকাশে,
অট্টহাস্য হাসে সে দিবসে, রাতে মৃদু মৃদু হাসে।
আভাসে জানায় ভবসংসার সুতসুতা মিতা জায়া।
সব ঝুটা, সব মায়া।

সহজ হবে না মনের স্বস্তি রাখা,
উড়িবার সাধ জাগাবে শুধুই, দিতে পারিবে না পাখা।

অনেক আয়াসে গড়া কুঞ্জের নীড়
যেথা কচি কাঁচা শাবকেরা করে ভিড়
পাবে নাক তা-ত খুঁজি,
মনে হবে তার মমতায় হলো জীবন ব্যর্থ বুঝি।

শুনোনা শুনোনা ঐ আকাশের গান
বলে সে,—মিথ্যা, সবই অনিত্য, নেই এ বর্ত্তমান।
আছে শুধু দূর অসীম ভবিষ্যৎ,
যাইতে সেথায় নেই কোন ছায়াপথ।

অবিরত মনে প্রশ্ন জাগায়ে অধীর করে সে প্রাণ,
দেয় না সে সমাধান।
ব্যোমে ব্যোমকেশ বিষাণে তোলে যে তান,
কানে গেলে তা যে রয়না নীড়ের টান।

সারা অম্বরে নাচে যে দিগম্বর
হেরি তা বিষম হবে দিগ্‌ভ্রম, ভুলাবে আপন-পর।
চেয়োনা চেয়োনা নিশীথ আকাশ পানে
আকাশ সবারে কাজ হতে শুধু অকাজেরই পানে টানে

পারিয়া সাধক

বহিছে কাবেরী শ্রীরঙ্গমের ধারে
তারি ঠিক পরপারে
সাধনভজন করিত পারিয়া-সাধক তিরুপ্‌পন
বীণা বাজাইয়া গাহিত সে সারাখন—
"জয় জয় জয় প্রভু শ্রীরঙ্গনাথ
চরণে তোমার দূর হ'তে প্রণিপাত,
তোমারে দেখার নাহি মোর অধিকার,
আমার পক্ষে রুদ্ধ যে প্রভু শ্রীরঙ্গমের দ্বার।
জীবনাবসানে হীন বা অশুচি কেহ রহিবে না আর,
তখন তোমার শ্রীচরণ যেন পাই,
এ জীবনে মোর অন্য ভিক্ষা নাই।"

নদী পার হওয়া নিষেধ তাহার; ওপারের পথ'পরে
অশুচি পারিয়া যদি বিচরণ করে,
সারা নগরীই হ'বে কলুষিত, শ্রীরঙ্গনারায়ণ
নগর ছাড়িয়া করিবেন পলায়ন!
পরপার হ'তে দেখা নাহি যায় দেবমন্দির পুরা
দেখা যায় শুধু চূড়া।

তারি পানে চেয়ে পারিয়া-সাধক গাহে বন্দনাগান,
নয়নে তাহার জলধারা অফুরান।
অশ্রুর ফাঁকে মন্দিরই হ'লো বিগ্রহ দেবতার
তরুপল্লবে শ্যামায়িত তনু যার,
দেবমৌলির কিরীট হৈল হৈম কলস তার।

গাহিত সাধক, "আমার বক্ষে বিরাজিছ নিশিদিন ;
তবু মনে হয় হোথা তুমি হ'য়ে মন্দিরে সমাসীন,
যে রূপে লভিছ কোটি ভক্তের ভক্তির উপচার,
সে রূপ না দেখি প্রাণ করে হাহাকার।"

একদা রজনীশেষে
রঙ্গনাথের অভিষেক তরে কুম্ভভরণে এসে,
হেরে পুরোহিত লোকসারঙ্গ কাবেরীর পরপারে
বসিয়া জলের ধারে
ধেয়ানে মগ্ন পারিয়া-সাধক ; ভাবিল সে পুরোহিত
তাহার ছায়ায় কাবেরীর জল হারায়েছে নিশ্চিত
শুচিতা তাহার, কহিল সে হুঙ্কারে
"অশুচি অধম কে তুই জলের ধারে ?
স'রে যা এখনি, কাবেরীর নীর কলুষিত করিবার
নাই তোর অধিকার।"

ধ্যানে তন্ময় পারিয়া-সাধক। তর্জনগর্জন
পশিল না কাণে। ছুটিল প্রহরিগণ
নৌকায় আরোহিয়া
মধ্য নদীতে গিয়া
পাথর ছুঁড়িয়া মারিল তাহারে, ধ্যান হ'লো অপগত,
ঝরিল শোণিত ঝরনা-ধারার মত।

শুনিল সাধক তাহার ছায়ায় কাবেরীর শুচি জল
অশুচি হয়েছে—তার এই প্রতিফল।
দূরে গেল সাধু কহিয়া "কাবেরি, স্মরিলে তোমার নাম,
অশুচি সলিলও পবিত্র হয় এই আমি জানিতাম।

কে জানে কোথায় তোমার জন্মভূমি,
কত না অশুচি অমেধ্য-রাশি বহিয়া আনিছ তুমি,
কত না চরণ ধোয়ালে হীনের, কত পাপী করে স্নান,
শিয়াল কুকুরে করিতেছে জলপান,
মুখ ধোয় কত মুচি,
আমারি ছায়ায় কেবল মা তুমি রহিলে না আজ শুচি?"

'থেবারম' রচি বড় অভিমানে গাহিল সাধক পুন
"শ্রীরঙ্গনাথ শুন,—
জানিতাম তুমি বিশ্বনরের মাঝারে বৈশ্বানর,
পাবন করেছ ত্রিভুবন চরাচর।
জানিতাম তুমি সর্বজাতির, শুধু দ্বিজাতির নও,
জানি না কেমনে হেন অবিচার সও।
আমার শরীরে শোণিত ঝরুক নাহি তায় ক্ষোভ-ক্ষতি,
ব্যথা পাই স্মরি তোমার শ্রীহরি কেন ঘোর দুর্গতি।
হায়রে বন্দী করিয়া রেখেছে মন্দির-কারাগারে,
জন কত লোক কাঙালের দেবতারে,
বঞ্চিত তায় কোটি কোটি তার দীনহীন সন্তান,
অশুচি বলিয়া তাদের অর্ঘ্য পায় না সেথায় স্থান।
আমার মুক্তি হোক বা না হোক, বন্ধন হ'তে কবে
তোমার মুক্তি হবে?
কাঁসর ঘণ্টা ঝাঁঝরের কোলাহল
বধির করেছে, কোটি ভক্তের আবেদন নিস্ফল।
হেমপিঞ্জরে বদ্ধ পাখীর মত
কত দিন রবে রাজভোগে তদ্‌গত?
মথুরার সমারোহ
তোমারও বন্ধু ঘটাইল মায়ামোহ,

এপারে আকুল গোকুল বৃন্দাবন,
কোটি কোটি আঁখি অভিষেক-বারি করিতেছে বর্ষণ।”

ব্যর্থ হয়নি এই ভক্তের আকৃতি আকিঞ্চন,
ব্যর্থ হয়নি শোণিতের সাথে আঁখিজল বরিষণ,
পুরবাসিগণ পাইয়াছে তাঁর মহিমার পরিচয়,
হইয়াছে পরা ভক্তির কাছে শক্তির পরাজয়
বহুবিলম্বে। শক্তি সহজে নত হয় ধূলিতলে?
শিলা গলে বটে, সহজে কি তাহা গলে?
কেমনে তা হ'লো শুধায় যদি বা কেহ
স্মরিয়া সে কথা শিহরিয়া উঠে দেহ,
আকুলিয়া উঠে প্রাণ,
এ যুগে সে কথা শুনিবার নাই কাণ,
বলিব না তাহা। যাহারা কৌতূহলী
তাহাদের শুধু এইটুকু শেষে বলি।
রঙ্গনাথের দেউলের পাশে রচি নব মন্দির,
করি প্রতিষ্ঠা তিরুপনের শিলাময় মূরতির
পূজিয়াছে তারে নিষ্ঠাভিমানী পুরোহিত ব্রাহ্মণ
সঁপিয়া নিত্য ধূপদীপ, চন্দন।
ভক্তের সাথে ভগবানে পূজি প্রতিদিন পুরবাসী
প্রায়শ্চিত্তে ক্ষালন করিছে সঞ্চিত পাপরাশি।

চৈত্রের শালবন

তোমারে স্মরিব কবি এ তো নয় ঠাঁই
নগরের এ যে সভাপ্রাঙ্গণ।
এখানে তোমার সাথে কোন যোগ নাই,
এ তো নয় চৈত্রের শালবন।

আজি তুমি ভাষাহারা, হেথা কোলাহল,
এখানে তাপিত হাওয়া লাগে গায়।
ভাষাহারাদের মাঝে সেখানে কেবল
হৃদয়ে তোমারে কবি, পাওয়া যায়।
যাহাদের ডাকে তুমি এলে বারবার
নেই হেথা তাহাদের কোন জন।
ঝরা জুঁইয়ে নেই পাতা আসন তোমার।
এ তো নহে চৈত্রের শালবন।

হেথা নেই নব শাল-মঞ্জরী গন্ধ,
হেথা নেই ঘন ছায়া সুশীতল,
নেই বনলতাদের সুরভি আনন্দ,
ব্যজন করে না পল্লবদল।
হেথা নেই নামহারা বিহগপতঙ্গ
ক্ষণিকের সাথী আর জ্ঞাতিগণ,
কেউ নেই চাও তুমি যাহাদের সঙ্গ—
এ তো নয় চৈত্রের শালবন।

বঙ্কিমস্মরণে*

(গান)

আজি শততম জনমবাসরে, প্রণমি তোমারে, হে দেশাচার্য,
নবীনবঙ্গ-জীবনযজ্ঞে তব অবদান অগ্রধার্য।
মন্ত্রদ্রষ্টা হে রসস্রষ্টা, জাতীয় জীবন তোমার সৃষ্টি,
দেশকাল-সীমা উত্তরি' ধায় ত্রিকালোত্তর তোমার দৃষ্টি।
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজরবি, অই বাজে তব বিজয়ডঙ্কা,
বঙ্কিম, তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে অনৃততিমির শঙ্কা।

শ্যামলা মায়েরে তর্পিলে তুমি অর্পিয়া জবা অশোক রক্ত।
চণ্ডিকা বাণী ইন্দিরারূপে মঠমন্দিরে হেরেছ, ভক্ত।
জীবন-উষার ঋক্‌ছন্দোগ, দিলে, ঋষি, দেশমাতৃমন্ত্র,
নবীন বঙ্গে দিলে, অঙ্গিরা,—নব ষড়ঙ্গ পুরাণ তন্ত্র।
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজরবি—ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা।
বঙ্কিম, তব অমিত প্রভায় ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

গতানুগতিক জনপ্রবাহে তুলি বিদ্রোহ-বৈজয়ন্তী,
আত্মাগুহার আহিত পুরুষে জাগায়ে তুলেছ, স্বকৃতপন্থী।
দ্বন্দ্ববিবাদ অন্ধপ্রমাদ খণ্ডিত তব সাধনা যত্নে,
খনিখাত খুঁড়ি গিরিদরী ঢুঁড়ি এনেছ আহরি সত্যরত্নে।
বঙ্গহৃদয়-সরোজ-সূর্য, ঐ বাজে তব তূর্য-ডঙ্কা,
বঙ্কিম, তব অমৃতশঙ্খে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

* শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

শিল্পজগতে তুমি প্রজাপতি, কল্পনা তব সেবিকা ধন্যা,
প্রতাপ কুন্দ রমা মহেন্দ্র মৃন্ময়ী তব পুত্র কন্যা।
সত্য হইতে পরম সত্য তোমার সৃষ্টি এ মায়া বিশ্বে।
নিত্য হইতে চরম নিত্য দিয়াছ দীক্ষা শতেক শিষ্যে।
বঙ্গহৃদয়-রাজীবসূর্য,—ঐ বাজে তব তূর্য ডঙ্কা।
বঙ্কিম, তব অভয়শঙ্খে ঘুচেছে দেশের অবোধ শঙ্কা।

মোদের সঙ্গে ছলনাছদ্মে সেজেছ পাগল কমলাকান্ত।
বনমঠে তব, হে ভীমকান্ত, হেরেছি স্বরূপ রুদ্রশান্ত।
মরসংসারে রেখে গেছ তব যতেক অমর মানসপুত্র,
ত্যজেছ মর্ত্ত্য, বুকে বাঁধা তবু তব পদাব্জ-মৃণালসূত্র।
মানসসরসী-সরোজসূর্য,—ঐ বাজে তব শৌর্য ডঙ্কা।
আর্য, তোমার গুরুগর্জনে ঘুচেছে দেশের লজ্জাশঙ্কা।

বঙ্গহৃদির দারুণ বেদনা পীড়িল তোমার করুণ বক্ষ,
শত বারুণীতে করে ছলছল তিতাল যা' তব নয়ন পক্ষ্ম।
গীতামন্ত্রের সান্ত্বনা তাহে ফুটে আছে হয়ে সরোজপুঞ্জ।
বাণীর মরালী করে তায় কেলি তীরে তীরে নীতিবেতসীকুঞ্জ,
বঙ্গহৃদয়-পঙ্কজ-ভানু,—ঐ বাজে তব বিজয় ডঙ্কা।
বঙ্কিম,—তব আশার শঙ্খে ঘুচেছে দেশের অসার শঙ্কা।

নববধূ

দুয়ারে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া রয়।
খুড়ী কাঁদে পিসী কাঁদে,   মা মেয়েরে বুকে বাঁধে,
নববধূ; তাহারেও কাঁদিতেই হয়,
পতিগৃহে যাবার সময়।

দেখেছ কি সে বধূর অশ্রুমুক্তাবলী?
কাচের মাঝারে যথা   আলোকের উজ্জ্বলতা;
আনন্দ সেগুলি কিবা রেখেছে উজলি।
অশ্রু তারে ঢেকেছে আগলি।

মেয়ে কয়—মা আমার, ফিরিব মা কবে?
মা কয়—দাদার বিয়ে   হবে যে, আসব নিয়ে।
মেয়ে কয়, জষ্টিমাস? মাঘমাস সবে।
দীর্ঘশ্বাস পড়িল নীরবে।

দেখেছ কি পথে তারে নিজ পতি সনে?
সে কেমন তার সাথে   আমোদে ও গল্পে মাতে
খালি গাড়ী তবু সাধ যায় না শয়নে,
সারা রাত্রি জাগে অকারণে॥

কোথা গেল তার ব্যথা   সারা রাতে তার কথা
ফুরায় না উল্লাসের টানে।
নয় সে কাঁদুনী মেয়ে   নতুন আদর পেয়ে
কলকণ্ঠে হাসিতেও জানে।

শ্রাদ্ধ বাড়ী

প্রকাণ্ড ম্যারাপ-তলে ফুলে ভরা সভা,
সজ্জায় শোভায় বাটী অলংকৃতা যেন পুনর্নবা।
রাস্তায় দাঁড়ায়ে গেছে শত শত গাড়ী
আসিয়াছে শত শত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী।
সিগারেট চুরুটের ধূমে ভরা সারা সভাস্থান
চলিতেছে তার মাঝে গীতাপাঠ, কীর্ত্তনের গান।
কেহ তা শোনে না কান দিয়া।
আড়চোখে দেখে কীর্ত্তনিয়া
জমা হলো কত টাকা থালার উপর।
চলিছে ভোটের গল্প সভাস্থলে কোর্টের খবর।
ছাউনীর অন্য পাশে জনদশ উড়িয়া ব্রাহ্মণ
পান মুখে, ঘামে ভিজে হাতা নাড়ি করিছে রন্ধন।
সভাটির এক পাশে সাজানো ষোড়শ,
খাট-শয্যা বস্ত্র-ফল ভোজ্যাদি তৈজস।
চলিতেছে সমারোহে ঘটা মহোৎসব,
বাজে খোল, হট্টগোল, অট্টহাস্য, চলে কলরব।
আসিছে মিষ্টান্ন দধি কত ভারে ভারে।
পুরুত তাগিদ দেয় হোথা বারে বারে।
সর্ব আভরণমুক্ত থানপরা বিধবা কেবল
এক কোণে একা বসে ফেলে আঁখিজল।
উচ্চ কণ্ঠে ডাকে ছেলে—মা কোথায় হুঁশ নেই তার!
কে করিবে শ্রাদ্ধের যোগাড়?
তা ছাড়া, লুকায়ে থাকা চলে কি এ দিনে?
মহিলা অতিথি এত কে তাদের আপ্যায়িবে চিনে?

ভারার্পণ

তোমরা যারা পাঠ্য-পাঠে কাটাও সারা বেলা,
নিরুদ্বেগে খেলার মাঠে করছ যারা খেলা,
তোমাদের আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরছি বারংবার,
মনে মনে তোমাদেরে দিচ্ছি অনেক ভার।
যে ভার দিলেন মোদের শিরে পিতা-পিতামহ,
সে ভার স'পি তোমাদেরে আশীর্বাদের সহ।

হাতে হাতে সে ভার নিতে পার্‌বে নাক জানি,
কোমল কচি ঘাড়ে ভারী লাগবে সে ভার, মানি
তোমাদেরই বইতে হবে অদূর ভবিষ্যতে,
আজকে না হয় দু'দিন পরে অনাগতের পথে।
মনে মনে তোমাদেরে স'পি সকল ভার,
বিশ্রামের শেষ স্বস্তিটুকুর চাই যে অধিকার।

ব্রত মোদের রইবে বেঁচে,—তোমরা বাঁচাইবে,
প্রাণের চেয়ে বড় যা তায় নূতন জীবন দিবে।
বিফল হবে না'ক মোদের জীবনভরা ব্যথা,
অপূর্ণ যা মোদের মাঝে পাবে তা পূর্ণতা।
জীবন-জোড়া মোদের যা তা হ'বে ভুবন-জোড়া,
সেই আনন্দে সকল ব্যথায় সান্ত্বনা পাই মোরা।

আদ্‌রা এঁকে যাচ্ছি মোরা, মোহন তুলী ধ'রে
পূর্ণ ছবি আঁক্‌বে নানান্ রঙ্ দিয়ে তায় ভ'রে।

সত্য-ফলে পাবে স্বপন-মুকুল পরিণতি,
কল্পধারা হ'বে ভাবে ভাষায় স্রোতস্বতী।
সেই ভরসায় স'চ্ছি মোরা লাঞ্ছনা-লাজ সব!
মুক্তি-রণে আন্‌বে লুটে বিজয়িগৌরব।

গড়্‌ছি যে পথ বন কেটে, তায় মোদের ভারই বহি'
চল্‌বে তাতে সেই ভরসায় সকল শ্রমই সহি।
মোদের শোণিত অশ্রু শোষণ কর্‌ছে আজি ধরা,
তোমাদেরি জন্য তা যে হ'তেছে উর্বরা।
আমরা লাগাই তরুলতা তোমরা পাবে ফল,
সেই ভরসায় খুঁড়্‌তে মাটী পাচ্ছি হাতে বল।

মোদের হাতের সৃষ্টি কতক হয়ত ভেঙ্গে গ'ড়ে,
তুলবে তাদের নূতন যুগের উপযোগী ক'রে।
ভালোই যা তা করবে জানি, ভাঙ্‌বে সকল ভ্রম,
ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই সফল হ'বে শ্রম।
বাঁচবে না আর ব্রত মোদের কালের কৃপা যেচে,
সগৌরবে জয়ী হ'য়েই রইবে তাহা বেঁচে।

মোদের অভাব হ'লেও ব্রতীর হ'বে না অভাব,
মরার আগে এই ভরসাই মোদের পরম লাভ।
মরেও তোমাদেরি মাঝে অমর হবো শেষে,
সব নিবেদন বইবে মোদের অনন্ত উদ্দেশে।
তোমরা মোদের নূতন জীবন এই ধরণীর পারে,
আগে হ'তেই কৃতজ্ঞতা জানাই নমস্কারে ॥*

---

*ছাত্র গণের সভায় পঠিত

কবির কামনা

কুসুমের বনে যে জীবন যাপে প্রজাপতি
এ ধরায় আমি সে জীবনখানি চাই।
সে জীবনে নাই কোন ভয়ভীতি ক্ষয়ক্ষতি,
নাইক বরষা শীতের পীড়ন নাই।

হিসেবী লোকেরা বলে,—"হ'য়োনাক প্রজাপতি,
সঞ্চয়ী নয়, দুর্দিনে তারা মরে।
হও মৌমাছি, দেখ তারা নয় মূঢ়মতি,
শীতের জন্য মৌচাক তারা গড়ে।"

ফুলই যখন ফুটিল না হায় ধরণীতে,
শুষ্ক নীরব কুঞ্জকানন সবই,
কি লাভ বাঁচিয়া জীবনের সেই হেয় শীতে
মরণই ত শ্রেয়,—চিরদিনই কয় কবি।

ফুল ফুরাইলে জীবনও ফুরায় যার
সেই প্রজাপতি হ'তে আমি চাই তাই!
পুষ্প-বিহীন হবে যবে সংসার
চক্রকুহরে বাঁচিতে চাহি না ভাই।

বীরপুরুষ

তোমারে যে মানে, প্রভু!
ভব্যেরা বলে সেত বর্বর, সভ্য নয় সে কভু,
চারি শত বৎসর
আগেকার জীব, প্রগতির পথে নয় সে অগ্রসর।
এই যুগে দেখি সবচেয়ে বেশি বীরগৌরব তার,
তোমারে যে পারে করিতে অস্বীকার।
এত সস্তায় ক্লাইবও বনে নি বীর,
তারো সম্মুখে মোহনলালের ছিল সিপাহির ভিড়।
তুমি দাও না তো দেখা,
হাওয়ায় বর্শা ঘুরায়ে কেমন বিজয়ী হয় সে একা।
মেঘনাদ সম মেঘের আড়ালে নিজেরে লুকায়ে রেখে
একটিও বাণ ছুড়িলে না তূণ থেকে।
প্রতিনিধি তব ধরায় জগন্নাথ
তাঁহারো ত নেই হাত।
নাস্তিকে তব করুণা বা ক্ষমা কম নয় এক রতি,
তোমা না মানিলে হয় না তাহারও ক্ষতি।
অনেকে তোমারে গালাগালি দিয়ে কষে
বড় সস্তায় বীর্ গৌরব বাগায় তোমারি দোষে।
যেই জন সয়ে রয়
বুঝিতে হইবে—সে নাই বাঁচিয়া তাহারে নেইক ভয়।
তুমিত দিব্য হাসিছ সংগোপনে
এদিকে মোদের হয় প্রাণান্ত তাদের আস্ফালনে।
তুমি নিষ্ক্রিয় তুমি ত নির্বিকার
সমাজধর্ম ন্যায় নীতি সব হয়ে যায় ছারখার।

মহাপ্রভুর জন্মদিনে

পতিতে তারণ করিবার তরে নবাবতরণ তব।
নূতন করিয়া তোমার কথা কি কব?
তব স্বপ্নের অপ্রাকৃত সে রসের বৃন্দাবন,
করে আলোকিত পুলকিত ব্রজ-রজে তিলকিত মন।
তোমার প্রেমের ঘর-ছাড়ানো সে বাণী,
মাঝে মাঝে দেয় বটে মোরে হাতসানি,
পঙ্গু কেমনে লংঘিবে প্রভু বাসনার হিমালয়?
আমারে তারণ তোমারো সাধ্য নয়।

নিয়ে যায় টেনে তব মৃদঙ্গতান,
দুই পা আগাই, আবার পিছাই, কাটে না ঘরের টান।
গেরুয়া বসনে রসের সাধন মনে হয় মরীচিকা,
সাধ্যসাধন তত্ত্ব তোমার মোর কাছে প্রহেলিকা।

পরের লাগিয়া বৈরাগী হলে ত্যজি অনিত্য ধন,
ঘরের জন্য রেখে গেছ তুমি যা কিছু চিরন্তন।
হয়ত সে কথা নিজেই ভুলেছ তুমি
নীলাচল তব হয়ত মথুরা নদীয়াই ব্রজভূমি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় গলিয়া যমুনা ঝরিয়া পড়ে।
শচী-জননীর আঁধুয়া নয়নে সুরধুনী ধারা ঝরে।
এ দুই ধারার মহাসঙ্গমে নিত্যই করি স্নান,
করি তাপ দূর, জুড়ায় আতুর প্রাণ।
মুক্তি থাকিলে এতেই মুক্তি পাব,
মুক্তির তরে কোথা ঘর ছেড়ে যাব?

কুমার-সম্ভবের কবি

সাহিত্যের তপোবনে হে বসন্ত তুমি মূর্তিধর,
পূজারিণী গৌরীর কিঙ্কর।
তাঁহার ব্যথায় হয়ে বিগলিতপ্রাণ
সখা অনঙ্গেরে তুমি যোগাইলে পুষ্পময় বাণ।
সারস্বত বনে বনে তোমার সে কুসুমবিলাস
রয়ে গেল চিরন্তন হয়ে বারো মাস,
কি নিদাঘে কি হেমন্তে বর্ষার বর্ষণে
শরতের পুলক হর্ষণে।

কন্দর্পের দর্প দগ্ধ। তপঃক্ষামা উমার বদন
শঙ্করের ভালচন্দ্রদ্যুতি প্রহ্লাদন
যে দিন করিল দীপ্ত পুলকিত তৃপ্তিপ্রভাময়
সেই দিন তোমার বিজয়।
ত্র্যম্বকের যে নয়নে বহ্নি-শিখা হ'ল বিচ্ছুরিত
পঞ্চশরে দহিবারে, সে নয়নে ক্ষরিল অমৃত
সঞ্জীবন সে অমৃত লভি
হলে তুমি চিরঞ্জীব হে বসন্ত-কবি।
ভস্মরাশি হতে পুনঃ মীনকেতু লভিল জীবন
রতি পাশরিল ক্ষতি, মঞ্জরিল অশোক-কানন।
কলকণ্ঠে কুহরিল পিক,
হরগৌরী মুখপানে সেই হতে তুমি অনিমিখ,
চেয়ে আছ কৃতাঞ্জলি মুগ্ধ বৈতালিক।

সুভাষ-তর্পণ

নহে বিত্ত, নহে যশ, ভোগসুখ, নহে গুরুগিরি,
নহে মান অথবা ফকিরি,
কি তোমার কাম্য ছিল, কিসে তব দাবি
আজি জন্মদিনে শুধু সেই কথা ভাবি।
সুকঠোর সাধনার সর্ব কর্মফল,
তব বীরজীবনের সকল সম্বল
কারে তুমি সমর্পিলে সাশ্রুনেত্রে তাহাই জিজ্ঞাসি
হে সাধক, আজন্ম সন্ন্যাসী।

একদিন তব গুরু হয়ে কৃতাঞ্জলি
দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী মা বলি
পূজিলেন ভক্তিভরে দেশমাতৃকারে
তাঁরেই জানিলে তুমি ব্রহ্মময়ী বলি এ সংসারে।
'কায়েন মনসা বাচা' তাঁহার সেবাই
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হ'ল তব তাই।
সর্ব কর্মফল তাই তাঁরে সমর্পিলে
ধূপসম বেদীতলে ও-জীবন দাহি তিলে তিলে।
ত্যাগধর্ম পালনের তরেই যৌবন,
নয় তা ভোগের জন্য,—ভারতের বাণী পুরাতন
তোমার জীবনে পুন হেরি তার পূর্ণ সার্থকতা
সমগ্র ধরণী হ'ল ভারতের চরণে প্রণতা।
যে মুক্তি তোমার ছিল জীবনের ব্রত
মুক্তাহারা শুক্তি তা-যে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।

হারাইয়া তপোলব্ধ তব উর্জোবল,
তোমার আদর্শ ছাড়া বাঙ্গালীর কি আছে সম্বল ?
নহ তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, নহ যুধিষ্ঠির,
গীতামন্ত্র শুনিবার একমাত্র যোগ্য তুমি বীর।
এ যুগে গাণ্ডীবী তুমি, তুমি মহারথ,
তোমা বক্ষে ধরি ধন্য এ মহাভারত।*

বাঁধন ও মুক্তি

বহু দিন ধরি অসীম আকাশে দু'পাখায় ভর দিয়ে
আশ্রয়হারা জীবন-বিহগ উড়িয়া বেড়ালো প্রিয়ে।
উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইল পাখা,
পাইয়া সহসা তোমার প্রেমের পুষ্পিত তরুশাখা
বিশ্রাম তরে সেই আশ্রয়ে রচিল উপনিবেশ।
দূরদূরান্তে যাত্রা হইল শেষ॥
ছায়া দিল তার ঘন পল্লবদল
তৃষা দূরিবারে পাইল সে মধু, ক্ষুধা মিটাইতে ফল।
কাঠকুটা দিয়ে বাঁধিল সেথায় বাসা
প্রাতে সন্ধ্যায় কণ্ঠে জাগিল ছন্দের কলভাষা।
আকাশ তবু সে ভুলিতে পারে নি, উড়ে যায় প্রতি প্রাতে
ফিরে আসে তার কুলায় খুঁজিয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাতে।
বাঁধন হইতে মুক্তির মাঝে ধাওয়া
মুক্তি হইতে বাঁধনে ফিরিয়া যাওয়া,
এমনি করিয়া দিন কাটে তার নীড়ে আর নীলাকাশে
চরম মুক্তি যত দিন নাহি আসে॥

*সুভাষ চন্দ্রের ভবনে তাঁহার জন্মদিবসের অনুষ্ঠানসভায় পঠিত

স্বপ্নদূত*

এই স্বপ্নশিশুগুলি যাদেরে করেছি রূপদান
যাহারা আমারে ঘেরি তুলে আজ হর্ষে কলতান,
বিদায়ের সাথে সাথে মম
এরাও শুকায়ে যাবে ছিন্ন শাখে পুষ্পদলসম,
—ভাবিতে ব্যাকুলি উঠে হৃদয় ব্যথায় ;
সৃষ্টির উল্লাসটুকু তার মাঝে কোথা ডুবে যায়।

জানেনাক আয়ুর সংবাদ,
তাই এরা সেবিতেছে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আহ্লাদ,
অনিচ্ছায় লজ্জা দিয়া স্রষ্টারেই মূঢ়দর্প ভরে।
স্রষ্টার বেদনা তায় গাঢ় হয়ে কুণ্ঠায় গুমরে।

চিত্ত গলি নেত্রে ধারা বয়
গোপনে লুকায়ে অশ্রু করি আমি তৃপ্তি অভিনয়,
সর্বাঙ্গে বুলাই পাণি স্নেহভরে, ইহাদেরই লাগি
দুর্বহ হ'লেও এই জীবনের আয়ুষ্মত্তা মাগি।

সান্ত্বনার লাগি ভাবি, হয়ত বা মৃত্যু হ'লে মম
এদের দুর্গতি হেরি মাতৃহারা শাবকের সম,
দিয়া ঠাঁই বুকের কুলায়ে
দরদী বান্ধব কোন হয় ত বা রাখিবে ভুলায়ে।

* দিল্লীর আকাশ বাণীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে কবি কর্তৃক পঠিত।

যাবে না কি একজনও নিরবধি কালস্রোত ধরি'
যুগ হতে যুগান্তরে সমানধর্মার কথা স্মরি ?
স্বপ্নের লাগিয়া স্বপ্ন ! এর চেয়ে কিবা মায়াময় ?
কুহকিনী আশা বলে—না—না, তাও অসম্ভব নয়।

ওরে স্বপ্ন-শিশুগুলি, কোন' শক্তি মহিমা বিভূতি
পারে নাই সমর্পিতে এ অক্ষম স্রষ্টার আকূতি,
আর্তি শুধু গলি আঁখিজলে
তোদের মালিন্য দৈন্য দূরিবারে চাহে পলে পলে।

অনির্দ্দিষ্ট স্বপ্নশিশু ! যার কথা ভাবি আশাভরে
চলে যাবে যুগ হতে দীর্ঘপথে দূর যুগান্তরে,—
আমার একটি বার্তা তুমি যেন করিও বহন,
যুগান্তের কর্ণে শুধু জানাইবে এই নিবেদন,—
একটি অখ্যাতনামা কবি,—তার নামে কাজ নাই—
তাহার বাঁশরী হতে জন্মেছিনু মোরা ক'টি ভাই,
একে একে পাথারে ঝঞ্ঝায়
সবগুলি পথে হারা, একা আমি দীন অসহায়
কবির গভীর মর্ম্মবেদনার বার্তাখানি বুকে,
যাব অনন্তের পানে, পথ রুধে র'য়ো না সম্মুখে।
সর্ব্বযুগ সর্ব্বদেশ দেয় জানি ব্যথায় মর্য্যদা
দূতেরে কখনো কেহ যাত্রাপথে দেয় নাক বাধা,
বাধা পায় অশ্বমেধী দিগ্বিজয়ী রথী,
মহানদও বাধা পায়—মেঘদূত অবারিতগতি।

কল্পনায় হেরিতেছি—অনামক স্বপ্নদূত-মম
অনন্ত পথের যাত্রী তত্ত্বান্বেষী নচিকেতা সম।

দুরন্ত প্রান্তর পরে ঊর্ধ্বে চাহি চলেছে একাকী,
গগনে জলদঘটা চপলা চমকে থাকি' থাকি' ;
কখনো হারায়ে যায় ঘূর্ণাবর্ত ঝঞ্ঝার ধূলায়
কখনো বা মরুপথে মরীচিকা আলেয়া ভুলায়।
পথহারা ধ্রুবের মতন
গভীর কানন মাঝে কভু করে রজনী যাপন,
কোথাও আতিথ্য লভে মমতার, কোথাও না পায়,
কভু বা অশ্বত্থতলে শ্রান্ত দেহ নিশ্চিন্ত ঘুমায়,
পল্লীরাখালের দলে চলে কভু হর্ষে গাহি গান,
পুরপথ-জনতায় কভু তার মিলে না সন্ধান,
কভু বেদিয়ার দলে মিশে চলে দূর দিগন্তরে
দুরারোহ শৈলপথে উঠে কষ্টে কভু যষ্টিভরে,
কৃপায় পাটনী কভু মহানদী ক'রে দেয় পার ;
কভু বা সন্তরি তরে। কভু করে কূলে হাহাকার।

মোর বার্তা শিরোধার্য করি
চলেছে অনন্ত পানে স্বপ্নদূত দূর পথ ধরি।
এ কল্পনা জাগে যবে স্নেহ মোর শিহরিয়া উঠে,
নির্বিচারে সবারেই টেনে লই বক্ষপক্ষপুটে।

সোনার বাংলা

জননী বঙ্গভূমি,
কবি বলেছেন, সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা তুমি।
মিথ্যা কেমনে বলি ?
তবে কিনা গেছে তার পরে পূরা আশিটি বছর চলি।
মালয় ব্রহ্ম হতে
আসিতেছে চাল বস্তা বস্তা পোতে।
আমেরিকা হতে লাখ লাখ টন আমদানি হয় গম।
মান্দ্রাজ হতে আলু আসিতেছে খাইতেছি তারি দম।
কানপুর দেয় টিন টিন তেল, গাজিপুর দেয় চিনি,
গৌড়ের লোক আমরা, তবুও চটে-মোড়া গুড় কিনি।
বিহার হইতে আসে ছালা ছালা ডাল,
তাই ত গলায় প্রবেশ করিছে কঙ্কর-ভরা চাল ;
দারভাঙা হতে আসিতেছে ফল আম্র পিয়ারা লিচু,
বানারস হতে কিছু।
মসলা আসিছে সমুদ্রপার থেকে,
মাখন আসিছে সিডনি হইতে টিনে আপনারে ঢেকে।
নাগপুর হতে আসে নেবু ঝুড়ি ঝুড়ি।
জাহাজে আসিছে কৌটায় ভরা শুক্না দুধের গুঁড়ি।
বোম্বাই হতে কাপড় আসিছে, আসাম পাঠায় চা—
বলে, 'রে বাঙ্গালী, ভাতের অভাবে যত চাস তত খা।'
পুবে-পশ্চিমে মরিয়াছে জ্ঞাতি-ভাই,
অশৌচান্ত হয়নি এখনো, মাছ খাওয়া নাই তাই।

নানা দেশ হতে আসিয়া দ্রব্যরাজি,
সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা তোমারে করেছে আজি।
অভাব কি তব আছে ?
তেঁতুল আমড়া তাল বেল কুল দুলিছে তোমার গাছে।
ঢেঁড়স ধুঁধুল কুমড়া কাঁকুড় ফলিছে তোমার ক্ষেতে।
কাঁচকলা ঝিঙে লাউ চিচিঙ্গে রাশি রাশি বাজারেতে।
কচু ওল মূলা বাড়িছে মাটির তলে,
একুশ রকম শাক জন্মায় তোমার স্থলে ও জলে।
সজিনা গাছে, মা, ডাঁটার অভাব নাই,
কচি নিম-পাতা যত চাই তত পাই।
মসলা যদিও আমদানি করা, বরজে ফলিছে পান,
খাই বা না খাই পাই দুটি ঠোঁট রাঙাবার উপাদান।
কবি যে তোমায় সোনার বাংলা বলে,
মিথ্যা নয় মা, তোমার মাটিতে সোঁদালে সোনাই ফলে

টবের গাছ

বন্দী আমি বারান্দাতে টবের চারা গাছ।
খাঁচায় পোষা ময়না, যেন চৌবাচ্চার মাছ।
নেই নীলাকাশ মাথার 'পরে উজল রবি-চন্দ্রকরে।
শীতের নিশির পাই না শিশির, পাই না আলোর আঁচ।

মা-হারানো শিশুর মতন দাইয়ের বুকেই রই।
মায়ের বুকের জীবন-রসের অধিকারীই নই।
বোতলভরা দুধের মতো ঝারির বারি পাই যা যত,
হায়রে তাতে মায়ের দুধের পিয়াস মিটে কই ?

আহা যদি ঐ মাটিতে নীল আকাশের তলে,
একটুকু ঠাঁই পেতাম স্বাধীন তরুলতার দলে,
সবার সাথে অশেষ আশায়, আলো-হাওয়ার ভালোবাসায়
ফন-ফনিয়ে বেড়ে হতাম শোভন ফুলে ফলে।

আহা যদি ডোবার ধারেও একটু পেতাম ঠাঁই—
ঘন-শ্যামল হয়ে যেথা দুলছে সকল ভাই।
শাখায় শাখায় গলাগলি, মনের কথা বলাবলি—
কতই হ'ত ভাবতে গেলেও পুলকে চমকাই।

বনের পাখী কুলায় রচি গাইত কতই গান,
দেখত স্বপন, অসীম পথে করত অভিযান।
হয়তো কোনো লতাও মোরে জড়াত শ্যাম বাহুর ডোরে,
মৌমাছিরা করত শাখায় মৌচাকও নির্মাণ।

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্ম-দাহ খর,
শ্রাবণ-ধারার পীড়ন সওয়া কঠিন বটে বড়ো।
জানি আমি ঝড়ের নাচে অনেক তরুর প্রাণ না বাঁচে।
তবু হাজার ক্লেশেও উদার মুক্তি প্রিয়তর।

ছিঁড়ত পাতা ভাঙত শাখা, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে
দপ্‌দপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।
ভেঙে চূরে মূলের জোরে পূর্ণ জীবন উঠত গড়ে।
ডুবত সকল ক্ষয় বা ক্ষতি প্রচণ্ড উল্লাসে।

স্বপ্ন সবি, ও সব কথা ব'লে কি আর হবে ?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী-ঘেরা টবে,
বাধা পেয়ে শিকড় যথা ফিরে এসে জানায় ব্যথা ;
জানি না এই টবের জীবন শেষ হবে বা কবে ?

তবু আমায় হাসতে যে হয় নেইক পরিত্রাণ,
উৎসবে হায় করতে যে হয় আনন্দেরও ভান।
বুকের রুধির নিঙ্‌ড়ে হেসে ফুল ফুটাতেও হয় যে শেষে,
তার সুবাসই সবার চেয়ে বিবশ করে প্রাণ।

ঝড়ের রাতে চমক লাগায় আরণ্য-হুংকার,
স্বপ্ন দেখি—বনভূমির শাল শমী দেওদার
আসছে ছুটে দল বেঁধে সব দেওয়াল ভেঙে, ভেঙে এ টব
করবে তারা বাস্তুহারা আমারে উদ্ধার।

জ্যোৎস্নারাতে স্বপন দেখি—উচ্চ আমার শির,
আমায় ঘিরে কূজন-মুখর তরুলতার ভিড় !
কোথায় টবের গণ্ডী কঠোর ? কোথায় নগর ? চৌদিকে মোর
জোনাক-জ্বলা ঝিল্লীডাকা অরণ্য গভীর।

পসারী ও পসারিনী

জিজ্ঞাসিলে কবি—
'কাকের কুলায় নীরব হ'ল অস্ত গেল রবি,
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস পসরা নিয়ে শিরে
যাবার কথা যখন তোদের বাড়ির পানে ফিরে?'
হাট ভেঙেছে উতরেছে বৈকাল,
কিনবে কে আর আমার ঝাঁকার মাল?
কবি তুমি, তুমি কি আর কারণ জানো নাকো,
পসারিনীর খবর তুমিই রাখো,—
সেদিন পথে দেখে যারে রৌদ্রকাতর কায়
লিখেছিলে একটি গাথা যাহার বেদনায়,
পথপানে যে চেয়ে আছে সে মোর পসারিনী।
ভাঙা হাটের বটের তলে ভাবছে একাকিনী।
কাটুক বিকাল, হাট ভেঙে যাক তাতে তো নেই ক্ষতি,
সন্ধ্যা হয়ে এল বলেই ছুটছি দ্রুতগতি।
এমন অবোধ নইকো আমি বৃথাই বহি ভার,
তারি সাথে আমার যে কারবার।
জানি আমি এই পসরার গ্রাহক জুটিবে না,
তার সঙ্গেই চলবে আমার আসল বেচাকেনা।
সেই বেসাতির তরে কবি চাই না কোনো আলো,
দিবাশেষের অন্ধকারই ভালো।
ভাঙা হাটের সঙ্গিনী সে, আমার এ সঞ্চয়
তারেই দেব, ভরা হাটের রঙ্গিণী সে নয়॥

কবিগুরুর 'অকালে' ও 'পসারিনী' কবিতা পাঠে।

শরতের আবাহন

(গান)

ফিরে এসো পুন সোনালী শরৎ ভাদর শেষে,
মেঘলা আঁধার করিয়া বিদায় মধুর হেসে,
উজ্জ্বল শুচি ধবল বেশে।
ফিরে এসো পুন ভাসায়ে গগন জোছনা বানে,
ফিরে এসো পুন হাসায়ে ভুবন আশার গানে,
করবী ফুলের সুরভি ঘ্রাণে।
ফিরে এসো হ্রদে দিঘি সরোবরে মরালদলে,
এসো সারি-গীতে মুখর তরীর পালের তলে,
গদ্‌গদ নদীনদের জলে।
এসো ঝিলিমিলি রোদের খেলায় পাতার ফাঁকে,
এসো ঝিকিমিকি বালুর বেলায় বকের ঝাঁকে,
সচকিত চখা-চখীর ডাকে।
এসো কাশবনে গাঙশালিকের উপদ্রবে,
এসো বাঁশবনে কুহরে ধ্বনিত বাঁশির রবে,
শেফালি বনের রসোৎসবে।
এসো ফিরে পুন শালিধান্যের শ্যামলতায়,
আসিয়া দাঁড়াও ছাতিম পাতার ছাতার ছায়
অঙ্গ জুড়ায়ে শীতল বায়।
এসো বনে বনে ছায়া আলোকের আলিঙ্গনে,
এসো মনে মনে নূতন আশার সঞ্চারণে
নবজীবনের উদ্বোধনে।

চলার গান
(চরৈবেতি)

চলিতে চলিতে শ্রান্ত যেজন, সেইত লক্ষ্মী লভে,
এই কথা জানে সবে।
ধিক্ ধিক্ তারে বিভব আগুলি শুধু বসে থাকে যেই,
চলে যেই জন ইন্দ্রের সখা সেই।

চলে যেই জন জঙ্ঘায় তার ফুটে উঠে ফুলদল,
আত্মায় ধরে ফল।
চলার বেগেই যত পাপতাপ একে একে যায় মরে,
চল্‌তি পথের দুই ধারে রয় পড়ে।

বসে থাকে যেই ভাগ্যও তার চলৎ-শক্তিহারা,
খাড়া হ'লে হয় খাড়া।
শুয়ে পড়ে যেবা—কপালও তাহার পড়ে থাকে শয্যাতে,
চলিতে ধরিলে ভাগ্যও চলে সাথে।

সুপ্তিভঙ্গে জাগরণ যাহা তারেই দ্বাপর বলি,
নিদ্রাই ঘোর কলি।
ত্রেতা কারে কয়? উঠিয়া দাঁড়ানো তেয়াগি শয্যাসুখ,
চলিতে থাকাই প্রকৃত সত্যযুগ।

মধু যদি চাও মধুকর-সম হও তবে অনলস,
চল, পাবে ফল-রস,
সূর্যের পানে চেয়ে বল দেখি কিসে মাহাত্ম্য তার?
চলিতে চলিতে থামে না সে একবার॥

রসচক্রের শরৎচন্দ্র

এত কাছে ছিলে দরদী বন্ধু ছিলে এত আত্মীয়,
কত বড় তুমি দিনেকেরো তরে জানিতে পারিনি প্রিয়।
মৃত্যু তোমারে চিনায়ে দিয়াছে আজ,
রাখালের সাজে আমাদের মাঝে ছিলে রাজ অধিরাজ।
তোমার সঙ্গে হেসেছি মিশেছি আপনার জন জেনে,
আপন মহিমা লুকাইয়া তুমি বক্ষে নিয়েছ টেনে।
করেছি প্রমাদ, কত অপরাধ, করেছি হয়ত হেলা,
আপন বিভূতি সংবরি নিতি করিয়াছ ছেলে-খেলা।

অবোধ জনের প্রেমে
কোন রসরাজ লীলারস-সুখ ভুঞ্জিতে এলে নেমে?
তবু খনে খনে হইয়াছে মনে, নও তুমি সাধারণ,
তোমার মাঝারে ঐশ্বর্যের হেরিতাম আভাসন।
ভক্তি-তারকা যেমনি উঠেছে জেগে
ঢাকিয়া দিয়াছ তাড়াতাড়ি প্রীতিঘন মাধুরীর মেঘে।

মোহ-মাধুর্যে ঘিরিয়া রাখিলে, টুটাইলে ব্যবধান;
প্রিয়জন জেনে তোমার উপরে করিয়াছি অভিমান।
পাছে কভু তোমা ধরে ফেলি তাই অবোধ সেজেছ নিজে
আবেদনে ভরা নয়ন তোমার কে জানে চাহিত কী যে।
জানিতে পাইনি কত যে তোমার আত্মার গভীরতা,
আমাদেরি মত হাসিতে কাঁদিতে কহিতে মনেরই কথা।

বিশ্বজিতের দাতা,
কি ধনের তরে কাঙালের ঘরে তব অঞ্জলি পাতা ?
আজি মনে হয় কত অপরাধই করিয়াছি আচরণে
মূঢ়তা হেরিয়া কতবারই তুমি হাসিয়াছ মনে মনে।
সাধ ক'রে ভুল ক'রে কত বার মানিয়াছ পরাজয়,
অমানীরে মান দিতে করিয়াছ বালকের অভিনয়।
ধূলার মতন ঝাড়িয়া ফেলেছ মোদের আঘাতগুলি,
স্বপ্ন-ভঙ্গ পাছে হয় বলি আঘাত করনি ভুলি।

পাছে পাই প্রাণে ব্যথা,
কোন দিন তাই বলনিক কটু কঠোর সত্য কথা।
মর্যাদা তব কখনো রাখিনি উৎসব-কোলাহলে,
কত কথা আজ মনে পড়ে আর আঁখি ভ'রে উঠে জলে

সারা বঙ্গের হৃদয়ের তুমি ভূপ।
মৃত্যু আজিকে দেখালো বন্ধু তোমার বিশ্বরূপ।
আবিষ্কারের বিস্ময়ে লভে হৃদয় বিস্ফারণ।
শিরায় শোণিত স্তম্ভিত, ভীত চকিত নয়ন মন।
সেদিনও যাহার সাথে পরিহাস করেছি বন্ধু বলে,
সে সারা দেশের মনোরাজত্ব পায়ে ঠেলে গেল চলে।

আঁখিজলে ভেসে ভাবি আজ বারবার
কেন দিলেনাক পূজা করিবার অবসর অধিকার।
চলে গেলে তুমি মহাসমারোহে জয়-ভাস্বর রথে,
ব্রজরাখালিয়া চোখে চেয়ে আছি তোমার বিদায়পথে ॥

ক্ষমাধর্ম

(শ্রীমদ্‌ভাগবত)

কুরুক্ষেত্র রণ ক্ষান্ত। রণক্লান্ত সর্বস্বান্ত
বিজয়ী পাণ্ডব,
অশ্রু-সিন্ধুতলে মগ্ন ভগ্নধ্বজ সাফল্যের
উদ্ধত গৌরব।
দগ্ধ করে যুধিষ্ঠিরে বিষদিগ্ধ বিজয়ের
পরাজয়-জ্বালা
জয়লক্ষ্মী পরায়েছে কণ্ঠে তাঁর নির্বেদের
কণ্টকিত মালা।
নিশীথে তস্করসম সন্তর্পণে পশি সুপ্ত
পাঞ্চাল-শিবিরে
মিটায়েছে দ্রোণপুত্র জিঘাংসার অন্তর্দাহ
দ্রৌপদ-রুধিরে
পিতার তর্পণ করি। ছিল সেথা সুখসুপ্ত
পাঁচটি নন্দন
পাঞ্চালীর। পঞ্চ মুণ্ড- শতদল খড়্‌গাঘাতে
করিয়া ছেদন
উপবীতে গাঁথি মাল্য হ্রদমগ্ন কুরুরাজে
দিল উপহার।
মহাযাত্রা করিয়াছে হেরি তাহা, কুরুরাজ
করি হাহাকার।
বহু রাজমুণ্ডে গড়া পাণ্ডবের অভ্রভেদী
বৈজয়ন্ত-চূড়া
একা চৌর বিপ্রাধম খড়্‌গাঘাতে সে গৌরব
করে দিল গুঁড়া।

মূর্তিমতী ক্ষাত্রশক্তি সর্বংসহা তেজস্বিনী
দ্রুপদনন্দিনী
অশ্রুর অতীত শোকে শুনি বার্তা পার্থমুখে
আজি উন্মাদিনী।

সহস্র যজ্ঞের শিখা জেগে ওঠে সর্ব অঙ্গে
সহস্র ফণায়
নয়ন উগারে জ্বালা অবিরল অশনির
স্ফুলিঙ্গ-কণায়।
প্রলয়ের মেঘসম আলুলিত বৃকোদর-
হস্তে বাঁধা বেণী,
শ্লথ সর্ব বেশ-বাস, ত্যজে ঘন তপ্তশ্বাস
আজি যাজ্ঞসেনী।

সচকিত ধনঞ্জয় কহিল সম্মুখে আসি
প্রতিজ্ঞা আমার
পুত্রঘাতী পাষণ্ডের ছিন্নমুণ্ড আনি তোমা
দিব উপহার।
নাগলোকে শিবলোকে বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মলোকে
যদিবা লুকায়
তবু তারে বন্দী করি, যদি চাও আনি আর্যে
সঁপিব তোমায়।
ধরিনু গাণ্ডীব পুন কাঁপাইব রসাতল
দ্যুলোক ভূলোক,
সংহর সংহর ক্রোধ সম্বর' সম্বর' দেবি
তব পুত্র-শোক।

দিন শেষ হয়ে এলো দিগন্তে বেদনাতুর
শোকরক্তচ্ছবি—
কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের পরপারে অস্তাচলে
মগ্নপ্রায় রবি।
তিমির ঘনায়ে আসে শোকতপ্তা জননীর
অন্তরে বাহিরে।
বেড়ে যায় আর্তনাদ হাহাকার নিষ্প্রদীপ
পাণ্ডব-শিবিরে।

হেনকালে রণশ্রান্ত— ধনঞ্জয় উপনীত
শিবিরের দ্বারে
রজ্জুবদ্ধ পশুসম করি বন্দী লজ্জানত
অপত্য-হন্তারে।
ভীমসেন গর্জি কয় 'খণ্ডে খণ্ডে কাট এই
পাষণ্ডের দেহ।'
'তুষানলে দগ্ধ কর তিলে তিলে, শূলে দাও'
কয় কেহ কেহ।
এত ক্ষণে অশ্রুজল উচ্ছলিল খরস্রোতে
পাঞ্চালীর চোখে,
সমস্ত দিনের পরে অবৃষ্টিসংরম্ভ স্তব্ধ
বজ্রগর্ভ শোকে।
সহসা সংবিদ্ লভি রজ্জুবদ্ধ ম্লানমুখ—
গুরুপুত্রে দেখি
কহিলেন চমকিয়া 'হায় হায় ধনঞ্জয়
করিয়াছ একি ?
ঘাতকে করিয়া হত্যা হয় কভু জননীর
পুত্রশোক দূর ?

শান্তি পায় মাতৃহৃদি　　কোপশান্তি করি কভু
　　হইয়া নিষ্ঠুর?
স্মরো সেই স্নেহমুগ্ধ　　ব্যথাতুর তব গুরু-
　　পত্নীর বদন,
স্মরো সেই দুগ্ধভিক্ষু　　স্নেহাতুর গুরুর সে
　　কাতর নয়ন।
মুক্ত কর রজ্জুডোর　　এ বন্দীরে দেখি মোর
　　ফেটে যায় বুক,
উছলিছে পুত্রশোক　　হেরি ছল ছল চোখ
　　গুরুপুত্রমুখ।'
গুরুপুত্রে প্রণমিয়া　　কৃষ্ণা ক'ন কৃতাঞ্জলি
　　'হে ব্রাহ্মণ ক্ষম।
দৈব দায়ী, দৈব দায়ী　　তুমি শুধু উপলক্ষ
　　তব খড়্গসম।'

মুক্ত হ'ল অশ্বত্থামা।　　ভীমসেন রোষে ক্ষোভে
　　উঠিল গুমরি।
কৃষ্ণা বসিলেন গিয়া　　কৃষ্ণের চরণতলে
　　শোকার্তি সম্বরি।
যুধিষ্ঠির বলিলেন—　　'ধর্মের হইল জয়।'
　　নিঃস্পন্দ নীরব
নতশির ধনঞ্জয়,　　মৃদুহাস্য হাসিলেন
　　কেবল কেশব।

পূর্ণচন্দ্রের উদ্দেশে

দোঁহারেই তুমি হেরিছ নয়নে উর্ধ্ব গগনে বসি'
দোঁহার প্রাণের বারতা তোমার ভালো জানা আছে শশী
তোমা পানে চেয়ে মোরা মনে মনে
যত লিখি লিপি বিরহ-শয়নে
তুমি বহ সবি তাইকি তোমার বুকে মাখা তারি মসী।

তবুও বন্ধু মোদের বিরহে এত কেন তব হাসি ?
হাসি পায় বুঝি দেখি মানুষের এই ভালবাসাবাসি !
তুমি ভাব' বুঝি মিলনে বিরহে
প্রেমের জগতে তফাৎ কি রহে ?
ভেদবুদ্ধিটা মনের ভ্রান্তি প্রেম যদি অবিনাশী।

তোমারি ভ্রান্তি মানুষের সাথে নেই গাঢ় পরিচয়।
প্রিয়ার বিরহ কত যে অসহ জাননা তা মহাশয়।
জান না বন্ধু শরীরীর কাছে
মিলন বিরহে ভেদ খুবই আছে।
তোমার বিচারে সে ভেদ মিথ্যা। ব্যথা-ত মিথ্যা নয়।

পূর্ণিমা তব উৎসব তিথি ব্রজ-রাসলীলা সম।
সারা নিশি হয় চন্দ্রিকাময়, মোদেরি হৃদয়ে তমঃ,
সারা রাতি দোঁহে জাগায় বিরহ
সেই উৎসবে প্রেয়সীর সহ
যোগ দিতে চাই, পারিনাক হায়—সেই অপরাধ ক্ষমো॥

মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা

চক্ষে দেখিতেছি যবে মৃত্যুবিভীষিকা,
অন্তরে জ্বলিল মোর সান্ত্বনার শিখা,
সে আলোকে দেখিলাম মোর সারা অতীত জীবন,
যেন এক সুদীর্ঘ স্বপন,
করি তার মাঝারে স্মরণ
কতবার কতরূপে এড়ানু মরণ,
যখন মিটেনি এই জীবনের দুরন্ত পিপাসা,
তখনি ছিল না মোর কত বার জীবনের আশা।
কত আগে মরিবার কথা।
এই স্মৃতি দেয় মোর মৃত্যুপথে চিত্তের দৃঢ়তা।

কে আমারে বাঁচাইয়া এতদূর আনিল আগায়ে
কে আমারে রাখিয়াছে এত কাল শ্রীচরণছায়ে!
সে-ই যদি আজি বলে—'আজি তোর ভবলীলা শেষ,'
শিরে ধরি তাহার নিদেশ
অনন্তে ভাসিতে মোর নেই কোন খেদ,
নাই ক্ষোভ, নাইক নির্বেদ।
বহুকালই বাঁচিবার অধিকার তার করুণায়
পাইয়াছি এ ভুবনে, এই ভাগ্য ক'জনই বা পায় ?

সার্থক করিতে জন্ম পাইয়াছি বহু অবসর
প্রতীক্ষা করেছে মৃত্যু অনেক বৎসর।
ব্যর্থ যদি হয়ে থাকে এ-জীবন কারো নাই দোষ,
কারো পরে নাই রোষ, নাই অসন্তোষ।
সত্যই কি ব্যর্থ এ জীবন ?
শুধু কি বাঁচিয়া গেছি পশুর মতন ?

আহারে নিদ্রায় আর ভোগে
অমিতাচারের ফলে ভুগেছি কি রোগে ?
জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই ধন
চিরসুন্দরের পায় করিনি কি নিত্য নিবেদন ?
এ সান্ত্বনা নিয়ে আমি বাড়ায়েছি নাড়ীশূন্য পাণি,
সুন্দরই কাণ্ডারীরূপে ধরিবে তা মনে প্রাণে জানি।

গভীর রাতের রহস্য

রাত্রি দুটো, গ্রীষ্মকাল—দুরন্ত গরম, ঘরে থাকা হলো দায়।
এলাম ছাদের পরে, আকাশ ভূতল ভরা অসংখ্য তারায়।
ঝিরিঝিরি হাওয়া বয় মুখর নগর এবে নীরব, নির্বাক।
মাঝে মাঝে শোনা যায় শিশুর কাঁদন আর কুকুরের ডাক।

কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি, হেন রূপ নগরের দেখিনি নয়নে—
বিরাটের যোগনিদ্রা শেষের ফণার পরে সমুদ্র-শয়নে।
গৃহে গৃহে বন্ধ দ্বার, ঘুচায়েছে অন্ধকার উঁচু-নীচু-ভেদ,
পাঁচতলা একতলা কুঁড়ে ঘর একাকার, নেইক বিচ্ছেদ।

সম্মুখে দেখিনু যেন তেপান্তর মাঠখানা—অনন্ত-প্রসার।
সে মাঠে রহস্যময় হেথা হোথা আলো যেন নৃত্য আলেয়ার।
লক্ষ লক্ষ নরনারী দেখে যত সুখস্বপ্ন গাঢ় ঘুমঘোরে—
তেপান্তর পারে তারা মিলে সব তোলে বুঝি স্বপ্নপুরী গড়ে।

সেই স্বপ্ন ইন্দ্রজালে উচ্চাবচ বন্ধুরতা সকলি বিলীন,
পরম সত্যের বোধি পেলাম যা' কোথায় তা ছিল এতদিন ?
দিনের আলোকে যারা ছোট বড় উঁচু নীচু, স্বপ্নের পাথারে,
তাদের সকল ভেদ সব ব্যবধান ছেদনিমগ্ন আঁধারে।

পূজার দিনে

গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ।   আজ মহানবমীর দিন
চলিলাম মাঠপথে—দেখি পথে মোদের নবীন
আখক্ষেত আলে বসে একমনে কাটিতেছে ঘাস।
নবীন গরীব বড়, ফেলিলাম ব্যথার নিশ্বাস।

নিমন্ত্রণ সারি এসে দেখিলাম সেইখানে চেয়ে
নবীন তখনো সেথা ঘাস কাটে গান গেয়ে গেয়ে,
বলিলাম "বাবা নবু, বারো মাসই ঘাস তুমি কাটো,
আমোদ কর না আজ—শুভদিনে কেন আর খাটো?

সবাই নিয়েছে ছুটি—কাজ বন্ধ এই দিন তিন,
সারা দিন ঘাস কেটে আজো তুমি কাটাবে নবীন?"
নবীন বলিল—"কত্তা, যা বলিলে সন্দ নেই তায়,
আজকে পূজার দিনে সকলেই ভাল পরে খায়;

পাবে না গোরুটি মোর ভাল ক'রে পেট ভ'রে খেতে?
দুর্বল অবোলা জীব সাধ তার যায় নাকি এতে,
চিবাবে শুক্‌না খড়?"   আমি ভূরি-ভোজন-কাতর
দেহটি লইয়া ফিরে আসিলাম গৃহে নিরুত্তর।

জলকমল ও স্থলকমল

বক্ষে ছিল কাব্যরমার জলকমলের মালা
সকল ব্যথা দিল তা জুড়িয়ে।
জীবনভরা ভুবনভরা এত ব্যথার জ্বালা
কেমন ক'রে সইলে তুমি প্রিয়ে?
বল্‌লে প্রিয়া,—বুলিয়ে দিলে স্থলকমল অই পাণি,
মুখের পরে রেখে করুণ চোখ।
রসের সরোবরে তব প্রফুল্ল মুখখানি
ভুলিয়ে দিল সকল দুঃখ শোক।
চক্ষু জুড়ায় তোমার বুকের কমলমালা দেখে
ঘটায় বটে একটু ব্যবধান,
বঞ্চিতা যে নইক প্রিয়, তারো পরশ থেকে
আমারে যে বক্ষে দিলে স্থান॥

আদর্শ মানুষ

জলের উপরে থাকে জলই হংসে শুচি রাখে
নির্মল হবার কথা তার।
পঙ্কে রহে কুলীরক পঙ্কমাখা তার ত্বক্
স্বভাবতঃ বহে পঙ্কভার॥
পাঁকাল থাকিয়া পাঁকে নিজেরে নির্মল রাখে
বিন্দু পাঁক লাগে নাক' গায়।
তারি মত বারোমাস সংসারে যে করে বাস
আদর্শ মানুষ কহি তায়॥

নারদ

কাহারেও তুমি কর নাকো ভয়, দ্বেষ কি ঘৃণা।
স্বর্গমর্ত্যে সেতু রচিয়াছে তোমার বীণা।
ত্রিলোক তোমার হস্তামলক,
বিম্বিত নখে ত্রিকাল তব।
তুমি মহাযোগী, তব যোগাযোগে
সম্ভব হয় অসম্ভব-ও।
যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর, নর, দেবাসুর তব আপন জন
বিশ্ব-যজ্ঞে এড়াবে কে তব নিমন্ত্রণ ?
তুমি প্রজাপতি, তুমিই ঘটক
জুটাও সবারে স্বয়ংবরে।
হে চির পান্থ, হরিগুণ গাও,
তাহাই পথের ক্লান্তি হরে।
সংসারী নও, সংসার গড়া তোমার ব্রত।
ভব সংসারে বিরাগ ঘটাতে
কে পারে আবার তোমার মতো ?

দেবতারা সব ভাব-বিগ্রহ
মায়াকল্পিত, তাদের মাঝে—
রক্তমাংসে তুমি জীবন্ত ;
ধরায় বিহার তোমারি সাজে।
শুকদেব নও নেহাৎ, তাই তো
ভালবাসি তোমা হে রসরাজ,
মনে পড়ে রাজা অম্বরীষেরে ?
থাক, সে কথায় নেইক কাজ।

চির যৌবন করিতে গোপন

হে রসিক, ধরো ঋষির বেশ ;

তোমার জটার ফাঁকে দেয় উঁকি

কালো কুচকুচে চাঁচর কেশ ॥

তোমার বীণায় পাই যে গীতের সঙ্গে গীতা।

আধেক ঠাকুর, আধা দাদা তুমি

দুইয়ে মিলে দাদাঠাকুর মিতা।

তোমার জটার রশ্মিজালে

নব জ্যোতিষ্ক যেন শোভা পায় গগনভালে।

দেব নর পায় আশ্বাস তায়,

ছায়াপথে তব 'ত্বিষাং চয়ে।'

অসুরেরা তারে ধূমকেতু ভাবি লুকায় ভয়ে।

সবার বার্তা করিছ বহন

তবু তুমি কারো ভৃত্য নহ,

চির জঙ্গম দশম গ্রহ, গতিবিধি তব অনুগ্রহ।

তোমারে হেরিয়া কুণ্ঠিতা অব-

গুণ্ঠিতা কভু হয় না নারী,

শুদ্ধান্তের দেব কঞ্চুকী

পথ ছাড়ি দেয় সকল দ্বারী।

জীবন তোমার সরস কাব্য

গতিই তাহাতে ছন্দোধারা।

রসের যোগান দেয় তায় রবি-চন্দ্র-তারা ॥

তব আতিথ্য যেখানে সেখানে,

শুভাশিস-বাহী তোমার পাণি,

সংকটদায় হলে আসন্ন
শুনাও সতর্কতার বাণী।
আতিথ্যে তুমি ধর' না ত্রুটি,
পাদ্যের তরে বাড়ায়ে দাও না চরণ দু'টি॥

স্থাণু হয়ে সুধা পিয়ে দেবতারা
আলস বিলাসে কাটায় দিন।
তুমি গতি সেই অগতিগণের
কাজে ও অকাজে বিরামহীন।
তুমি জানো কেবা বিরাট্ যজ্ঞ
করিছে ইন্দ্র-পদের লাগি,'
তপ করে বনে কোথা কে গোপনে,
জপ করে কেবা রজনী জাগি—
সেই বার্তাটি বহন করিয়া
উদ্বেগ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন
বাসবের মোহ-ঘোর ভাঙি তারে
করো সত্যের সম্মুখীন॥

লোকে বলে তুমি দ্বন্দ্ব বাধাও,
তাও নিতান্ত মিথ্যা নয়।
বিনা দ্বন্দ্বে কি চৈতন্যের হয় উদয়?
দ্বন্দ্ব না হ'লে সুপ্ত শক্তি জাগিবে কিসে?
ধর্মাধর্ম একাকার হয়ে যাবে যে মিশে।
বিনা দ্বন্দ্বে যে বিশ্বনাট্যে
হয় নাকো কভু রসোৎসার,
তোমার মতন কে বা জানে? তুমি
বিশ্বনাটের সূত্রধার॥

দেবের দৌত্য করিয়া বেড়াও
অরসিক লোকে তাহাই বোঝে।
তুমি যে গোসাঁই অকাজের চাঁই
ঘোরো ত্রিভুবনে রসেরই খোঁজে।
জানে কয় জন তব অকারণ
যত অঘটন-ঘটন ব্রত
গন্ধ, স্বাদুতা, ছন্দ জাগাতে
সুখেরে করিয়া দ্বন্দ্বাহত॥

শুধু তো দ্বন্দ্বে জমে নাকো রস,
জমে তা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে।
জিনিল তমসা-পুলিনের কবি
দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরে অসংশয়ে—
রস প্রেরণায়, শিখাইলে তায়
'ঘটে যা তা সব সত্য নহে,'
কবি যাহা রচে তাহাই সত্য,
তাই মহাকাল শীর্ষে বহে॥

পেটের ভোট

একটি গাছের দুইটি পত্র সমান কভু না হয়।
পাঁচটি আঙুল সমান কখনো নয়।
মানুষে মানুষে চোখে কানে নাকে দাঁতে মুখে হাতে পায়,
অনেক তফাৎ একই দেশে দেখা যায়।
দেখেছো কি কভু ভাবি?
পেটটা শুধুই সবার সমান, সমানই পেটের দাবি।
মাথার উপর ট্যাক্স্ বসে তাই মাথা বুঝে পড়ে চোট,
পেটের হিসাবে গণতন্ত্রের সাম্যবাদের ভোট।

রক্ষক ও ভক্ষক

অনেক কালের কথা
রাজার হইল নিদারুণ ব্যাধি, বুকে দুঃসহ ব্যথা।
রাজবৈদ্যেরা বলিলেন,—“প্রভু অসাধ্য এই রোগ,
ঔষধে আর কিছু হইবে না করুন দৈবযোগ।”
রাজপুরোহিত বলিলেন—“প্রভু, একটি উপায় আছে,—
একটি বালকে বলিদান দিন মহাশক্তির কাছে।
শাস্ত্রে যে সব লক্ষণ আছে, অন্যথা নাহি হয়,
মিলাইয়া দেখি, পিতার নিকটে করিয়া আনুন ক্রয়।”

বহু সন্ধানে মিলিল বালক, রাশি রাশি ধনদানে
কিনিল নৃপতি কাঙাল জনকজননীর সন্তানে।
পুরবিচারক দিলেন বিধান, ‘বালকের বলিদান
ধর্মবিরোধী নয় কোন দিন রাখিতে রাজার প্রাণ।’

অমাবস্যার রাতে
পূজাশেষ হ’ল বহুশত ছাগ-মেষের শোণিতপাতে।
সবশেষে হবে বালকের বলি, আসিল তাহার পালা।
যূপে হাত রাখি’ দাঁড়াল বালক কণ্ঠে জবার মালা।
খড়্গ হস্তে দাঁড়াল ঘাতক বিলম্ব নাই আর,
বালক হাসিয়া উঠিল সহসা একে একে চারি বার।
বিস্মিত হয়ে নৃপতি শুধালো—“কখনো দেখিনি হেন,
খড়্গের তলে দাঁড়ায়ে বালক, কি সুখে হাসিছ, কেন ?”
বলিল বালক, “শোন নৃপালক, মৃত্যুরে নাহি ডরি,
হাসিলাম আমি চারিবার তাই চারিটি বিষয় স্মরি’।

বিশ্বে কেহ ত আপনার নাই জনকজননীসম,
অর্থের লোভে বেচিল তাহারা এমনি ভাগ্য মম।
হেন বিচিত্র দেখেছ জগতে ? অন্যায়-প্রতিকার
করিবার তরে আছে এ-দেশের যাঁহার হস্তে ভার
তিনিই দিলেন বধের বিধান। দেশরক্ষক রাজা
নিখিল প্রজার যিনি আশ্রয় তাঁরি তরে মোর সাজা।
সর্বজীবের যিনি শরণ্যা বিশ্বজননী যিনি
বিনা অপরাধে এই বালকের জীবন নেবেন তিনি।
হেন বিচিত্র ব্যাপার রাজন্ বিশ্বে দেখেছ কবে ?
এতে যদি হাসি নাহি পায়, বল' কিসে হাসি পাবে তবে ?
মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলে যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক, সেথা মরা সেত বাঁচিয়াই।"

রাজা বলিলেন "ঘাতক, বালকে মুক্ত করিয়া দাও,
বালক, এখনি তব জননীর নিকটে ফিরিয়া যাও।
এ নিরপরাধ বালকে বধিয়া জীবন যদি বা পাই,—
অমর ত নই, ক'দিন বাঁচিব ?—সে জীবনে কাজ নাই।"

ভবভূতির সীতা

(রামের উক্তি)

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দন-পল্লব রস সঙ্গে
নিঙাড়ি ইন্দু-কিরণাঙ্কুর মরি মরি মোর অঙ্গে ?
কে দিল মানস-পরিতর্পণ জীবনৌষধিবিত্ত ?
সুধায় সিক্ত করিল তিক্ত তাপজর্জ্জর চিত্ত।
সঞ্জীবন এ পরিমোহন সে পূরাপরিচিত স্পর্শ,
প্রতি এ-অঙ্গে প্রীতিতরঙ্গে সঞ্চারে নবহর্ষ।
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে সাত্বিকরস-বন্যা
বিবশ করিছে বিথারি নূতন জড়তা পুলক-জন্যা।
কুন্দ কোরক দশনে ভূষিত অনিন্দ্য মুখখানি,
যেন বা মূর্ত্ত মহা-উৎসব কমনীয় তার পাণি,
কণ্ঠে সে পাণি যেন বা চন্দ্রকান্তমণির হার,
ইন্দুকিরণে শিশিরবিন্দু নিচিত অঙ্গে যার।
বাণী তার ম্লান জীবকুসুমের বিকাশিকা, তাহা ছাড়া
কি তুষিবে মোর কর্ণকুহর বরষিয়া সুধাধারা ?
মোহন দৃষ্টি-দুগ্ধ-সরিতে গাহন করাতো মোরে
প্রণামে পদ্ম কুট্‌মল-রুচি' দুটি পাণি জোড় ক'রে।
নেত্রযুগলে অমৃতবর্ত্তী—লক্ষ্মীস্বরূপা গেহে,
জীবন আমার, দ্বিতীয় হৃদয়, কৌমুদী-সুধা দেহে।
বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তার,
যেন নব সিত লবলীকন্দ নবনীত-সুকুমার।
সাত্বিক অনুরাগসঞ্চারে উল্লাসে লীলায়িত,
মৃদুচঞ্চল স্বেদরোমাঞ্চ কম্পনে পুলকিত,
নববারিসেকে বিকচ-কোরক তনু তার মনোরম,
প্রাবৃট সমীরে মৃদু স্পন্দিত স্ফুট-নীপশাখাসম ॥

গীতা-পাঠ

দক্ষিণাপথে অনেক তীর্থ ঘুরে
শ্রীচৈতন্য জ্যৈষ্ঠের শেষে এলে শ্রীরঙ্গপুরে।
সাধু বেঙ্কটভট্ট নমিল প্রভুর চরণতলে
সিক্ত করিয়া প্রেমের অশ্রু-জলে
নিবেদিল—"প্রভু, আমার ভবনে অতিথি হতেই হবে।
তীর্থ হউক মম গৃহ তব পদরজোবৈভবে।
কত কাল হ'তে পথ চেয়ে আছি আমি,
আমারে করুণা করিতেই হবে স্বামী।"
কহিলেন প্রভু, "আশ্রয় মোর নাই—
শুধু ভালবেসে যে ডাকে আমারে তারি গৃহে আমি যাই।
যে গৃহে লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা পান,
সে গৃহ ছাড়িয়া কোথা যাব আমি, হে গৃহী ভাগ্যবান।"

কহিল ভট্ট, "সমুখে বর্ষাকাল
পথ দুর্গম, ভরে যাবে নদী-খাল।
বর্ষার চারি মাস
সেবা করি আমি তোমার চরণ এই মোর অভিলাষ।"
কহিলেন প্রভু,—"শ্রীরঙ্গনাথ মোরে
বেঁধে রাখবেন প্রেমকরুণার ডোরে,
সত্বর যেতে উৎসুকই যদি হই,
যাবার উপায় কই?"

কাবেরীতে করি স্নান
প্রতিদিন প্রভু রঙ্গনাথের মন্দির-তলে যান।

হেরিলেন প্রভু জগমোহনের কোণে
এক ব্রাহ্মণ গীতা পড়ে একমনে।
জলগ্রহণ করে সে নিত্য গোটা গীতাখানি পড়ি',
একটি প্রহর ধরি'।
মূর্খ বলিয়া সকলেই তারে জানে,
সকলে তাহারে উপহাস-বাণ হানে।
থমকিয়া প্রভু দাঁড়ালেন তার পাশে—
হেরিলেন তিনি, কেবলি আঁখি সে মুছিছে বহির্বাসে।
সর্ব অঙ্গে জাগে তার শিহরণ,
তাহার সঙ্গে ঘন ঘন কম্পন।
শুধালেন প্রভু—"কি বুঝিছ তুমি, পড়িতেছ অকারণ,
ছন্দ জান না, করিতেছ কত ভ্রান্ত উচ্চারণ।
দেবভাষা সাথে পরিচয় নাই, অর্থ বোধ না করি'
কি সুখ লভিছ শুকের মতন পড়ি' ?"

দাঁড়াইয়া উঠি' বলিল বিপ্র,—"স্বামী,
মূর্খ বিপ্র আমি,
কেবল বর্ণপরিচয় আছে, অর্থ কিছু না জানি।
বারো মাস আমি গীতা পড়ি প্রভু গুরুর আদেশ মানি
পড়ে যাই যত খন
মনের নয়নে করি আমি দরশন
পার্থের রথে সারথির রূপে ভগবান নারায়ণ
এক হাতে কশা অন্য হস্তে বল্গা ধরিয়া র'ন।
পার্থেরে ধীরে দেন জ্ঞান উপদেশ,
এই চিত্রটি স্মরিয়া কেবল হয় মোর রসাবেশ।
একটি প্রহর ধরি
কৃষ্ণের এই অপূর্ব রূপ আমি উপভোগ করি।

একটি বর্ণ বুঝি না গীতার বাণী,
শুকের মতন প'ড়ে যাই পুঁথিখানি।"
পতিতপাবন বাহু প্রসারণ করি
মূর্খ বিপ্রে বক্ষে আদরে ধ'রি
বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ,
তুমিই গীতার সারমর্মটি করেছ সংহরণ।
গীতা ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত যত অভিমানে মাতোয়ারা,
তোমার চরণতলে বুঝে যাক গীতার মর্ম তারা।
গীতাপাঠে পুরা তোমারি ত' অধিকার,
তুমিই বুঝেছ গীতার তত্ত্বসার।
যত দিন আমি শ্রীরঙ্গপুরে আছি
হে ভক্তবর, তোমার সঙ্গ যাচি।"
উপহাস যারা করিত সবাই তখন আসিল ছুটে।
ধন্য হইল গীতা-পাঠকের চরণের ধূলি লুটে॥

মৃদঙ্গ

হরিনাম গান বাংলার প্রাণ আকাশ-বাতাস ভরি
মাতায়ে তুলিল, শিহরি উঠিল যত তৃণমঞ্জরী।
সেই তৃণে পশু বাঁচিল একদা তেয়াগিল শেষে প্রাণ,
চর্ম তাহার আজো ভোলে নাই সেই হরিনাম গান।
বাংলার মাটি হরিনাম-সুধা পিয়েছিল একদিন,
সেই সুধারস আজিও তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লীন।
সেই মাটি দেখ অনলকুণ্ডে পুড়িয়াছে নিঃশেষে,
তবু সুধাটুকু বক্ষে রেখেছে, বণ্টন করে দেশে।
গৌড়বঙ্গে সেই মৃদঙ্গে আজি প্রণিপাত করি,
গৌর অঙ্গে জাগাইল যাহা পুলকের মঞ্জরী॥

গাভীর ব্যথা

গাভীর ব্যথা কবির প্রাণে গভীর ব্যথা হয়ে
জাগছে রয়ে রয়ে।
তুই ধারে ক্ষেত নধর চিকণ ধানের শীষে ভরে,
রাখালেরা যায় নিয়ে তায় মুখটি বেঁধে খড়ে।
দূর ডহরে গেলে তাহার মুখের বাঁধন ঘুচে,
বাছুরটি রয় গোয়ালঘরে ঘাস মুখে না রুচে।
হাম্বা রবে ডাকে,
রাখাল কি আর দেখে ভাবি খুঁজছে গাভী কাকে?
ফসলে মুখ দিলে গাভী পাঁচনবাড়ি খায়।
ফসল এবং ঘাসের তফাৎ সে কি বোঝে হায়?
ফিরলে গোয়ালঘরে,
বাছুরটি তার ছুটে আসে, রাখাল চেপে ধরে।
দিনের শেষে তাহার বাছার যে তুধ পাওয়ার কথা,
নেয় তুয়ে তা মালিক এসে, হায়রে বৎসলতা!
ভরছে কেঁড়ে, তুগ্ধ তাহার ঝরছে অবিরল,
দোহনধারার সঙ্গে গাভীর চক্ষে ঝরে জল।
হায়রে বাছুর হায়!
দোহন সেত পায় না মায়ের লেহন শুধু পায়।
অসুর মানুষ এমনি করে পশুর মায়ে সেবি'
বানায় তারে দেবী।
দেবীর ব্যথাই এই কবিরেও মানুষ করে তোলে,
সেও যে অসুর পশুর অধম ক্ষণেক তরে ভোলে।
কবির পরিকল্পিত শ্যাম 'কল্প ধেনু' স্মরে
তার বাছাদের দশা ভেবে অশ্রুতে চোখ ভরে॥

সোমপায়ীর গান*

মনে হয় অরিজনে করি আজ ক্ষমা,
ভুলে গিয়ে রাগ-রোষ ক্ষোভ-দ্বেষ জমা।
মনে হয় উঁচু নীচু সবাই সমান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে পড়ে যত কিছু করিয়াছি পাপ,
সে সবের তরে মোর হয় অনুতাপ।
করিয়াছি আমি যেন অমৃতে সিনান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় মোর ঠাঁই সকলের নীচে,
আমি কবি এ কথাটা আগাগোড়া মিছে।
বড় ভুল করিয়াছি পুষি অভিমান,
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় এ জগতে সুত মিত জায়া
যাহাদের মোহে মজি, সবি তারা মায়া।
মনে হয় কে আমারে করিছে আহ্বান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় আমি যেন এ ধরার নই,
কার অভিশাপে যেন হেথা আমি রই।
হ'ল কি আমার আজ শাপ অবসান?
আমি কি করেছি সোম পান?

* ঋগ্‌বেদের সোমসূক্তের অনুসরণে

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে

অশীতি বৎসর আগে যে জগতে হে মহাপুরুষ,
জন্ম নিলে সে জগতে মানুষ হয়নি অমানুষ,
পশুত্ব তাহারো ছিল, পশুত্বের গূঢ় অন্তস্থলে
মনুষ্যত্ব ছিল সুপ্ত, তাহাই জাগাতে প্রেমবলে
চেয়েছিলে, হরে নাই মানুষের সকল সম্বল
তখনো বিজ্ঞান, তাই সে-সাধনা হয়নি নিস্ফল।

নিলে আজ যে জগৎ হইতে বিদায়
সে জগৎ যুগচক্রে বিবর্তিত, সে জগৎ হায়
দানবে ভরিয়া গেছে। সেথা ব্যর্থ সাধনা নিষ্কাম;
সুপ্ত নয়, লুপ্ত সেথা মনুষ্যত্ব, মর্ত্য—দৈত্যধাম।
তবু আশা ত্যজ নাই, আশা তব প্রাণাধিক প্রিয়
দৈত্যেরে বানাতে দেব স্বর্গ হ'তে আনিলে অমিয়।
পাষাণে রোপিয়া বীজ অঙ্কুরের ছিলে প্রতীক্ষায়
অকপট শিশুসম নিষ্কলুষ মৌন মমতায়।

হন্তা তব উপলক্ষ, এ বিশ্বের সর্ব দানবতা
কেন্দ্রীভূত তার মাঝে, তার ধ্বংস করিবারই কথা
যাহা কিছু সত্য শুচি শুভঙ্কর সুন্দর মহান্।
যুগে যুগে এই লীলা করে শয়তান।
শুনাইলে হরিনাম যে হিরণ্যকশিপুর কানে
ফিরিয়া চাহিল সে কি অসহায় প্রহ্লাদের পানে?

লভিলে বাঙ্ময়ী ভক্তি তুমি দেশে দেশে,
তোমারে চিনিল তারা প্রেমগুরু তব ছদ্মবেশে?
তোমারে চিনিত যদি ধরিত যে তব ব্রত শিরে
নিষ্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে রক্তবন্যা প্রবাহের তীরে

দাঁড়াইয়া দেখিত না তব ব্রতে ডুবিতে অতলে,
শুধু জয়ধ্বনি নয়, সর্বস্বই দিত পলে পলে।
খৃষ্টেরে ভুলেছে যারা ক্রুশকাষ্ঠে গড়েছে ক্রুজার,
সত্যই কি তারা তোমা করিল স্বীকার?
অহিংসা সাধনালভ্য, আজীবন করিয়াছ তপ,
তার লাগি করিয়াছ মহামন্ত্র জপ।
সারা জীবনের তপে লব্ধ তব পরমার্থ ধন
কার সাধ্য বিনা তপে করিবে বরণ?
না করিয়া তপোমূল্য দান,
যাহারা করিল শুধু অভিনয়ে সাত্ত্বিকতা ভান,
তারাও চিনেনি তোমা। লোকোত্তর তব বাণীব্রত,
হইয়াছে ঋদ্ধিপথে তাহাদের পাথেয়ের মত।
যে অস্ত্রে নিহত তুমি সে অস্ত্র যাদের আবিষ্কার,
তারাও সমান দায়ী অপরাধী তোমার হত্যার,
প্রার্থনার মহাপথে সবারে করিয়া যাও ক্ষমা।
তাই তব শেষ দান, শেষ বাণী তাই অনুত্তমা।
যেই মহাযজ্ঞে তুমি আত্মাহুতি করিলে অর্পণ
তার ধূমজালে আজ নিপীড়িত মোদের নয়ন,
বাষ্পাচ্ছন্ন রক্তনেত্রে সত্যাসত্য চিনাই কঠিন।
সে নেত্রে বুঝিতে নারি রাত্রি কিংবা দিন।
বুদ্ধিরে স্তম্ভিত আজি করিয়াছে মর্মভেদী শোক।
এই শুধু জানি হোতা যজ্ঞফল পাবে জীবলোক,
নির্বাসিত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিবে তার সাথে,
দৈত্যধাম স্বর্গ হবে হে দধীচি তব রক্তপাতে।
মানবের ইতিহাসে এত বড় উৎসর্গ মহান্
হয় নাই কোন দিন। ব্যর্থ যদি এই অবদান,

সবই মিথ্যা, নাই তবে সত্য, ধর্ম, নাই ধর্মরাজ,
সত্য শুধু এ কলঙ্ক লাজ।
পঞ্জর হইল চূর্ণ ব্রত তার রহিল ধরায়
মন্দির হইল ভগ্ন দেবতা লভিল মুক্তি তায়,
যাহা ছিল ভারতের তাহা হ'লো সারা বসুধার,
ত্রিকালের ধন হ'ল যাহা শুধু ছিল আজিকার।
প্রবর্তিলে নবধর্ম নিজ প্রাণে করি প্রাণবান্,
জগতের সর্ব ধর্ম তার মাঝে হবে মজ্জমান।
তব বক্ষোরক্তধারা মেঘচ্ছেদী নবারুণসম
বিদূরিয়া হিংস্রতার তমঃ,
অভিনব সভ্যতার প্রভাতেরই করিল সূচনা ;
শোচনায় ইহাই সান্ত্বনা ॥

বিষদৃষ্টি

উষার শিশির মুকুতা কে বলে ? নিশার নয়ন-জল।
হাসেনাক ফুল, কীটপতঙ্গ ধরার তা শুধু ছল।
গায়নাক গান পাখী—
ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করে গান তায় কয় নাকি ?
সোনা ছড়াইয়া সূর্য যায় না অস্তগমন রথে,
রক্ত বমন ক'রে যায় সে যে মহাযাত্রার পথে।
তরুর অঙ্গে উঠে না লতিকা হৃদয়ের প্রেমভরে
উঠে সে তরুরে জড়ায়ে মারার তরে।
বাষ্পের রাশি দেখা যায় মেঘাকারে
'শুধু কামাতুর প্রকৃতিকৃপণ' পিওন বানায় তারে।
এই কথাগুলি ভুলিয়াছ তুমি কবি।
তোমার লেখায় তাই ভুলিল না এযুগের কোন ভবী ॥

দর্পহরণ

প্রতি প্রাতে আসে ডাক, বহি আনে নিতি
পত্রপুটে কবিখ্যাতি কত স্তুতি কত গুণগীতি,
কত না অপরিচিত যুবকের শ্রদ্ধানিবেদন,
পেয়ে তাই গর্বে ভরে মন।
মনে ভাবি, আমি বুঝি গণ্যমান্য ধন্য একজন,
দেশের অগণ্য লোকে করে বুঝি আমারে স্মরণ !
তার পর দশটা বাজিলে
কঙ্করিত অন্নপিণ্ড গিলে
প্রুফের ঝোলাটি হাতে ট্রামগাড়ি ধরিবারে ধাই,
হারাই ভিড়ের মাঝে। ডাণ্ডা ধরে সারা পথ যাই।
সীট যদি খালি হয় তরুণ সবল
প্যাণ্ট-পরা যুবকেরা তাড়াতাড়ি করে তা দখল।
ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি ক'রে
নামি শেষে প্রতিদিন চড়কডাঙার সেই মোড়ে।
কর্মস্থলে পহুঁছিয়া মোহ মোর আধা হয় দূর,
আর ত্রিশজন সাথে দেখি আমি শিক্ষার মজুর।
নোটিশ রুটিন ঘণ্টা মানিয়া সকলি
কাঁটায় কাঁটায় নিত্য সেই এক ঘানি টেনে চলি।
এক আশা এক লক্ষ্য এক ক্ষোভ খেদ
রাখে না সবার সাথে মোর কোন ভেদ।
পাঠনার কক্ষে যবে যাই
আত্মমূল্য মর্মে মর্মে বুঝিবার অবসর পাই।
হাতজোড় ক'রে সেথা নিত্য কর্ম সারি
বেত্রপাণি ভৃত্য মাত্র, করে সেথা ছাত্রেরা মাস্টারি।

কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে গৃহে আসি ফিরে,
নির্মল, নির্মোহ, শুচি,—স্নান করি যেন গঙ্গানীরে।

এমনি করিয়া দর্প করিতেছ চূর্ণ প্রতিদিন,
এমনি করিয়া নিত্য করিতেছ আমারে নবীন
দর্পহারী হে মধুসূদন,
আঘাতে আঘাতে মোরে করিয়া শোধন।
দর্প মোর জমি তিলে তিলে
তুঙ্গ হয়ে উঠিত যে জমিবার অবসর দিলে,
ঢাকিত তা সত্যের তপন
তোমারেও ভুলাইত সে মোহস্বপন ;
খেয়াঘাট পথখানি হইত দুর্গম
সে ঘাটে নামিতে হ'ত কষ্টে তাহা করি অতিক্রম ॥

প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় পায় প্রত্যহের পাপ
করিতে হয় না অনুতাপ।
প্রভাতে যতই কেন শুনি স্তব মিঠে চাটু বুলি,
দিনান্তে সকলি যাই ভুলি।
প্রভাত কুহেলিভরা, সন্ধ্যা আনে জ্যোৎস্নার প্লাবন
তার পরে হেরি রাজে তব শ্রীচরণ ॥

ভগবানের প্রাপ্য

পণ্ডিত কবি আসিল একদা ধনীর তীর্থবাসে
চৌদ্দটি শ্লোকে পদ্য রচিয়া পুরস্কারের আশে।
কহিলেন ধনী—"সুধীচূড়ামণি, শ্লোকগুলি রেখে যা'ন।
কালি প্রাতে এলে এ গুণগানের দেব আমি প্রতিদান।"

পরদিন প্রাতে কবি জোড়হাতে দাঁড়াইল সভাতলে,
দেখিল বিতরে ধনী অকাতরে অর্থ যাচক-দলে।
কহিলেন ধনী—"যেন মহামণি, এ রচনা আপনার,
যেমন ছন্দ, ভাব, ভাষা, রীতি, তেমনই অলঙ্কার।
আমারে তুষিতে বচনে ভূষিতে বলেছেন বহু কথা,
কবির বাচিক-অর্ঘ্যে জানাই—গভীর কৃতজ্ঞতা।"

প্রহরেক পরে কহিলেন ধনী—"সভা শেষ আজিকার,
বৃথা কেন আর বসে রয়েছেন করুন গে স্নানাহার।"
ম্লান মুখে কয় কবি জোড়হাতে—"এখনো ত মিলে নাই,
যার লাগি প্রভু আসতে আদেশ, বসেই রয়েছি তাই।"

কহিলেন ধনী—"যার লাগি ছিল আসবার অনুরোধ
তা ত মিলে গেছে, করেছি আমি ত আপনার ঋণশোধ।
মিষ্ট কথার বদলে মিষ্ট কথায় রেখেছি মান,
প্রতিদান দেব ব'লে যে ছিলাম, করেছি ত প্রতিদান।
শুনুন, হে কবি, এমন ছন্দ, ভাষা-চাতুর্য, রীতি,
হেন কবিত্ব, হেন কৃতিত্ব, এমন অলঙ্কৃতি,
এই অভাজনে ক'রে নিবেদন করেছেন অপচার,
পরমেশ্বরে নিবেদিলে, আমি দিতাম পুরস্কার।"

আকিঞ্চন

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ গান উৎসবের কলতান
একেবারে না পশে শ্রবণে।
যেথা নিত্য নাহি হেরি সতত আমারে ঘেরি'
উল্লাসের নরীনৃত্য চলে,
যেখানে সম্ভোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে।
যেখানে ফোটে না ফুল সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
নাচিয়া তুলে না কলতান।

সুখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
শুধু আর্তনাদ পথে পথে।
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসেরে ধিক্কার না হানে,
যেন কাঙালিনী মেয়ে দুয়ারে না রয় চেয়ে
উৎসবের সমারোহ পানে।
হ'য়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

বৃথা এই আবেদন সকরুণ আকিঞ্চন,
চিরদিন চলিবে এ লীলা,
ছুখেরে সুখেরই পাশে কাঁদাইবে হা-হুতাশে,
চাপাবে সুখের বুকে শিলা।
হায় জীব কত স'বে? বিদ্রোহী হইত কবে,
হে চতুর, বোঝ না কি তাও?
দিয়ে মূঢ় ভালবাসা, দিয়ে তৃষা, দিয়ে আশা,
কোনরূপে ছুনিয়া চালাও॥
কিসে মোরা অপরাধী? এ সংসার-যূপে বাঁধি'
বিল্বপত্র করাও চর্বণ—
ছুই-ই শাস্তি ছুঃখে সুখে তৃপ্তিহীন ম্লানমুখে
ভরা তব লীলার ভুবন।

মৃত

এই বিশ্বের লীলা অপরূপ নিত্য নূতন কত,
নবীভূত করে গগন গহন গিরি নদী অবিরত,
সঞ্চার করে কত রূপ রস গন্ধ পরশ ধ্বনি,
না জাগায় যার প্রাণে বিস্ময় মৃত তাহারেই গণি॥

মানব-জীবনে স্মৃতি স্বপ্নের আশা-বাসনার খেলা,
কত না দ্বন্দ্ব, কত না ছন্দ, কত প্রীতি, কত হেলা,
কত জ্বালা, তাপ, অনুতাপ পাপ, নিত্যই লীলায়িত,
বিচলিত যারে করে না কখনো তাহারেই জানি মৃত॥

যাহারা ঘুমায়, হাসে, খায়-দায়, কাঁদে যন্ত্রণা সয়ে,
হানাহানি করে, টানাটানি করে তুচ্ছ যা-কিছু লয়ে।
ভালো খেয়ে প'রে বেঁচে থাকা ছাড়া নাই কিছু বাঞ্ছিত,
পুতুল-নাচের পুতুলের মতো, তাদেরেও জানি মৃত॥

ভিক্ষা ও দীক্ষা

ভিক্ষা শুধু দাও নাই—শিক্ষা দিলে, দীক্ষা দিলে দাতা
বিনিময়ে কি পেয়েছ জান তুমি।—জানেন বিধাতা।
সামান্য ভিক্ষার সঙ্গে কি পেয়েছি কেমনে বুঝাই ?
ভিক্ষা নিতে এসে আমি মনুষ্যত্ব পুন ফিরে পাই।

তুচ্ছ এ দেহের লাভ। নাশে কণ্ঠ-জঠরের দাহ
অনায়াসে কাননের ফল-মূল, নদীর প্রবাহ।
তার কথা কহি নাই, কহিতেছি মনের বারতা
তারে জাগাইয়া দাতা সঞ্চারিলে একি অপূর্বতা !

বিনিময়ে দিই কিছু সাধ যায়, পাই না সন্ধান,
সাধ যায় দাতা হয়ে এ ভিক্ষার আধা করি দান।
ধনীরে হয় না হিংসা তার 'পরে রয়নাক রাগ,
কোন ইষ্ট না করিয়া তাদের ধনের পাই ভাগ।
আপনা হইতে দৃষ্টি নিরুপায়, ঊর্ধ্বপানে ধায়,
বারে বারে স্মরি তাঁয়, দাতা তব ইষ্ট-কামনায়।

ভুলেও স্মরি না যাঁরে দূষি যাঁরে অবিচারী বলি'
তাঁরি পানে এ বিদ্রোহী চিত্ত মোর হয় কৃতাঞ্জলি।
অভাব দিলেন যিনি—কর্মফলে, হৃদয়ে দাতার
তিনিই তো করেছেন মোচনার্থ দয়ারও সঞ্চার।
মাঝে মাঝে তাঁর কথা সেই হ'তে উঠে মনে জাগি।
ভিক্ষা-সাথে দীক্ষা-শিক্ষা, বলি নাই অনুপ্রাস লাগি॥
দাতা কহিলেন, "ভ্রাতা, ইষ্ট মোর করেছ সাধন
মম সুপ্ত মনুষ্যত্বে কৃপারূপে ক'রে উদ্বোধন।"

কালিদাসের বর্ষা

নীপ-সৌরভে ভরি দশদিশি নৃপ-গৌরবে আজ
অই—এসেছে প্রাবৃট্‌রাজ।
সজল জলদ গজযূথ তার, তড়িতে কেতন উড়ে,
সঘন অশনি-মর্দলে ধ্বনি ঘোষিছে অবনী জুড়ে,
আজ—প্রাবৃট্‌ পশিল পুরে।

মেঘের মন্দ্র শুনি মাতঙ্গ মেতে উঠে মদভরে
রোষে—অনুহুঙ্কার করে।
ষট্‌পদগণ কট-মদ-লোভে গণ্ডে তাদের বসে,
উৎপলভ্রমে নৃত্য-বিতত শিখীর কলাপে পশে,
হ্রদে—না হেরিয়া তামরসে।

গিরির দগ্ধ হৃদয় জুড়ায় প্রেমময় মেঘগুলি
করি—বারবার কোলাকুলি।
সমূলে উপাড়ি কূল-তরু, নদী সলিলে আবিলমতি,
রূপবতী হতভাগিনীর মত চলে যথা উপপতি
কূলে—কে রোধে তাহার গতি?

তড়িতে পাখ্‌না পুড়িয়া যাক্‌ না, চাতকী ছুটিছে তবু
তাকে—ডেকেছে প্রাণের প্রভু।
কুলের অবলা সহসা সবলা করে দূরে অভিসার,
স্বভাব-চপলা চপলা দূতিকা সহায় হয়েছে তার
পথে—চমকিয়া বারবার।

নিতম্বিনীর শ্রোণিচুম্বিত লম্বিত কেশপাশে,
চারু—স্ফুট কদম্ব হাসে।
ত্যজি অনঙ্গে অঙ্গনা আজি ইন্দ্রদেবেরে পূজে,
সন্ধ্যার মেঘ-মন্দ্রে কৃপার ইঙ্গিত বলি বুঝে,
ত্বরা—বন্ধুর গৃহ খুঁজে।

প্রেয়সী কানন-রমার আনন রাঙায় প্রাবৃট্-রাজ।
চুমি'—ভাঙায় তাহার লাজ।
শোভায় কুটজে কটিতট, শ্রুতি তরল মুকুতা-ফলে,
কবরীতে দেয় পরায়ে করবী, সুরভি যূথিকা-দলে
মালা—গেঁথে দেয় তার গলে।

লভি নববারি দাহতাপহারি, আজি ধরা-সতী সুখে
ধারা—স্নান করি কৌতুকে,
ইন্দ্রগোপের বিদ্রুম, নব তৃণ-মরকত রাজি,
নব কন্দলী ইন্দ্রনীলের রম্য ভূষায় সাজি—
রূপে—বরবর্ণিনী আজি।

নববারি-সেকে প্রতি রোমে জাগে নারী-দেহে অঙ্কুর,
কালো—অগুরুতে ভুরভুর!
পৌর প্রাসাদে বজ্রের নাদে কামিনীরা কাঁপে ডরে,
মানিনী ভামিনী মান ভুলি নিজ কান্তে আঁকড়ি' ধরে,
ভয়ে—নিশীথ-শয়ন 'পরে!

পথিক-দয়িতা শয্যাশয়িতা জর্জর স্মর-শরে,
তার—নয়নে বরষা ঝরে!

তনু-দাহ অনুলেপনে মাল্যে দূর হয়নাক আর,
একে একে সবি অঙ্গের ভূষা করিয়াছে পরিহার
লঘু—দুকূল হয়েছে সার।

চলে বায়ু অতিমন্থরগতি শীকর-নিকর বহি'
ধীরে—বিরহিচিত্ত দহি'।
মন্থরতর চলে পয়োধর বিষে অন্তর জরে,
প্রবাসিজনের দণ্ডপ্রহর মন্থরতায় ভরে,
তার—গজগমনারে স্মরে।

নভঃসতীর পীন পয়োধরে দুলিছে তড়িৎ হার,
মরি,—হরিতে হৃদয় কার?
শৈল-শিখরে শিখা বিস্তারি' শিখীরা লাস্য করে,
ময়ূর-পুচ্ছ ধরি যেন গিরি মৌলি-চূড়ার 'পরে
আজ—গিরিধারিরূপ ধরে।

কমলিনী আজ বিমথিতা হ'য়ে সলিলে ডোবে,
মধুকরকুল আসিয়া সেথায় মধুর লোভে
মধু নাহি পেয়ে দারুণ ক্ষোভে,
করি গুঞ্জন শ্রুতিতর্পণ,
জল হ'তে স্থলে করিয়া ভ্রমণ
উৎপলভ্রমে বসে সাগ্রহে তৃষ্ণাভরে
নর্তনরত শিখীর বিতত কলাপ 'পরে।

অদ্রির শোভা কি আর ক'ব ?
অভ্রপুঞ্জ আজিকে শুভ্র কমলপ্রভ,
উপলগুলিরে করে চুম্বন
ঝরে খরবেগে নির্ঝরগণ
চারিধারে বাহি গিরিশিখর।
পরমানন্দে চন্দ্রকরাজি বিথারিয়া নাচে শিখিনিকর।

অম্বুবাহের অম্বুশীকর-সঙ্গ লভিয়া অতি শীতল
সমীরণ আজি বহে প্রবল।
কাঁপে কদম্ব সর্জার্জুন কেতকীবন।
উৎসুক করে সবার চিত্ত সুবাসিত সেই বনপবন।

আকুল চিকুর আশ্রোণীতট-বিলম্বিত,
সুরভি কুসুমে কর্ণভূষণ সংরচিত,
সুন্দর হারে মণ্ডিত বুক,
সীধুগণ্ডূষে ভরা বিধুমুখ,
করে প্রলুব্ধ কামিজনে যত পুরাঙ্গনা
সুসিতবসনা হসিতাননা।

ইন্দ্রধনুতে তড়িল্লতায় সাজিয়াছে আজ কাদম্বিনী,
হেমমেখলায় মণিকুণ্ডলে নিতম্বিনী,
বিরহবিধুর প্রবাসিগণে
অধীর করিছে মদির মেদুর নবভূষণে।

নবকদম্ব কুটজকুসুমে গাঁথিয়া হার,
শোভিয়া তাহাতে চিকুরভার,
অর্জুনতরুমঞ্জরী দিয়া কর্ণভূষণ করি রচনা
মন হরে আজ বরাঙ্গনা।

কালাগুরু আর হরিচন্দনে চর্চিত করি অঙ্গলতা
পুরনারীগণ গুরুজন-গৃহকক্ষ হইতে বহির্গতা
ত্বরিতে শয়নকক্ষে পশে,
করিয়া সুরভি কেশপাশ তারে গরবী করিতে প্রিয়পরশে,
মেঘনাদ শুনি আজি হরষে।

কুবলয়দল-নীল মেঘমালা মণ্ডিত হ'য়ে ইন্দ্রচাপে,
কভু বা মন্দ পবনে কাঁপে।
নববারিসেকে তাপ দূরে গেছে প্রমুদিত আজি বনস্থলী,
স্ফুট কদম্বে স্ফুরিত তাহার পুলকাবলী।
নৃত্য তাহার শাখায় শাখায় কম্পিত তরু অগ্রভাগে,
হাস্য কেতকীকেশরে জাগে।

আজিকে বরষা হাতে ধরি যেন ফুলের ডালা,
রচিত মালতীকুসুম-খচিত বকুলমালা
বধূদের কেশপাশে পরায়,
নবকদম্বে যূথিকা-কোরক খচিয়া তায়
রচিয়া তাদের কর্ণপুর,
কান্ত যেমন নিজ হাতে সাজ রচে বধূর।

নব জলকণাসঙ্গ লভিয়া হয়ে শীতল
বহে বায়ু করি কম্পিত ফুলভারানত তরুলতা সকল।

কেতকীর রজে মন্থরগতি গন্ধবিধুর মৃদু পবন
প্রবাসীর মন করে হরণ।

বিন্ধ্যগিরির বনরাজি আজি মানস হরে,
নবপল্লবে পাদপগণের অঙ্গ ভরে।
তৃণরাজি ছিল হরিণীগণের মুখক্ষত
তাহাতে হয়েছে নবীনাঙ্কুর সমুদ্‌গত,
মরকতময়া বনস্থলী
মনে হয় যেন হিরণবরণ হরিণীনিকরে খচিত বলি'।

বৃষ্টিধারায় মোরা যবে প্রিয়ে হই অধীর,
আশ্রয় পাই বিরাট অঙ্কে গগনচুম্বী এই গিরির।
গ্রীষ্মানলের খরতর জ্বালা
দহিল যাহারে, আজি মেঘমালা
জলভারনত সেই বিন্ধ্যেরে করি বার বার আলিঙ্গন
করিতেছে তাপ অপনোদন।

বহু বহু গুণে রমণীয় এই বর্ষাকাল
তরুলতাদের পরম বন্ধু ভূলোকপাল,
এ জীবলোকের প্রাণস্বরূপ জীবনাধার,
কামিনীগণের হৃদয়-হারক নির্বিকার,
মঙ্গল তব করুক বিধান সর্বভাবে
বাঞ্ছা তোমার পূরাক সকল কাম্য লাভে॥

খণ্ডকপালী

সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা আর রহিলে না তুমি,
ঋষি বঙ্কিম বন্দিল যারে বলিয়া মাতৃভূমি।
রুক্ষ ঊষর বক্ষে ধূসর ধূ-ধূ শুধু প্রান্তর
ডাহুক-বলাকা-চখাচখী-ডাকা কোথা গেল বালুচর?
কোথা গেল খরা নদীবুকভরা পাল-তোলা শতশত
সারি সারি তরী রাজহংসের মতো?
কোথা গেল পদকমল ঘেরিয়া কল মরালের তান
বৈঠার তালে তালে ভাটিয়ালী গান?
কোথা গেল পূগবীথি-পরিবৃত সোনা-ফলা অঙ্গন?
কোথা গেল কল-কাকলী-মুখর বেণু-বেতসের বন?

কোথা সে অট্টহাস্যে ফেনিল পট্টবসন গায়?
স্তন্য সহসা তব পয়োধরে শুকাইয়া গেল হায়!
দুধের তৃষ্ণা মিটিবে কি হায় ঘোলে?
শিশুরা পিঠালি-গোলা দুধ বলি পিইবে তোমার কোলে?
সিনানে নামিলে চিক্কণ মীনপাঁতি
তব কটি বেড়ি নিক্কণহীন মেখলা দিবে না গাঁথি।
দিনের অতিথি ভানু ফিরে যাবে বুকে অতৃপ্ত তৃষা,
বিগলিত কলধৌত-ধারায় সেবিবে না তোমা নিশা।

শীকরসিক্ত চিকুর তোমার করি আয় পরশন,
শীতল হবে না নিদাঘের সমীরণ।
কোথা গেল গলে নীলোৎপলের মালা?
পরিলে পদ্মবীজের মাল্য রুদ্রাক্ষের বালা।

হারাইয়া হিম-গিরির প্রসাদ, বরুণের ভাণ্ডার,
ফল্গুধারার সন্ধানে রবে কুক্ষিতে বসুধার ?
খণ্ডকপালী, চিরবাঞ্ছিতে লভিলে গভীর রাতে,
গাঙ্গুড়ের ভেলা প্রাতে।

তোমার ভাগ্যে এই কি লিখিল ধাতা
আর নহ হায় সীতারাম রায়, চাঁদ-প্রতাপের মাতা।
রাণী ভবানীর ব্রহ্মোত্তরে নাই তব অধিকার।
দিব্যক ভীম গণেশ তোমার সন্তান নহে আর।
ভূস্বামিগণ বণিক শেঠের সাথে
কুযুক্তি করি কোন সে অশুভ ঘোর দুর্যোগ রাতে
খাল কাটি এক কুমীর আনিল, সাগরে সে গেল ফিরে
পুচ্ছ আঘাতে ভাঙ্গিয়া সে গেল তোমার বক্ষটিরে।

কবির পদ্মা, চলিল ভাসিয়া একদা যাহার বুকে
পাকা ধানে ভরা সোনার তরীটি অসীমের অভিমুখে,
যার তীরে নীরে প্রকৃতির দান লভি
সর্বোত্তমা কাব্যসুষমা রচনা করিয়া কবি
বিশ্বজনের হৃদয় করিল জয়,
সে পদ্মা আর নয় মা তোমার নয়।
মূল হারাইয়া শাখা হল তার পুঁজি।
ইন্দ্রের রথ হারাইয়া পথ তোমারে পাবে না খুঁজি।

পূর্ণমুক্তি-চন্দ্রের তরে তপে পেলে অভিশাপ
লভিলে অর্ধচন্দ্র, তাহার জ্যোৎস্নায় বড় তাপ।
ময়ূরাক্ষীটি রহিল তোমার কপোতাক্ষীটি কই ?
অন্নদা বলি ডাকি মা তোমায় কেমনে ধন্য হই।

তুমি একাঙ্ক্ষী মনসা হইলে—কোন সাধু সদাগর
পূজিবে না তোমা জননি অতঃপর।
কর্ণভূষণ রচিবে না আর কুসুমে কর্ণফুলী
মেঘনা তোমার চোখে বুলাবে না মেঘলা কাজল তূলী।
বৎসরান্তে অম্বিকা তব ঘরে
আসিবে ঘোটকে আসিবে না আর ভরা পাল তরী 'পরে।

মুক্তির লাগি বুকের রক্ত অঝোরে ঢালিল যারা
বরণ করিল মরণসমান কারা,
শোষক শাসনে বহু বৎসর ধরি
ক্রূর বিগ্রহে শতনিগ্রহ সহিল জীবন ভরি,
তারাই তোমার প্রবীরকুমার। তাহাদের পরিণাম
স্মরিতে অশ্রু ঝরে আজ অবিরাম॥

দপ্তরী

দপ্তরী, দপ্তরী!
কত বই তুমি বাঁধাও বন্ধু কত না যতন করি।
মসীলাঞ্ছিত যত কাগজের স্তূপ,
দাও তুমি তারে নানা মনোহর রূপ।
পারম্পর্য, ভাবসংহতি সঙ্গতি দিল তার
তোমার গ্রন্থি, তুমিই বন্ধু আসল গ্রন্থকার।
তবু তুমি হায় চন্দনবাহী জীব,
তুমি র'য়ে গেলে জ্ঞান-বিদ্যায় যে গরিব সে গরিব।
শিল্পকলায় কত না গ্রন্থে করিলে সুরূপ দান,
কত না বিদ্যা-রসভাণ্ডার তাহাতে বিদ্যমান।

সেই ভাণ্ডারে তোমারো ত ছিল দাবি,
তুমি কোন দিন খুঁজিলে না তার চাবি ॥

শুনে রাখ তবে একটা গল্প করি
বিলাতের এক কামারের ছেলে হয়েছিল দপ্তরী।
দরিদ্র পিতা স্কুলে পাঠাইতে তারে
পারেনি, তাহার সঙ্গতি কিছু ছিলনাক একেবারে।
স্কুলে না গেলেও পড়িতে জানিত, পড়া ছিল তার নেশা,
বই বাঁধা ছিল পেশা।
লোকে যত বই তাহারে বাঁধিতে দিত
রাত্রি জাগিয়া সব বইগুলি নিভৃতে পড়িয়া নিত।
এমনি করিয়া হইল সে বিদ্বান,
(বিদ্বান বলা তারে করা অপমান।)
বহু তথ্যের আবিষ্কারক হইল জগদ্‌গুরু।
দপ্তরী হয়ে জীবন করিয়া সুরু ॥

তাঁর গৌরবে গর্বিত সারা দেশ।
ফর্মা আনতে দেখেছ ত তুমি, বিজলীতে চলে প্রেস,
ঐ বিজলীরে সেই বানায়েছে দাসী,
সকলেরি সেবা করিছে এখন যে ছিল সর্বনাশী।
যার কথা বলিলাম
কে সে? মাইকেল ফ্যারাডে তাঁহার নাম।

শরতের ব্যথা

শরৎ প্রভাতে রাজে মাঠ ভরি উজ্জ্বল স্বপন,
শ্যামল তরঙ্গে নাচে শরতের তরুণ তপন।
শস্যগর্ভ সুচিক্কণ গাঢ়শ্যাম ধান্য-তৃণদল
নিবিড় পীবরগুচ্ছে পুলকিত পবনচঞ্চল,
মাঝ দিয়া আলিপথে মুখ-বাঁধা লয়ে গাভীপাল
চলিয়াছে দূর মাঠে গান গাহি আনন্দে রাখাল।

করে লুব্ধ দুই পাশে স্নিগ্ধ স্বাদু শালিতৃণ যত,
মুখ বাঁধা, তবু গাভী ভক্ষিবারে হইয়া উদ্যত
পাচনি-আঘাত পায়, হায় নিজ রক্ষকেরই হাতে।
ধান্যে তৃণে ভেদটুকু গাভীরে যে নারিল বুঝাতে
চোখ না বাঁধিয়া কেন সে গাভীর বাঁধিল সে মুখ?
শরতের সব শোভা ম্লান করে বুভুক্ষুর বুক।
আকাশে বাতাসে মাঠে বাজে হর্ষে রাখালের বেণু
তার মাঝে কাঁদে তাই জীবমাতা 'শ্যাম কল্পধেনু'॥

জীর্ণ সৌধ

একশো বছর আগে সদাগরী গদির দেওয়ান
মুৎসুদ্দি অথবা বেনিয়ান—
যেই হোক একজন গড়েছিল মস্ত বাড়িখানা
তার আজ নাম নেই জানা।
সংখ্যায় অনেক হবে অংশীদার বংশধরগণ
একে একে অনেকেই অন্য ঠাঁয়ে করেছে গমন।
কেউ কেউ দীন দুঃস্থ দিয়ে আজ বহু ঘর ভাড়া,
নিভন্ত অঙ্গার হয়ে রাখে কুলধারা॥
প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ি এজমালী। দিয়ে চুন বালি,
কাজেই দেয় নি কেউ তাতে জোড়াতালি।
নাটমন্দিরের ভিত ক'রে দ্বিধাভেদ
বটতরু বর্ধমান, কেউ তারে করে নি উচ্ছেদ।
বলভিতে শতবর্ষ আগেকারই মত নিরন্তর
ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত (অর্থাৎ তাদের বংশধর)
তেমনি কূজন করে, ছাড়ে নি আশ্রয়,
আহার সন্ধানে শুধু দূরে যেতে হয়।
ছুঁড়ে দিয়ে মুঠো মুঠো মটর বা ছোলা
কেউ খালি করে নাকো ডালাডালি ঝোলা॥
আউচ, বকুল, কুচি, কোণে কাঠমল্লিকা-তরুটি
তেমনি ফুটায় ফুল। ছাতিমের গুঁড়ি বেয়ে উঠি
মালতীর লতা সেও তেমনি জুটায় অলিকুল,
অজগর চেয়ে তার অঙ্গ আজ স্থূল।
আপন আপন কালে ফুলের ফসল দিয়ে তারা
রেখেছে সে উনবিংশ শতকের ধারা॥

সেদিনের সাক্ষী এরা, অসত্য না কয়,
ফুলের ভাষায় এরা সুদিনের দেয় পরিচয়।
এত দশাবিপর্যয়ে মানুষের জীবনযাত্রার
কপোতকুলেরই মত এরা নির্বিকার।
কৌলিক গৌরব কিছু নেইকো সঞ্চিত,
কেবল ফুলের গন্ধে বংশধর হয় না বঞ্চিত।
ভাড়াটিয়া যারা
ফুলের গন্ধের জন্য দেয় না বাড়তি কিছু ভাড়া॥

বিশ্ব-শিল্পীর সন্তান

তুমি এ বিশ্ব সৃজন করেছ অতি অপরূপ সাজে।
সৃজন-কামনা জাগায়ে তুলেছে তাই যে আমার মাঝে।
পিতার বিদ্যা পুত্র কিছু তো পায়,
পিতৃধর্ম কিছু কিছু শুনি পুত্রেও বর্তায়।

তুচ্ছ হউক, ক্ষুদ্র হউক তবু
আমিও সৃষ্টি করিতেছি কিছু প্রভু।
লোকের সমাজে দেখাতে লজ্জা হয়।
তোমারে দেখাতে লজ্জা তো নেই তুমি পিতা স্নেহময়।
তোমারি চরণে করিলাম নিবেদন,
জানি তুমি হেলা করিবে না এ যে তোমারি অনুকরণ।

পুত্র না হ'লে বলতাম—এ তো চুরি,
তারিফ করবে দেখে মোর এই চুরিতেও বাহাদুরি।
পিতার বিত্তে পুত্রের অধিকার
কে করে বিশ্বে এ কথা অস্বীকার ?

বিশ্বকর্মা

ঋগ্‌বেদে তুমি বিশ্বকর্মা সৃষ্টি তোমার বিশ্বভূমি,
ব্রহ্মার শুধু পরিকল্পনা আসল বিশ্বশিল্পী তুমি।
তোমারি বংশধারা ব্যাপি আছে ত্রিদিব হইতে এ-মহীতল।
সন্তান তব সুরাসুর, নর—বৃত্র হইতে বানর নল।
রসের যমুনা তপের তপতী তব দানে চির খরস্রোতা,
পুরাণ পূর্ণ তব মহিমায়, বিশ্বযাগের তুমিই হোতা॥

বিশ্ব তো ছিল ধ্যান-চিন্ময়, মৃন্ময় হ'ল প্রসাদে তব।
মৃৎ হতে হ'ল জীবের জীবন, শিল্পোপাদান নিত্য নব।
শুধুই সৃজন করনি, পালন করিতে বহালে শিল্পধারা।
যারা তোমা পূজে, এই বিশ্বেরে নূতন করিয়া গড়িছে তারা॥

গৌরব-গান গাহিল যাহার বাল্মীকি,—সেই রক্ষঃপুরী,
যার বর্ণনা করি কালিদাস মহাকবি,—সেই যক্ষপুরী,
যে ধনু ভাঙিয়া শ্রীরামচন্দ্র হইলেন বীর বিশ্বজিৎ,
পরশুরামের যে ধনু কাড়িয়া সাধিলেন তিনি ভুবনহিত,
যেই পুষ্পকরথে রাবণের সম্ভব হ'ল ত্রিলোক জয়,
সে সব তোমার যেই তেজে গড়া তারে বিজ্ঞান এখন কয়॥

দেবারি বৃত্র তোমার পুত্র, স্বর্গ জিনিল তপের বলে।
সে তপের ক্ষয় হল দিনদিন অবিরত নানা পাপের ফলে,
কঠোরতর যে অক্ষয় তপ পুঞ্জিত ছিল ঋষির হাড়ে,
বিশ্বের হিতে পুত্রঘাতক বজ্রের রূপ সঁপিলে তারে॥

'সংজ্ঞা' তোমার স্নেহের ছুলালী তপন-পতির প্রখর জ্যোতি
সহিতে না পারি আসিল ছুটিয়া, বলিল—'হে তাত, কি হবে গতি?
ভবনে আনিলে জ্বলন্ত ভানু-জামাতারে করি নিমন্ত্রণ।
শাণযন্ত্রের উপরে চড়ালে করিতে তাহার তেজ শাতন।
গড়িলে শাতিত তপনের তেজে—বিষ্ণুচক্র, শিবের শূল,
যমের দণ্ড, ভীম প্রচণ্ড দেবারি-দলন আয়ুধকুল।
শাতিতময়ূখ মার্তণ্ডেরে দিলে অভিরাম মূরতিখানি—
'রক্তাম্বুজধর বরভুজ বন্ধুকরুচি চক্রপাণি,
হার কুণ্ডল-কেয়ূরাঙ্গদ—মণিমণ্ডিত কিরীটধারী—
শোভিত অক্ষমালায় বক্ষ, ত্রি-নয়ন, রথে গগনচারী'—
এই মূরতিতে তপন হলেন সংজ্ঞাদেবীর নয়নরম.
তাইত তপন মোদেরে না দহি আলো তাপ দেন ঘুচান তমঃ॥

শক্তির কভু নাইক বিনাশ শুধু লভে তাহা রূপান্তর,
তাতেই বিশ্ব এত বিচিত্র তাতেই বিধৃত এ চরাচর।
আজি বিজ্ঞানী শিল্পী যন্ত্রী যা কিছু গড়িছে ভুবন ভরি
তোমারি তো পুরা পরিকল্পনা করিতেছে তারা কার্যকরী।
শক্তির অপচার যে ধ্বংস জানিতে হে আদি-বৈজ্ঞানিক,
সৃষ্টির মূলে ধ্বংসের বীজ নিহিত, কয় তা তোমার ঋক্।
ধ্বংসের তুমি প্রেরণা যোগাও, তাহাতো নূতন করিয়া গড়া,
ধ্বংসাবশেষ উপাদানে চলে নবীন সৃষ্টি-পরম্পরা।
সৃষ্টি যা করে মাতামহগণ ধ্বংস তা করে বংশধর।
তাই বুঝি তব ছুহিতার সুত যমরাজ আর শনৈশ্চর॥

অর্ধকাশী

কাশীর অর্ধকাশী—
নগরের ধন লুটে দুই হাতে গণিকা সর্বনাশী।
শুধু কি ধনীরা? বিদুষী বলিয়া কাশীর শাস্ত্রিগণ
তার গৃহে করে জ্ঞানের প্রচার, শাস্ত্রের আলাপন।
তাঁদের বিচার শুনিতে শুনিতে বিরাগের সঞ্চার
হ'ল তার মনে, ভিক্ষুণী হ'তে বাসনা হইল তার।
বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীপুরে রয়েছেন জেতবনে
সেথায় যাইতে প্রখর কামনা জাগিল মনে।
বসন ভূষণ বিলাস-বস্তু মণিমাণিক্য ধন
ভিক্ষুকগণে করিল সে বিতরণ।
সংবাদ পেয়ে ধনী ভক্তেরা ছুটিয়া আসিল সবে,
মতি ফিরাইতে প্রয়াস পাইল কাকুতি মিনতি স্তবে।
পায়ে ধরি তার কহিল নগরবাসী
'অর্ধেক কাশী চলে যাবে তুমি গেলে যে অর্ধকাশী।'
সব উপরোধ ব্যর্থ যখন তখন ভক্তগণ
শ্রাবস্তীগামী প্রত্যেক পথে বসাল প্রহরিগণ।
যেই পথে যায় সেই পথে বাধা কি করে অবলা নারী?
পাগলিনী হয়ে ফিরিয়া এলো সে বাড়ী।
স্বগৃহে ফিরিয়া খুলিল না আর দ্বার
ডাকিতে লাগিল প্রাণপণে 'প্রভু কর, মোরে উদ্ধার।'

একমাস গত একদা সহসা রাতে
অর্ধকাশীর নিদ্রা ভাঙ্গিল ঘন ঘন করাঘাতে।

থেরী গাথা হইতে

উৎসব যেন লেগেছে নগরময়
রাজপথ 'পরে লক্ষ কণ্ঠ গাহে বুদ্ধের জয়।
বার বার আঁখি মুছি'
ভাবে সে স্বপ্ন? নিদ্রা কি তার এখনো যায় নি ঘুচি?
দুরু দুরু বুকে বাতায়ন পথে দেখিল সে তার দ্বারে
বুদ্ধ স্বয়ং রুদ্ধ দুয়ারে না পারেন পশিবারে।
পাগলিনী নারী ছুটিয়া আসিল শ্লথবাস কেশ বেশে
মূর্চ্ছিত হয়ে লুটাল প্রভুর শ্রীচরণতলে এসে॥

দিবা অবসানে হেরিল নগরবাসী
মুণ্ডিত শিরে দণ্ড হস্তে চলেছে অর্ধকাশী,
কাষায় বসনে ছন্ন সে তনু বুদ্ধের পিছে পিছে।
ভক্তগণের সব অনুনয় সকল প্রয়াস মিছে।
রূপসম্পদ বিনিময়ে আজ উপসম্পদা লভি'
রূপসী বিদুষী চলে গেল হায় বিলাইয়া দিয়া সবি।
যাদের মুখের ধর্মবিচার শুনি এই পরিণতি,
তাহারা ভাবিল—ধীমতী হয়েও তার একি দুর্মতি!
নগর আঁধার করি'
নিজের হৃদয় চির আলোকিত করিল সে সুন্দরী।
ক্ষুরবিচ্যুত কুঞ্চিত কেশরাশি
জড়ায়ে বক্ষে চাপিয়া বঁধুরা নয়নের জলে ভাসি'
কহিল—'হে দেবি, তব বিচ্ছেদ-শোক
হয়ে অঞ্জন-শলাকা মোদের ফুটাইয়া দিক্ চোখ।'

কালিদাসের শরৎ

হের প্রিয়ে, রূপ-রম্য শরৎ আসিল পুন,
নববধূবেশে হাসিল পুন।
কাশফুলে তার শুভ্রাংশুক
বিকচ কমলে রাজে তার মুখ,
প্রমত্ত কলহংসের রবে মঞ্জীর তার বাজিছে শুন।
রম্য শরৎ আসিল পুন।

তনুশ্রী তার আ-পরিপক্ক শালিক্ষেত্রের শ্যাম শোভায়,
বধূবেশে আজি শরৎ আসিল বধূজনোচিত শালীনতায়
উৎসব জাগে পুন ধরায়।
কাশফুলে আজি ধরণী ধবলা, রজনী ধবলা চন্দ্রিকায়,
তটিনীর নীর হংসমালায়, সরসী কুমুদে ধবলা ভায়।
ফুলভারনত সপ্তচ্ছদে ধবল আজিকে যত কানন,
মালতীর ফুলে পুরোপবন।

সাজিয়াছে আজ ধরিত্রী ধারা-স্নানের শেষে
পূজারিণী সাজে ধবল বেশে।
তটিনীরা আজ কানন ছায়
যেন মদালসা নটিনীর মত, নৃত্য ঠমকে বহিয়া যায়।
চঞ্চল চারু শফরীমালায় মেখলা তার,
মদকল সিত মরালমালায় বিলোল হার।
বর্ষার শেষে নীর অধোগত,
তটযুগ তার আজি উদ্ধত,
ওই তটই তার নিতম্বতট শোভে দুধারে।
মদালসা নদী মন্থরগতি সলিলভারে।

নির্জল মেঘ শত শত ভাগে শোভিছে কিবা
মৃণাল শঙ্খ রজতের মত ধবল বিভা।
লঘুতায় তারা বায়ুবিচলিত ইতস্ততঃ।
মহাকাশ মহারাজেরই মত
মনে হয় যেন রাজাসনে করি অধিষ্ঠান
শত সহস্র শুভ্র চামরে বীজ্যমান।

দলিতাঞ্জনরুচির কান্তি নভস্থল
বাঁধুলী পুষ্পে অরুণবরণ এই ভূতল,
পক্ক ধান্যে পীতাভ ক্ষেত্র, কুমুদে শুভ্র হ্রদতড়াগ,
কোন তরুণের মানস না করে আজি সরাগ?
ইন্দ্রধনুরে কে করিল আজ শতেক ভাগ?

মন্দ পবনে স্পন্দিত যার অগ্রশাখা
নব উদ্‌গত পত্রে ঢাকা
যার ফুলে ফুলে মধুপান করে অলিনিকরে
সেই কোবিদার কোন্ বিরহীর তরুণ হৃদয় নাহি বিদরে?

ইন্দ্রধনুটি নীলাকাশে ছিল সমুড্ডীন,
আজিকে নিবিড় নীলিমা-লীন।
শুভ্র বলাকা চঞ্চল পাখা সঞ্চালনে
ব্যজন করে না দিগঙ্গনারে দিগঙ্গনে।
আকাশের পানে তুলিয়া গ্রীবা
ছড়ায় না আজ ময়ূর-ময়ূরী কলাপবিভা।
বরিষার সাথে ফুরায়ে গিয়াছে শিখীর দিন,
ত্যজি অনঙ্গ শিখীর কলাপ মরালকণ্ঠে আজি আসীন।
কেতকী কুটজ সর্জার্জুন কদম্বতরু পুষ্পহীন।

কুসুম-সুষমা ত্যজি অনঙ্গ তাদের শাখা
সন্তর্পণে করে আশ্রয়, সেখানে উড়িছে শ্বেত পতাকা।
আজি শেফালিকা-গন্ধমোদিত বনোপবন,
মুখরিত তারে করে প্রফুল্ল বিহগগণ।
প্রান্তে শষ্প আসনে আসীন হরিণীকুল,
আয়ত নয়ন মেলিয়া হেরিছে শোভা অতুল।
সুরভিমুখর বনশ্রী আর মৃগনয়ন
আজি হরেনাক কাহার মন?

নিষ্ক্রিয় নয় আজি পবন
কমল কুমুদ কহ্লারগণে আহ্লাদে করি আলিঙ্গন
পরশে তাদের লভি শীতলতা
কম্পিত করে আজি তরুলতা।
সঞ্চিত তায় নীহারকণায় ঝরায়ে ধীরে,
লীলাভরে ফিরে তীরে ও নীরে।

গ্রাম-সীমান্তে হের এ শরতে নবীনরূপে,
উটজাঙ্গন গিয়াছে ভরিয়া সদ্য-আহৃত শালিস্তূপে
আমোদিত আজি গন্ধধূপে।
নবতৃণ মুখে ধেনুকুল সুখে গোষ্ঠগেহে,
তুলি তরঙ্গ বিহরে আজিকে সুস্থ সবল ধবল দেহে,
হংস-সারস-রবে মুখরিত গ্রামের সীমা।
হের হের প্রিয়ে হেথা শরতের নব মহিমা।

সুন্দরীদের তনু-সুষমারে শরৎ করেছে অতিক্রম,
নদী-তড়াগের লীলা-হিল্লোল জিনিছে তাদের ভ্রূবিভ্রম

নব বিকশিত কমল নিকরে
জিনেছে তাদের মুখ শশধরে।
নীলোৎপলের নব বিকাশে,
জিনেছে তাদের মদির বিলোল দৃক্-বিলাসে।

নব কিশলয়ে কুসুমে ভূষিতা শ্যামা লতিকা
সুন্দরীদের হেমমণ্ডিত বাহুর চেয়েও মনোহারিকা।
শুভ্রদশন প্রভায় উজল
আস্যে তাদের হাস্য তরল,
চন্দ্রিকা সম তাহার জ্যোতি;
করেছে তাদের দর্প হরণ আজি শরতের নব মালতী।

দেখ দেখ প্রিয়ে, ললনাগণ
জলদকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ করে শোভন
মুকুতায় নয়, মালতী কুসুমে, মুকুতা জিনিয়া যাহার বিভা।
যে শ্রবণে শোভে হেমকুণ্ডল
তাহে পরিয়াছে নীল উৎপল।
শেফালিমাল্যে শোভিছে গ্রীবা
তাহাতে সুষমা বেড়েছে কিবা।

নির্মেঘ নীল আজিকে ব্যোম,
তাহাতে পূর্ণ-ভাস্বর গ্রহ-তারকা-সোম।
ফুল্ল কুমুদ নাচে তরঙ্গে শোভে জলাশয় মানসহারী?
যেন তরলিত মরকতরাশি তাহার বারি।
কুমুদ-সঙ্গ-সুরভি শীতল বহে সমীরণ এই শরতে।
নাহিক পঙ্ক ধরার পথে।

আকাশেও নাই মেঘের পঙ্ক
সলিল আজিকে নিষ্কলঙ্ক,
তারা-বিচিত্র ব্যোমের চিত্র জুড়ায় আঁখি,
শোভে চরাচর নদী, ধরাধর, বন-প্রান্তর জ্যোছনা মাখি
বরাঙ্গনার আননের মত যাহার বিভা,
সেই পঙ্কজ প্রভাতে কিবা
তরুণারুণের কর পরশে
সদ্য জাগিয়া জৃম্ভণ করে আজি হরষে।

প্রাণের দয়িত হ'লে প্রবাসী,
মিলায় যেমন বধূর অধরে মধুর হাসি।
চন্দ্রমা হ'লে অস্তমিত
আজিকে প্রভাতে কুমুদী তেমনি ম্লান মুদিত।

প্রবাসিজনের বেদনার আজ নাহিক সীমা,
বাঁধুলী কুসুমে হেরিয়া বধূর চারু অধরের ঘন শোণিমা,
উৎপলে হেরি তার নয়নের শ্রীগৌরবে,
ক্বণিত কনক-কাঞ্চীর ধ্বনি শুনি প্রমত্ত হংসরবে,
বিগত তাহার চিত্তবল,
প্রিয়ারে স্মরিয়া ঝরিছে কেবল নেত্রজল।

চন্দ্রের দ্যুতি রাখি সুন্দরী ললনাগণের গণ্ড 'পরে
বন্ধুজীবের কান্তি রাখিয়া বিম্বাধরে,
হংসকাকলী রাখি তাহাদের নূপুররবে,
দেখ দেখ সখি শরৎলক্ষ্মী বিদায় লভে॥

গজপুরী গিরিসঙ্কটে

আফজলসুত ফজলের আজ জ্বলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর বীরদর্প লোপ।
না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা,
গিরিশির হতে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসার জ্বলেছে কোপ।

পবন-দুর্গে মারাঠা সিংহ পড়িল ফাঁদে,
রক্ষা যে নাই মারাঠার রাজলক্ষ্মী কাঁদে।
সুড়ঙের পথে পলায় শিবাজী,
চক্রীর কেবা বুঝে কারসাজি?
মাওয়ালীর গিরি-প্রপাত-ধারায় কে আর বাঁধে?
মারাঠাসিংহে বিজাপুরী সেনা ধরিবে ফাঁদে?

সুড়ঙের মুখে সলাবৎখাঁর সেনা-শিবির,
রুধিবারে পথ এল জোহর হাবসী-বীর।
কি কথা হৈল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ, থাকিল গোপনে।
হ'ল তার সেনা মাওয়ালী-স্রোতের দুইটি তীর;
ছুটিল শিবাজী ভেদি' বিজাপুরী সেনা-শিবির।

ছুটিল শিবাজী নিশার আঁধারে শৈল-বনে,
শুধু একশত বাছা-বাছা বীর তাহার সনে।

ফজল যখন পেল এ খবর
তখন বিগত রাত্রি দুপর,
দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছে ছুটিল রণে।
ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈল-বনে।

বন পর্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর,
গজপুর-গিরিসঙ্কটে হল রাত্রি ভোর।
ক্লান্ত অবশ সবার শরীর
অশ্বের মুখে ফেনিল রুধির।
হাঁকিল শিবাজী, "ফেলে দাও জিন লাগামডোর,
বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব ছুটাও জোর।"

এখনও বিশাল-দুর্গের পথ দশটি ক্রোশ,
পিছনে ছুটিছে মশালে জ্বলিছে ফজলী রোষ।
শুনা যায় দূরে সেনাকোলাহল,
দিবালোকে হ'বে সকলি বিফল,
বিশালগড়ের এত কাছে আসি, কি আফশোস!
এখনো হায় রে পথ সম্মুখে দশটি ক্রোশ।

হেথা গজপুরী-সর্দার এসে কহিল—"প্রভু,
প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু।
ভয় কি, এ দেহে থাকিতে পরাণ
ফজলের সেনা হবে আগুয়ান?
প্রভুর কুশল সাধিতে মাওয়ালি পিছ-পা কভু?"
হাতজোড় করি কহিল তখন বাজী-প্রভু।

বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজী,—"তোমার ঋণ,
অপরিশোধ্য। শোধ হ'তে পারে শুধু সেদিন
যেদিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ
অরাতি-দর্প করিয়া চূর্ণ
এ দেশ আবার স্বীয় গৌরবে হবে স্বাধীন,
চলিনু বন্ধু বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ।"

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি,
ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী প্রজা আসিল ছুটি।
বাজীপ্রভুর লস্কর যত
সে আর কতই? হবে পাঁচশত!
গিরিসঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি।
শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাঁধিল ঝুঁটি!

হাঁকে সর্দার, "চল, বীরগণ সমরে সাজি,
ভবানী-দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি।
বৈরী-দর্প করিয়া চূর্ণ
মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,
তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী।
গর্জিয়া চল গিরিসঙ্কটে কে আছ রাজি।"

হাঁকে সর্দার, "বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ,
শিবাজীরে চাও? আগে আমাদের জীবন লহ
তোমাদের পথ করিতে পিছল
রুধির ঢালিবে গজপুরী দল।"
গিরিসঙ্কটে বাধিল সমর—শঙ্কাবহ।
হাঁকে সর্দার—'বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ।'

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা কেল্লা ফতে,
বিজাপুরী সেনা বৃথাই বিশাল এ গিরিপথে।
দুই-দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী-বর্শার ঘায়,
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহতে হতে,
দশ সহস্র রুধিল কেবল পঞ্চশতে।

পঞ্চশতের দুই শত আছে মরেছে বাকী।
সর্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি,
নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ,
"এখনও ফজলে ছাড়িও না পথ।
এখনও শুনিনি তোপের আওয়াজ"—কহিল হাঁকি
বিশালগড়ের দিকে কান খাড়া করিয়া রাখি।

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
শুনি সর্দার মুক্ত করিল বুকের ক্ষত।
হাঁকিল, "আর কি, পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার।"
দলি তার দেহ ছুটে এল বিজাপুরীরা যত।
শিবাজী তখন বিশাল-দুর্গে বিরামরত॥

লালাবাবুর দীক্ষা

সিত মর্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি
আর্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা সার করি ঝোলা মালা,
ভক্তগণের নামে লিখি দানপত্র,
লালবাবু বৈরাগী,— গুরু-করণের লাগি,
সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস
একদা এলেন সেই নিভৃত নিকুঞ্জে।
সাধুমুখে নামগান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ,
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদ্‌গোপী-যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু কন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে,
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবোনাক উদাসীন।"
এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন॥

লালাবাবু যান ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট-দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায়রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূন্য?
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া
বাহিরে তাহার রূপ মঠ, বেদী, স্তম্ভ।

যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এযে দারুণ কুপথ্য।"

এই ভাবি সব ছাড়ি মন্দির মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যামরাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়
লাখপতি ভিখ মাগে অপরূপ দৃশ্য !
সারা ব্রজমণ্ডলে রস-আলোড়ন চলে,
সাথে সাথে ভীড় করে যত দীন নিঃস্ব।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালি ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে, গৃহিগণ ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচু,
মুষ্টি-ভিক্ষা তরে পাতে এক হস্ত।
মাস-ছয় গেল চলে গুরুর চরণতলে
জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন "দেরী নেই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"

লালাবাবু ফিরে যান, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া,
কোন গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গো-মূত্র !

সারা পথ আঁখিজলে তিতাইয়া লালা চলে
নয়নে নাহিক নিদ,—রুচেনাক অন্ন,
শেঠেদের কুঠিটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি, 'কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী ? রেশারেশি আড়াআড়ি,
চলিয়াছে কতবারই ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
সদা প্রতিযোগিতাতে ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে
মোর যশ-পিপাসারে করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে যার অভিমান রাজে,
সে চরম সাধনার কোথা পাবে দীক্ষা ?
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিতে-তো ভিক্ষা।'

এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, 'শ্রীরাধে গোবিন্দ'।
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলি-পঙ্কে,
শেঠ্‌জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপিয়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।
ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,

উদ্দাম কীর্তনে তাণ্ডব নর্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিত মৃদঙ্গে।

শেঠ কয় জুড়ি পাণি "আজ পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয়-সংবাদে,
সোনা দিয়া পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"

শেঠ হাঁকে, বার বার "সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা, —ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে,
সবে হরি হরি বলি করতাল-কুতূহলী।
শেঠকুল-মহিলারা ফুললাজ বর্ষে।
ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন গুরু এসে
কহিলেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা।
নেচে হরি-হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

মৌলিকতা

নতুন অজানা বলিবার কিছু নাই।
লেখনী আমার কানে গুঁজিয়াছি তাই।
ভেবে রাখি রাতে যে কথা বলিব, শাখায় শাখায় ডাক'
শুনি প্রতি প্রাতে সে কথা বলিছে পাখী।
আমার নিজের মর্মের কথা, ভাবি, কেহ ত না জানে।
ও মা, দেখি তাই তরুপল্লব কয় মরমর তানে,
তটিনীরা কলগানে,
ভাষা নেই যার সেও বলে, শুনি মাইক-লাগানো কানে॥

নীরবে বলিছে শ্যামল ক্ষেত্র, মেঘচূড় পর্বত,
গগনে চন্দ্রতারাবলী, ছায়াপথ।
নীরবে কহিছে আঁখিজলধারা ভাসায়ে ব্যথিত বুক,
দীন ভিখারীর ছলছল আঁখি, ক্ষুধিতের ম্লানমুখ।
শিশুর অধরে মধুর হাস্য, জননীর চুম্বন,
নীরবে সে কথা বলিছে বধূর লাজে নত দু'নয়ন।
নীরবের ভাষা শুনিতে বুঝিতে শিখিনি কো এত কাল,
তাই বুনিয়াছি কত না বাক্যজাল।
যা-যা এত দিন জনকোলাহলে শ্রবণে পশেনি হায়,
আজি নির্জনে বসি' আনমনে সকলি তা শোনা যায়॥

কিছুই বলার নাই।
ওরাই বলিছে সব কথা, আমি যা কিছু বলিতে চাই।
করি বলি বলি আকুলি বিকুলি করিছে যে কথা প্রাণে
শুনে চমকাই, ওরা তা সবাই জানে॥

কালিদাসের হেমন্ত

অচিরোদ্‌গত নব পল্লবে রবিশস্যের ক্ষেত্র ভরে,
লোধ্রকুসুমে পরাগ ঝরে,
মিলেছে হরিতে পীতে ও শ্বেতে
পাকিয়াছে শালিধান্য ক্ষেতে।
পদ্ম কুমুদে বিদায় দিয়া
হিম বরষিয়া কাল-হেমন্ত আসিল, প্রিয়া।
কুঙ্কুমরাগরক্ত অথবা ইন্দু-তুষার-শুভ্র হারে,
নব নব হেম অলঙ্কারে,
ভূষিত করে না স্তনমণ্ডল যত বিলাসিনী বরাঙ্গনা।
হেমন্তে তারা নিরাভরণা।

আজি তারা নয় সালঙ্কারা
বাহুযুগে আজ বলয়াঙ্গদ ধরে না তারা।
সূক্ষ্ম দুকূল পরে না তারা,
করে না কো আজ পীন পয়োধরে আধ প্রকাশ,
নাহি নিতম্বে স্বচ্ছ বাস।
কনকসূত্রে গ্রথিত রত্নচন্দ্রহার
সেথায় লাস্য করে না আর।
হংসকাকলী অনুকারি হেম-নূপুর রাজি
চরণাম্বুজে বাজে না আজি,
ফুলহারে নারী সাজে না আজি।

প্রণয়োৎসবে সুন্দরীগণ আজিকে প্রিয়ে
কালীয়-দারুর চূর্ণ দিয়ে

করে অম্বুলেপে চর্চিত চারু-তনু অমল,
পত্রলেখায় চিত্রিত করে মুখকমল,
কবরীতে দেয় ধূপের তাপ,
কালাগুরু-ধূমে সুবাসিত করে কেশকলাপ।

আজি হেমন্ত নিত্য নূতন হর্ষভরে
চিত্ত তাদের স্পর্শ করে,
তবুও তাহারা পীড়িত অধরে হাসিতে পারে না উচ্চ হাসি,
কণ্ঠে মিলায় হর্ষরাশি।
অধর তাদের পীড়িত কিসে ?
প্রিয়ের দশনে অমৃতের সনে মিলিত বিষে।

এ হিম ঋতুরে বরণ করিয়া উরঃস্থলে
তরুণীরা তারে আশ্রয় দিল আদরে উষ্ণ বসনতলে,
সেথায় পীবর উরোজযুগের পীড়ন স'য়ে
খিন্ন আতুর স্বিন্ন হ'য়ে
কাঁদিয়া উঠে সে ; প্রভাতে শিশির-কণার ছলে
অশ্রু তাহার করে ঝলমল তৃণের দলে।

হের হেমন্তে ভারে ভারে হেমধান্যরাশি
গুচ্ছিত হ'য়ে আজি গ্রামান্তে জমিছে আসি'।
মৃগ-মিথুনেরা ঘুরে আশে পাশে অশন-লোভে।
গ্রাম-সীমান্তে কুসুমপুঞ্জে কুঞ্জ শোভে,
শাখে শাখে তার ক্রৌঞ্চমিথুন নৃত্য করে,
এই মনোরম চিত্র কার না চিত্ত হরে ?

শোভে সরোবর তোমার নয়ন-তুল্য ফুল্ল নীলোৎপলে
মালিন্যহীন স্থির প্রসন্ন শীতল জলে।
চঞ্চল করে কাদম্বযূথ সলিলচারী
দর্শকজন-চিত্তের সাথে তাহার বারি
হর্ষোন্মাদ কলস্বনে
করে আলোড়িত সন্তরণে ও সন্তাড়নে।

হের প্রিয়ে অই প্রিয়ঙ্গুলতা হিম-সমীরে
কম্পিত হ'য়ে লাঞ্ছিত হ'য়ে শীত-শিশিরে,
পাকিতে পাকিতে ধরেছে কিবা
প্রিয়-বিরহিণী বিলাসিনীদের পাণ্ডুবরণ গণ্ড-বিভা।

আমোদিত মুখ পুষ্পমধুর আসববাসে,
প্রিয়জনতনু বাসিত করিয়া মদির শ্বাসে
প্রণয়িযুগল বাঁধিয়া দোঁহারে বাহুর পাশে
আজি হেমন্ত-নিশীথে শ্রান্ত সুখশয্যায় শয়ন করে,
নাসার পবনে শৈত্য হরে,
রাগরসে অনুবিদ্ধ তনু
ফুলশরে গাঁথে পুষ্পধনু।
হের প্রিয়ে প্রিয়-গৌরববতী নবযৌবনা অঙ্গনার
প্রিয়সম্ভোগ অধরে রেখেছে চিহ্ন তার।

আজি হেমন্তে বসন্ত-শোভা বক্ষে ভায়,
নখরাঙ্কিত আধফুটন্ত নব কিংশুক-কলি-মালায়
প্রভাতে রবির নব আতপ্ত আতপে বসি'
দর্পহরণ দর্পণ করে কোন রূপসী

হেরিছে দয়িত-অলি-লাঞ্ছিত বিক্ষত মুখকমল তার
হেরিছে অধর নিপীত-সার ;
কান্তি হরণ করে যে কান্ত, তুষিতে তায়
নব প্রসাধনে বদনচন্দ্র নূতন করিয়া ভূষিতে চায়।

রজনী জাগিয়া কোন রূপসীর যুগল নয়ন ইন্দীবর
কোকনদরূপে শ্রম-কাতর,
বিছায়ে আঁচল বালতপনের মন্দমধুর আতপ-তাপে
ঘুমায়ে পড়েছে, গণ্ডে তাহার দাগ পড়িয়াছে কাঁকন চাপে।
লুলিত আকুল তাহার কেশ
বেণীবন্ধন করি লঙ্ঘন করে চুম্বন অংসদেশ।

অঙ্গ-লতিকা এলায় ঘুমে
রবির কিরণ তার নিমীলিত নয়ন চুমে।
চেয়ে দেখ প্রিয়ে অন্য দিকে
পীন কুচভারে অবনত-তনু তরুণীটিকে,
কালি সন্ধ্যায় শয়নাগারে
যে কুসুমদাম জড়ায়েছিল সে কবরীভারে
প্রিয়-সম্ভোগে সৌরভহীন হয়েছে গলিত লুলিত ম্লান,
গৌরবহারা এখন তাহা যে ধূলিশয়ান।
সে মালা তেয়াগি জলদকৃষ্ণ কেশপাশে তায় নূতন করি'
বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রচি কবরী,
প্রভাতের ফুলে নবরচিত
মাল্যে কবরী করে খচিত।

তার পাশে অই ললনার পানে ফিরাও আঁখি,—

ললাটচুম্বি লোল লম্বিত

অলক যাহার আঁখি কুঞ্চিত ফেলেছে ঢাকি'।

নির্জনে বসি' প্রিয়োপভুক্ত তনুর পানে

চাহিয়া আপনা ধন্যা মানে;

অবধি পায় না হর্ষ তার

শিহরিয়া উঠে বারংবার

করে রঞ্জিত চুম্বন-পীত পীড়িত অধরে নূতন করি'

তাম্বূল-রাগে, কাঁচলি পরিয়া যতন করি।

আর দিকে দেখ কোন কামিনী

বিহারোৎসবে জাগি যামিনী

শিথিল হয়েছে অঙ্গ তার,

কোনরূপে বহে অলস উরোজ-কলসভার।

পুলকাঞ্চিত তনুর 'পরে

সুরভি তৈল মর্দন করে স্নানের তরে।

ক্ষেত্র শোভিত সুপক্ক হেমধান্য-ভারে

নেত্র মোহিত, সেথা হ'তে আর ফিরিতে নারে।

ক্ষেত হ'তে গ্রামে চলেছে কমলাদেবীর রথ,

নবীন শালির গন্ধে মোদিত সকল পথ।

ক্রৌঞ্চবলাকাপংক্তির হার

দূর দিগন্তে লম্বিত যার

সেই হেমন্ত তোমারে কান্তে করুক দান

সব শুভ সুখ, অশিব হইতে করুক ত্রাণ॥

মাতৃ-হৃদয়

তোমা মানিয়াছি মুখে কোন দিন করিনি স্মরণ,
কোন দিন ভাবি নাই স্মরণের আছে প্রয়োজন।
হাজার অকাজ কাজ করিবার পেয়েছি সময়,
তোমার কথাই শুধু ভাবিবার, দীন দয়াময়,
পাইনিক অবসর। কত বার কত না সঙ্কটে
পড়িয়াছি, কোন দিন তবু কভু তোমার নিকটে
করিনিক আবেদন। পীড়িত শিশুর আর্তনাদ
চৈতন্য জাগাল আজ। ক্ষমা কর সব অপরাধ
আজিকে চিনেছি তোমা। হেরি তব করুণার লাগি
রুগ্নশিশু শয্যাপার্শ্বে কাঁদি মাতা ডাকে রাত্রি জাগি।
আজি মনে হয় প্রভু,—যারা তব করে গুণ-গান
ধর্মভীরু ভক্ত জ্ঞানী বলি যারা করে অভিমান
তারা কি তোমারে চেনে? সেই আর্তি কোথা তারা পাবে?-
শিশুর জীবন মাগি আর্ত কণ্ঠে যে ব্যাকুল ভাবে
জননী তোমারে স্মরে। সত্য তোমা চেনে যদি কেহ
তবে সে জননী ছাড়া আর কেহ নয়। মার মুগ্ধ-স্নেহ
নিশিদিন করিতেছে অভিষিক্ত তোমার চরণ,
সন্তানে সোহাগ তার সে ত প্রভু তোমারে স্মরণ!
একই নিয়মবিধি প্রকৃতির এ বিশ্বভুবনে
সঞ্চারিছে স্তন্যধারা স্তনে তার, ভক্তিধারা মনে।
তোমারে ডাকিতে শুনি জননীরে রুগ্ন শিশু কোলে,
মনে হয়—সন্তান যাহার নাই সেই তোমা ভোলে॥

পিতৃ-হৃদয়

সারা রাত্রি জাগিয়াছি। গেছে রাত বেঘোরে খোকার,
একজ্বরী চৌদ্দ দিন। ভয়ে ভয়ে থার্মোমিটার
দিই নি বগলে তার। দিয়ে গেছি বরফ মাথায়,
ভোরে মনে হ'ল কম, কম্প্রহস্তে দেখিলাম হায়
তখনো একশ' ছুই। যেতে হয় ডাক্তারের বাড়ী,
রাতজাগা ছিল ভালো, এখন যে যেতে হয় ছাড়ি'।
গৃহিণীরে যেতে হয় অনিচ্ছায় সংসারের পানে,
দশ বছরের মেয়ে অমিয়ারে বসায়ে সেখানে।
আমাদের খাওয়া সে-ত পিণ্ড গেলা। মুখপানে চেয়ে
অন্য পরিজনদের, রাঁধিবারে যেতে হয় নেয়ে,
ছুটিয়া আসিতে হয় রান্নাঘর হ'তে বার বার
খোকার কাঁদন শুনে। চুকাইতে ঔষধ ডাক্তার
নয়টা বাজিয়া যায়। তাড়াতাড়ি কলে স্নান ক'রে
আলু সিদ্ধ ভাত গুঁজে নাকে মুখে দগ্ধোদর ভ'রে
যেতে হয় কর্ম্মস্থানে, অবশেষে ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
ছাতা হাতে নিতে হয়। নতুবা সবার উপবাস
চলিবে ছুদিন পরে। ছুটিয়াও হ'য়ে যায় দেরি
পঁহুছিতে কর্ম্মস্থানে। সেথা গিয়ে রক্তচক্ষু হেরি,
কাজে লাগে নাক মন, তবু কাজ করিতেই হয়
নিতান্ত অভ্যাস-বশে। মাঝে মাঝে চমকে হৃদয়
স্মরিয়া শিশুর কথা, ভুল হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
দিনের খেয়ার নায়ে প্রাণপণে চলি লগি ঠেলি,
বেলা যত শেষ হয় পোড়া কাজ যায় তত বেড়ে,
সাথীদের আনুকূল্যে তাড়াতাড়ি বাকী কাজ সেরে

ছুটে আসি বাড়ী পানে।   ভাবিতে ভাবিতে পথে যাই,
বাড়ী গিয়ে দেখি যদি ছেলেটার আর জ্বর নাই;
গৃহিণী দুয়ার খুলি হাসি-হাসিমুখে যদি   কয়
'আজ জ্বর ছেড়ে গেছে'।   তবে শান্ত হয় এ হৃদয়।
ভাবিতে ভাবিতে চলি, দূর হ'তে বাড়ীটি দেখিয়া
বুক করে দুরু দুরু।   কান পেতে শুনি থমকিয়া
সেথায় উঠিছে কিনা আর্তনাদ দেখি লক্ষ্য ক'রে
সম্মুখে জমেছে কি না লোকজন সারা পথ ভ'রে।
পাশের বাড়ীর দ্বারে মোটর দাঁড়ানো দেখি ছুটি
নিজের বাড়ীর দ্বারে মনে করি চমকিয়া উঠি,—
কাঁপিতে কাঁপিতে চলি যেন মহানবমীর ছাগ,
দিনেকের পঞ্জী বটে, বুকে কাটে সুগভীর দাগ।
এই দিনগুলি দীর্ঘ—অজগর সম উঠে ফুলি'
গ্রাস করে একে একে জীবনের বাকি দিনগুলি॥

শহীদ স্মরণে

বহু সাধনার বহু বেদনার ধন
স্বাধীনতা তব বোধন করি এ বঙ্গে।
এসেছ মূর্ত জীবন-মরণ পণ,
এখনো রক্ত ঝরিছে তোমার অঙ্গে।
বরিতে তোমারে স্মরি আজ তাহাদেরে
স্মরি সেই সব শহীদ স্বদেশ-ভক্তে,
যাহারা তোমার উদয়ের গগনেরে
অরুণ করিয়া গিয়াছে হৃদয়-রক্তে।

তাদের মুক্ত মহান্ আত্মা মিলে
শুকতারা হয়ে জাগিল গগন-প্রান্তে।
অরুণোদয়ের আগেই তা' তিলে তিলে
তরল করিল অমানিশীথের ধ্বান্তে ॥
ভোর না হতেই ভোরের পাখীরা জাগি'
ভোরের খবর জানাল কাকলী হর্ষে।
অশ্রু ঝরিছে আজি তাহাদেরি লাগি
মূক যারা ক্রূর কিরাতের শর বর্ষে।
কত বিগ্রহ, কত নিগ্রহ জ্বালা
শত লাঞ্ছনা করিল না তারা গণ্য,
কণ্ঠে পরিল যূপের জবার মালা
আজিকার জয়মাল্য তাদেরি জন্য ॥
সেই মাল্যটি দু'হাতে তুলিয়া ধরি
উর্ধ্বে চাহিয়া স্মরি সেই বীরবর্গে,
এই শুভদিনে অশ্রু পড়িছে ঝরি
জানি না তাহারা আছে কোন শূর-স্বর্গে।
অসিত ও কেশ তাদেরি চিতার ধূমে
অঙ্গে তোমার তাদেরি অস্থিচূর্ণ,
স্বাধীনতা তোমা বরি এ বঙ্গভূমে
তাদের কামনা আশা কর তুমি পূর্ণ।
জীবনের চেয়ে ব্রতে জেনেছিল বড়
ব্রতের মাঝারে আজো আছে তারা দীপ্ত,
সে ব্রত তাদের পূর্ণ সফল কর
তাতেই তাদের আত্মাও হবে তৃপ্ত ॥

বৈশাখী সন্ধ্যায়

তখন হয়েছে সন্ধ্যা, নামিলাম দোঁহে ইষ্টেসনে
মালপত্র সাথে নাই। সহসা খেয়াল হলো মনে
জনশূন্য বনপথে দুইজনে যাইব হাঁটিয়া।
তোমাকে নূতন করে সেই দিন পাইলাম প্রিয়া।
এই সেই বনপথ ছিল যাতে নিত্য যাতায়াত
বিদ্যালয়ে। কল্পলক্ষ্মী সনে যেথা প্রথম সাক্ষাৎ,
পিককণ্ঠে শুনিতাম যেই পথে তব আগমনী,
মর্মরিত শুষ্কপত্রে যেন তব দূর পদধ্বনি॥

প্রথম বৈশাখ মাস, ঝিরিঝিরি বহিছে পবন
অলক দুলায়ে তব, লাক্ষারক্ত নগ্ন সে চরণ
চুম্বি ধন্য হলো পথ। তব পাশে ঘেঁসে ঘেঁসে চলি
মনে পড়ে প্রেমোল্লাসে মুক্তপথে কত কথা বলি
ভুঞ্জিনু চলন-সুখ। মনে নেই ছিল কোন তিথি
নবোদিত হিমাংশুর করজাল সারা বনবীথি
করিল ধবলায়িত, ঝিকিমিকি রচিয়া কঙ্কণে
পিছলি পড়িতেছিল মুক্ত তব ললাটে আননে।
সঘনে বাজিতেছিল হাতে তব দশগাছি চুড়ি
ক্বণিত মঞ্জীর সম, দূর হ'তে সুরভি মাধুরী
বহিয়া আনিতেছিল সমীরণ বনকুঞ্জ হ'তে
অজানা ফুলের, আর ঝিল্লীরব একটানা স্রোতে
দুধারে ধ্বনিতেছিল। শুষ্কপত্র চরণ-পরশে
মর্মরি জানাল হর্ষ। মনে পড়ে অহেতু হরষে
পুষ্পিত সোঁদাল-শাখা ভেঙ্গে তুমি নিলে ডান হাতে,
সেই ফুল নিয়ে আমি অগুণ্ঠিত তোমার খোঁপাতে

দিলাম গুঁজিয়া প্রিয়ে সন্তর্পণে। মন্থর চরণে
পরিচিত বকুলের তলে যবে এলাম দুজনে,
পাখা ঝটপট করি কোন পাখী হ'য়ে কুতূহলী
তব শিরে দিল ঢালি একরাশ ফুলের অঞ্জলি॥

কৈশোর বান্ধব পথ লাজবর্ষে বরিল তোমায়।
পথ ত ফুরায়ে এলো সম্মুখে নগর ডাকে, হায়
খুঁটির লণ্ঠনে ম্লান আলোকের হাতসানি দিয়ে।
মনে হলো পথ কেন অফুরন্ত হ'লনাক প্রিয়ে,
মনে হলো ফিরে যাই এইরূপে সারা রাত ধরি
এই বন-পথ দিয়া দুইজনে আসা-যাওয়া করি।
একটি সন্ধ্যার স্মৃতি মনে আজ জাগে বার বার
যৌবনের শেষ পর্বে। তেমনটি জীবনে আমার
কখনো পাইনি গৃহে মধুমাসে শীতে বরষায়,
সেদিন যেমন করি পেয়েছিনু বৈশাখী সন্ধ্যায়॥

সে যুগ গিয়াছে চলি, স্বচ্ছন্দ বিহারে নেই বাধা।
ঘোমটা পর্দায় আর ক্ষুণ্ণ নয় নারীর মর্যাদা॥
জিজ্ঞাসিছ ছন্দ রচি, কেন আজ তুচ্ছ কথা নিয়ে?
মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তুমি যে দুর্লভ ছিলে প্রিয়ে,
সমাজের কুশাসনে। প্রেম, মুক্তি, প্রকৃতি, যৌবন
এ চারের সম্মিলন সেকালে যে সু-দুর্লভ ধন।
প্রকৃতির পরিবেষে দুটি দণ্ড একদা জীবনে,
হয়েছিল মঞ্জরিত পুষ্পগুলি, ঝ'রে গেছে মনে।
সেই ঝরা ফুল দিয়ে বসে বসে গাঁথি আজ হার,
যত তুচ্ছ হোক, এরে সঁপিলাম শ্রীকণ্ঠে তোমার॥

আকাশ-প্রদীপ

ক্ষেত ভরিয়াছে শস্যে আশায় ভরেছে বুকগুলি।
স্বচ্ছ শান্ত নীলাম্বর, শরদভ্র তুলে না আকুলি
তাহার ধ্যানের শান্তি। হেমন্ত-সন্ধ্যায় আজিকার
পল্লীর হৃদয়খানি নিবেদিনু উদ্দেশে তোমার
হে দেবতা, তার ক্ষীণ দীপ্তি-শিখা করুক স্পর্শন
ও চরণ। কর তুমি আশীর্বাদে মাঙ্গল্য বর্ষণ
এ পল্লীর নতশিরে। তোমার অনন্ত নভস্তলে
ক্ষণদার ক্ষণদীপ কোটি কোটি তারকার দলে
পাবে ঠাঁই? প্রান্তরের পথহারা ক্লান্ত পান্থগণে
হাতসানি দিয়ে যেন ডেকে আনে স্নিগ্ধ আমন্ত্রণে
রাত্রির আতিথ্য লাগি। এ পল্লীর প্রবাসী সন্তান
যখন আসিবে ফিরে ঘুচাইয়া তার ব্যবধান,
এই দীপখানি যেন দেয় তারে মধুর আশ্বাস,
এর কাছে পায় যেন গৃহমুখী প্রথম সম্ভাষ।
অশরীরী আত্মা যত নভস্তলে করে বিচরণ
গ্রামখানি চিনে যেন লভিয়া তোমার আমন্ত্রণ।
বহে যেন তব পায় এ পল্লীর সবার প্রণতি
এ প্রদীপ। হেমন্তের স্নিগ্ধ বায়ু মন্দ করি গতি
পরিচর্যা করে এর। ঊর্ধ্বে রহি প্রহরীর মত
অলক্ষ্মী তাড়ায় যেন, দূর করে অকল্যাণ যত।
ঊর্ধ্বে ধরিলাম তুলে, যেন এই পুণ্য দীপখানি
নাহি করে কোন মূঢ় পতঙ্গের জীবনের হানি॥

মীরকাসেমের বিদায়

এবে তস্‌বি কম্বল সম্বল,
বঙ্গের নবাব মুখে জুটেনাক আজি অন্নজল।
বিরূপা নিয়তি মোর সর্বনাশী, তবু তার সাথে
এখনো যুঝিতে হবে, অস্ত্র নাই, তবু খালি হাতে।
নিয়তি বিরূপা বলি ত্যজি ভয়ে সংগ্রাম তাহার
জ্বলন্ত পৌরুষ কবে করিয়াছে দাসত্ব স্বীকার ?
সুজার দয়ার দান, রে মাহুত, খঞ্জ এ কুঞ্জরে
ফিরাইয়া লয়ে যাও। বলো তারে হস্তিপৃষ্ঠ 'পরে
আর না মানায় মোরে, তার কোন নেইক অভাব,
ফকিরি নিয়েছে সারা বাঙ্‌লার স্বাধীন নবাব ॥

গেছে সব ! কাটোয়ার রণক্ষেত্রে প্রভুভক্ত বীর
তকি খাঁ, দক্ষিণ হস্ত, সঁপিয়াছে বুকের রুধির।
আসাদুল্লা নসিরের প্রাণপাত প্রচণ্ড সংগ্রাম,
ব্যর্থ হ'ল গিরিয়ায়, শোচনীয় তার পরিণাম।
যাহারা নিমক খেয়ে করেছিল বেহায়া হারামি
তাহাদের খুন দিয়া পরে ওজু করিয়াছি আমি।
উধুয়ানালায় হায় চিরতরে বঙ্গভাগ্য-রবি
মগ্ন হ'ল ; ভগ্ন হ'ল উরু মোর, চূর্ণ হ'ল সবি।
দংশি এ দক্ষিণ হস্ত ধিক্কারিয়া আপন দুর্মতি।
কেন আমি হই নাই নিজ রাজ্যে নিজে সেনাপতি
মুখোমুখি বোঝাপড়া হলনাক দুশমনের সাথে,
শত্রু-মিত্র জানিল না কত বল ধরি এই হাতে ॥

সাধের মুঙ্গের গেল, সৌভাগ্যের সমুচ্চ সোপান—
দ্বিতীয় দিল্লীর রূপে যারে আমি করিনু নির্মাণ,
কৃতঘ্ন আরাব আলি দিল তারে শত্রু করতলে।
ডুবাইনু ইংরাজের হিন্দু বন্ধুগণে গঙ্গাজলে।
জ্বলিল শোণিত-তৃষ্ণা। নির্বিচারে শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে
সে তৃষ্ণা লভিল তৃপ্তি শত শত নরমুণ্ডচ্ছেদে
পাটনার ধূলিপথ ভাসাইনু রক্তের বন্যায়,
অন্যায়, অন্যায় সবি, অন্যায়ের বদলে অন্যায়।
তবু ক্ষান্ত হই নাই। সঙ্গে ছিল বহু রত্নধন,
সঙ্গে ছিল প্রভুভক্ত সুবিশ্বস্ত অনুচরগণ
অনায়াসে কোন রাজ্যে পারিতাম পাতিতে সংসার,
হয়ত কোথাও পেতে পারিতাম বাহিনীর ভার॥

সে জীবন ঘৃণ্য মোর, স্বাধীনতা করি বিসর্জন
চাহিনিক অন্য সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বা গৌরব অর্জন।
এক বিন্দু বীররক্ত থাকিতে এ শাহী ধমনীতে,
স্বাধীনতা-স্বপ্ন আজো একেবারে পারিনি ত্যজিতে।
আশালতা উন্মূলিতে পারে নাই ভাগ্য-বিপর্যয়
কিনিনু সঞ্চিত ধনে অযোধ্যার সুজার আশ্রয়,
সাথী এক পাইলাম নিরাশ্রয় শা'-জাদা গহরে।
তিনের মিলন হ'ল, আশালতা আবার মুঞ্জরে,
ত্রিশক্তির সম্মিলনে চলিলাম প্রবল প্রতাপে,
বিজয়ীর রাজশক্তি পদ্মপত্রে জলসম কাঁপে॥

দিল্লী-সিংহাসন তরে মোহমুগ্ধ শা'-জাদা গহর
দেওয়ানী সনন্দ হাতে ব্রিটিশের হইল নফর।

স্বার্থমুগ্ধ অর্থলুব্ধ সুজা মোর সর্বস্বই হরি
খঞ্জ হস্তিপৃষ্ঠ 'পরে চড়াইয়া দিল দূর করি।
হস্তীতে কি কাজ আর? রাজপথ নয় মোর লাগি,
বনপথে যাত্রা মোর আজি আমি ফকির বৈরাগী।
গেছে রাজ্য, গেছে সেনা, সেনাপতি, গেছে মসনদ,
গেছে অনুচরবর্গ পত্নীপুত্র দৌলত সম্পদ,
একান্ত নিঃসঙ্গ আমি নিঃসম্বল, সারা পথ মরু,
ছাড়ি গেল নিঃসহায়ে শেষ সঙ্গী দোসর সমরু॥

সবি গেছে ছাড়ি নাই আজো মোর সংকল্প কঠোর
উদ্ধারিব রাজশক্তি একদিন এই পণ মোর।
আমারে বাঁচিতে হবে। আছে দিল্লী, গিয়াছে মুঙ্গের,
মারাঠা, রোহিলা, জাঠ বহু শত্রু আছে ব্রিটিশের।
আমার মাথার মূল্য লক্ষ টাকা হেঁকেছে ইংরাজ।
ফকিরের এ মাথার কোটি কোটি মুদ্রা মূল্য আজ!
আমারে বাঁচিতে হবে। নিরন্তর স্মরি হুমায়ুনে,
আবার লাগিতে হবে দীপ্তরূপে পুড়িয়া আগুনে।
জপি না খোদার নাম তসবিতে, খোদা মোরে বাম—
সোনার বাঙলার নাম জপিতেছি তাই অবিরাম॥

কারো পদানত কভু হয়নিক এ শির উদ্ধত,
পৌরুষ আমার কেন নিয়তির হবে পদানত?
চাহিনা স্বাচ্ছন্দ্যসুখ, গৃহসুখ, আরামবিশ্রাম,
আমার এ চিত্ত চায় আজীবন কেবল সংগ্রাম।
মৃত্যু ত সাথেই আছে—সর্বদুঃখ করিবে হরণ।
আমারে বাঁচিতে হবে পণ মোর করিয়া স্মরণ।

স্বপ্ন, স্বপ্ন সবি মায়া, এত বড় রাজত্বগৌরব
ভারতে কাহার আজ ?   স্বপ্নবৎ মিলাইল সব।
ধূলি সম উড়ে গেল সাম্রাজ্যের সমস্ত সম্বল
মায়াবলে।   আর আজি সার মোর তস্‌বি কম্বল।
তাই নিয়ে ভাবিতেছি পুনঃ আমি হব রাজ্যেশ্বর।
হস্ত নাই, পদ নাই, দাঁতে চাপি ধরিয়া খঞ্জর।
পঞ্জরপিঞ্জর মাঝে সিংহটারে ঠেকাই কেমনে,
অসাধ্য সাধন স্বপ্নে গর্জি সে যে উঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখে রেখ—ছিল বটে ক্রূর,
নবাব কাসেম আলি ছিল বটে নৃশংস নিষ্ঠুর,
ছিল না সে চন্দনের ভারবাহী পালিত গর্দভ,
ন্যায় সত্য তরে সে যে যুঝিয়াছে তাহাই গৌরব।
বিলাসভোগের লাগি চাহেনি সে বাংলার নবাবি,
প্রজার পালন ব্রতে, রাজধর্মে ছিল তার দাবি।
নবাব কাসেম আলি ছিল নাক হীন মীর্জাফর,
দেশেরে বিক্রয় করি হয়নি সে কাহারো কিঙ্কর।
নিমকহারামি করি মসনদ করেনি অর্জন,
নিমকহারাম দলে নদীগর্ভে করেছে মজ্জন।
রক্ষিতে আপন প্রজা দিয়াছে সে নিজ বক্ষ চিরি'
স'পেছে সর্বস্ব, নিজে শেষকালে নিয়েছে ফকিরি॥

আমার সোনার বাংলা, চিরতরে বিদায় বিদায়,
স্মরিতে তোমার কথা ফকিরেরো বুক ফটে যায়।
নূতন শাসনে তুমি সুখী হবে ? তাই যেন হ'য়ো।
সুখী হ'য়ে ভুলে যাবে ? তাই হোক মোরে ভুলে র'য়ো।

ক্ষোভ নাই, লোভ নাই। মনে রেখ মোর ইতিহাস
আমিও করিতে সুখী করেছিনু প্রচণ্ড প্রয়াস।
যদি দুঃখ পাও, অন্ন, সুবিচার, শান্তির অভাবে
স্মরিতে ভুলো না যেন হতভাগ্য তোমার নবাবে॥

মমতাজ

মরিয়া বাঁচিয়া গেলে তুমি ভাগ্যবতী,
সে ভাগ্য পায়নি তব বাদশাহ পতি।
আজিও বাঁচিয়া আছ শাশ্বত যৌবনে
শিলাশ্রীতে। লীলা তার অজরা ভুবনে।
না মরিলে কি দেখিতে ইরাণ-নন্দিনী
আপন প্রাসাদকক্ষে রহিয়া বন্দিনী?
সে কথা বলার কিছু নেই প্রয়োজন,
শোণিতাক্ত ইতিহাস করিছে বহন
সে বারতা অনিচ্ছায়। কণ্টকশয়নে
তিলে তিলে মৃত্যু সে ত' তুষাগ্নি-দহনে।
তার পরে মরণান্তে কোথা হ'ত ঠাঁই?
অনুমান করি শুধু ভাবিয়া না পাই।
অলৌকিক যৌবনশ্রী যাহা নিজে গড়ে
সে তাজমহল নয় জরতীর তরে॥

কবিয়াল ভোলা ময়রা

চৌদ্দপুরুষ যাদের রসের ভিয়েন করার প্রথা,
তাদেরই ত পদ্য লেখার কথা।
আজকে দেখি বদ্দি বামুন কায়েত ঘরে ঘরে
পদ্য ব'লে গদ্য চালায় কেই বা সে সব পড়ে?
সে সব লেখায় ভুলবে না আর ভবী।
ময়রা ভোলা তুমিই আসল কবি।

মোদক ম'শায় তোমার পেশায় আমোদ যত দিলে,
একালে তা কোন্ কবিতায় মিলে?
জিলিপী বানানো হাতে তোমার মুসাবিদা
অথচ নেই জিলিপী-পেঁচ, সদাই সাদাসিধা।
মজার লেখা খাজার মতো, গজার মতো মিঠা
কোথায় লাগে ঠাকুরবাড়ীর মালপো, পায়স, পিঠা?
তোমার তাড়ুর তাড়া খেয়ে ফিরিঙ্গি এন্টনি
হলো দেশের জামাইবাবু হিন্দু শিরোমণি।
চোখের বালি নয়ত তোমার মুখের গালাগালি
বালি-বালি আখের গুড়ের বালি।
কাব্যপাঠের সভা যদি বসাই কোনো ঠাঁয়
দশজনো লোক জুটবে নাক' তায়।
তোমার লেখা হতো যেথায় গাওয়া কিংবা পড়া
হাজার লোকে বাজার হতো ভরা।
এই তো হ'ল বড় কবির আসল পরিচয়
করলে অবাক, বেবাক লোকের হৃদয় করি জয়।
কবি গণেশ, তোমার মাথা ভরা সিঁদুরদাগে
পঞ্চদেবের মধ্যে তা যে উচ্চ হয়ে জাগে।
গণতন্ত্রী পূজা তোমার চাই যে সবার আগে॥

কালিদাসের শিশির ঋতু

শুন প্রিয়ে, বলি এবার শিশির ঋতুর কথা।
হেমন্ত কালে যে কামনা জাগে
শিশিরেই তাহা সুপরিণতা।
দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত এবে ক্রৌঞ্চরবে,
এবে প্রমত্ত গ্রাম-গ্রামান্ত শালিশস্যের মহোৎসবে।
শিশির ঋতুর প্রকোপের সাথে
মকরকেতুরো বাড়ে প্রভাব,
হিমশিহরণ সঙ্গে সঙ্গে
প্রেমশিহরণ অঙ্গে অঙ্গে
দিন দিন করে প্রসার লাভ।

গৃহে গৃহে আজ বাতায়ন আর মুক্ত নয়।
রবির কিরণ মদিরার মত, হুতাশনও উপভুক্ত হয়।
উরু উরসিজ গুরু বাসে নিজ ঢাকে ললনা,
আজিকে পরমভোগ্যা রমণী সযৌবনা,
শীত-বিধু-রুচি পীত চন্দনে লিপ্ত করে না আজি সে দেহ,
চন্দ্রধবল হর্ম্যশিখর চাহে না কেহ,
তুষারশীতল সমীরণে নাই কাহারো রুচি,
তাহাদের দিন গিয়াছে ঘুচি।

হিমসংঘাত-নিপাত-শীতলা ইন্দুকিরণে ধবলায়িতা
পাণ্ডুতারকা-মণ্ডিতা নিশা শুচিস্মিতা,
সুধার চূর্ণ করে বিকীর্ণ দিগ্‌বিদিকে,
হরিতে পারে না তবুও কাহারো মানসটিকে।

মুখে তাম্বুল, অঙ্গে বিলেপ শৈত্যহারী,
কণ্ঠে মালিকা, আসবে মোদিতবদনা নারী,
কালাগুরু-ধূপ-বাসিত নিশীথ-শয়ন-গৃহে
পশিছে ত্বরায় দেখলো প্রিয়ে।

অপরাধী পতি তর্জিত অতি কাঁপিছে ভয়ে,
ঠাঁই চাহিবারে নাই যে সাহস ভুজাশ্রয়ে,
শীতের প্রভাব এমনি সখি,
সমদা প্রমদা ভুলে পরমাদ ক্ষমার নয়নে তারে নিরাখ।

দীর্ঘ রজনী ধরিয়া পতির পীড়ন সহি'
পরিপীত-রস দলিত অবশ তনুটি বহি',
বিলাসিনীগণ প্রভাতে আপন উরোজভারে
ক্ষিপ্র চরণে চলিতে নারে।

পুরবধূগণ গুরু কঞ্চুক ধরেছে বুকে,
রাগরঞ্জিত কৌষেয় বাস পরেছে সুখে,
ফুলমালা সনে বেণীবন্ধনে বেঁধেছে কেশ,
শীতেরে স্বাগত জানাতে ইহাই বরণ-বেশ।
কামিগণ আজি কামিনীগণেরে নির্দয় ভুজে বক্ষে চা৻
কুঙ্কুম-রাগ-চর্চিত-কুচপীড়ন-তাপে
শীতের প্রভাব করি পরাভব ঘুমায়ে পড়ে,
মৃগলোম সুখশয্যা'পরে।

বিধুবদনারা হ'তে চায় আরো মদনাতুরা
দয়িতের সাথে পিইতেছে রাতে মাদনসুরা,

সুরাকুম্ভের উপরে শোভিছে সিতোৎপল,
তাদের সুরভি নিশ্বাস বায়ে কাঁপিছে তাহার শিথিল দল।

ভোগাতিশয্যে অপগত কারো মদনরাগ,
এখনো স্ফুরিছে প্রিয়ের পীড়নে কুঞ্চিত কুচ অগ্রভাগ।
প্রিয়জন-পরিভুক্ত শিথিল তনুর পানে
হাসি হাসি চায় আনঘরে যায় নিশাবসানে।

গুরু-নিতম্বা আরেক রমণী আজিকে প্রাতে,
শয়নকক্ষ হ'তে বাহিরিছে কেশপাশ তার ধরিয়া হাতে।
সৌরভহারা এবে কালাগুরু-ধূপে আমোদিত চিকুরপাশ,
ঝরে গেছে ফুল, আলুথালু চুল মালার সূত্রে ধরেছে ফাঁস,
বিতথ কেশের গ্রন্থি মোচন না করি আজ
সবার সমুখে আসিতে সে নারী পায়' যে লাজ।

পৃথুল-জঘনা কোন অঙ্গনা নিজ দেহভারে চলিতে নারে,
গৃহ-সংসার ডাকিছে তারে,
নিশীথের বেশ করি বর্জন দিবসযোগ্য সজ্জা ধরে,
ধীরপদে চলে লজ্জাভরে।
রজনীর পালা হয়েছে সারা,
গৃহলক্ষ্মীর রূপ ধরিয়াছে অঙ্গনারা।

সব মালিন্য ধৌত হয়েছে প্রাতঃস্নানে,
কনক-কমল-কান্তি ফুটিছে পুন বয়ানে,
লভিয়াছে নারী দেবী-মহিমা,
নয়নের কোণে আরক্তিমা,

শ্রুতিপুট ঢাকি স্তরে স্তরে
আলুলিত কেশ লম্বিত শোভে অংস 'পরে।
দেখ প্রিয়ে হোথা কোন রূপসী
দেহে সম্ভোগ-চিহ্নগুলিরে হেরিছে বসি'
যত দেখে তত জুড়ায় আঁখি,
ওষ্ঠের চাপে অধরে ঢাকি'
ভাগ্যেরে অভিনন্দিত করি সে সুন্দরী
বদনকমল ভূষিত করিছে নূতন করি'।

এই শীত ঋতু গৌড়ী মদিরা এনেছে প্রচুর সঙ্গে করি'
নীহারের হার অঙ্গে ধরি।
ক্ষেত্র হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ ইক্ষু-শালিতে দিয়াছে ভরি।
উৎসব করে হের দিবারাতি
কন্দর্পেরে করি নিজ সাথী
হর্ষ এনেছে সবার ঘরে।

প্রিয়জন যার কাছে নাহি শুধু তাহার তরে
এনেছে বেদনা, তৃণে তৃণে তাই তাহারো নয়নে অশ্রু ঝরে।
এই শীত ঋতু তোমারে কান্তে সব শুভ সুখ, করুক দান
অশুভ হইতে করুক ত্রাণ॥

গোষ্ঠলীলা

বিশ্রাম সুখ—চিত্তবিনোদ তরে
যাই না সাগরে অথবা ভূধরে—রয়ে যাই নিজ ঘরে।
বাঙালী কবির গড়া ব্রজধাম ঘরে বসে আমি পাই।
জুড়াতে পরাণ সেই ব্রজধামে যাই।
ফুটে যেথা সারা বরষই কদম, ছুটে যেথা কুহু-কেকা।
সেথা হয় মোর নন্দ-কিশোর কানুর সঙ্গে দেখা।
নয় নিকুঞ্জে, নয় মধুবনে, হোলীলীলা-হিন্দোলে,
নয় সখীদের ঝুলনের কলরোলে।
হয়নি আমার চিত্তশুদ্ধি লাভ
মনে যে জাগে না গূঢ় রহস্যময় সে সখীর ভাব।

সেথা পাই আমি বাংলা গোঠের বাট,
দূর্বা শ্যামল মাঠ—
দেখা হয় সেথা ঘন শ্যামল রাখালরাজের সাথে,
অঙ্গে যাহার পিয়ল কাঁচনি, বাঁশরী পাঁচনি হাতে।
সেথা হয়ে আমি রাখাল দলের সাথী—
শ্যামের সঙ্গে খেলায়-ধূলায় মাতি।
ভুলে যাই মোর জরা,
পরনের বাস হয়ে যায় পীতধড়া।

মধু-মঙ্গল শ্রীদাম সুবল সুদামে সঙ্গী পাই,
তাদের খেলায় কত না ভঙ্গিমাই।
সেথা হেরি কানু সকল খেলায় হারে,
জেতায় যাদেরে হারিয়া তাদেরে হেসে বয় পিঠে ঘাড়ে

কানুরে সাজায় তারা কত বনফুলে
বন ফল খেয়ে মিঠা স্বাদ পেয়ে তার মুখে দেয় তুলে।

খেলায় শ্রান্ত যবে হই মোরা বংশী বটের তলে,
বাঁশরী বাজায় কানাই মোদের নয়নে অশ্রু গলে।
কেন তা জানি না পরাণ উদাসী হয়,
নিখিল ভুবন হয় যে স্বপন, হয়ে যাই শ্যামময়।
আধা তনু তৃণে আধা ধেনুদেহ-উপাধানে দিয়ে ঠেস
দুপুরে ঘুমাই ঘনালে তন্দ্রাবেশ।

শ্যামল তৃণেরে কেমনে তুচ্ছ গণি।
সে তৃণ শ্যামের বরণ পেয়েছে—তাই হয় শেষে ননী।
সেই তৃণে পেয়ে শয্যা যে শ্যাম মার কোল গেল ভুলি'
সে তৃণ রচেছে লীলা প্রাঙ্গণ মুছেসে চরণধূলি।
দিগন্ত-জোড়া সারা প্রান্তরে ধেনুরা ছড়ায়ে পড়ে—
তৃণ সন্ধানে, যেন নীলাকাশে তারারূপ তারা ধরে।

দিবসের অবসানে
বলাই-এর শিঙা কানাই-এর বেণু তাদের জুটিয়ে আনে।
ফিরে ধেনুদল তুলি তরঙ্গ আলোকিয়া সারা পথ,
আগে আগে চলে কানু যেন দুধ-গঙ্গার ভগীরথ।
আয়ান-বধূর অনিমিখ-দিঠি সেই দুধী গঙ্গায়
বাতায়ন-পথে প্রতি গোধূলিতে গাহন করিয়া যায়॥

গঙ্গাতীরে

কত না চিন্তা মনে আসে মাগো তোমার পাশে।
বিরাট-ক্ষুদ্র বিপ্র শূদ্র সবে অন্তিমে হেথায় আসে।
তোমার শ্মশানে চেয়ে তোমা পানে, না কেঁদে কি কেহ থাকিতে পারে ?
তব মহাপথ-ধারার প্রান্তে স্থির কে চিত্ত রাখিতে পারে ?
কত জন তব অনল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
তাহাদের শেষ স্মৃতিটুকু মাগো তুমিই রেখছ সংগোপনে।
পতিরে হারায়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়িয়াছে সতী তোমার কোলে,
শোকাতুরা মাতা ঝাঁপায়ে পড়েছে—'আমারেও টেনে লও মা' ব'লে।
মায়েরে খুঁজিতে মা-হারা বালিকা তোমার শ্মশানে হারায় দিশা,
প্রিয়তমা-হারা ফিরে ফিরে আসে তোমার কূলেই কাটায় নিশা।
সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও, মিছে মরে সে প্রিয়ার ভস্ম খুঁজে।
ভাঙা ঘট আর পোড়া কাঠ বুকে কাঁদে সে বালুতে মুখটি গুঁজে॥

চিতাই জীবের নয় শেষগতি—শিবপদ লভে সে পরলোকে,
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান, তাই অনধীরা তুমি সবার শোকে।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অব্যয় ধ্রুবধনের সাথে,
মূঢ় শিশু হায় সংশয়ে চায় খেলানাটি সঁপি মায়েরো হাতে।
তার দশা দেখে হেসে কেঁদে ডেকে কলনাদে বলো 'অবিশ্বাসি,
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে-রে হরিচরণবাসী'।
অজ্ঞান তারা, দিব্য বোধন বিশ্বাস-বল, কোথায় পাবে ?
ঐন্দ্রজালিকে অঙ্গুরী সঁপি চিরতরে গেল কেবলি ভাবে॥

আজি তব তীরে কল্পনা উড়ে হেথা হ'তে ছুটে অজানা লোকে,
ঘন চিতাধূম আভছায়া-ফাঁকে মহাপথ জাগে তরল চোখে।

পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি,'
শত শত পাণি দেয় হাতসানি ডাকে 'আয় আয় আয়রে বলি'।
অনাবিষ্কৃত পথরহস্য ভয়ে ভাবনায় আকুল করে,
তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদ-বিন্দু হরে॥

কল্পনয়নে হেরিতেছি আজি সজ্জিত মোর আপন চিতা,
অনলে এ তনু আহুতি সঁপিতে আহুত বন্ধু স্বজন মিতা,
উঠে অবিরল হরিহরি বোল, রোদনের রোল এ দেহ ঘিরে,
থাক্ মা সে কথা,—কত না চিন্তা জাগে মনে আজ তোমার তীরে।

পূর্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জনমেছি যবে বঙ্গদেশে,
আছে মা ভরসা পঙ্ক মুছিয়া অঙ্কে তুলিয়া লইবে শেষে।
তব সিকতায় মার মমতায় অনলশয্যা পাতিয়া রেখ,
'তারক ব্রহ্মনাম' কাণে দিও, জননি আমার শিয়রে থেক,
তোমার কৃপার পাবন কৃপাণে জন্মবাঁধন ছেদন করি,
পতিতপাবনী নামে সার্থক ক'রো এ নারকী পতিতে তরি'।
ইহজীবনের শেষ সম্বল চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
তব তীরে নীরে যার গুণে তরে কৃমিকীটও, মোরে দিও তা দিও

ছা-পোষার হাল

বাজারে যখন যাই দেখি এরা ছোট থলে হাতে
ছোট ছেলে সাথে,
কেনে একপোয়া আলু, আধপোয়া চুনো পুঁটী মাছ,
ঢেঁড়স, ডুমুর, থোড়, মূলা, কচু, ডাঁটা দুইগাছ।
গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে চটি,
তেল কিনবার তরে হাতে ছোট ঘটি।
অল্প আয়ে এরা সব কাজ করে—ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে,
আপিসে, দোকানে, রেলে, স্কুলের কোটরে,
ঘাড়ভাঙা হাড়ভাঙা এদের খাটুনি,
ব্যথা পাই যত দেখি শুনি।
ভাবি, হায় এদের বারতা
নিয়ে কারো এদেশের নেই মাথাব্যথা।
ভালো কথা, ভুলে গেছি, কেনে এরা কিছু কলাপাত,
ঝি-চাকর নেই মোটে, বাসনেরও নেইক উৎপাত।
দিন আনে দিন খায় জমা কিছু থাকে না হাঁড়ীতে।
কাপড় দেয় না এরা ধোবার বাড়ীতে।
কাপড় সেলাই ক'রে পরে,
গোটা পরিবার মিলে থাকে একই ঘরে।
ছোট ছোট রুগ্ন ছেলেমেয়ে
মিটায় দুধের তৃষ্ণা বার্লি জল খেয়ে।
ভাতের ফেলে না ফেন, ফেলেনাক আনাজের খোসা,
আম খাওয়া শুধু আঁটি চোষা।
পরীক্ষায় এদেরি তো ছেলে ফেল হয়,—ফেল হ'লে
পড়িতে পায় না আর, মাহিনা যোগাতে নারে ব'লে।

এদের মেয়েরা কভু কলেজে না যায়,
বহুর হয়না বিয়ে, ছেলেরাও বিবাহ না চায়।
আয় নেই, ঘর নেই, ভগিনী অনূঢ়া
বিয়ে করা চলেনাক, বাপ এত বুড়া।
রাখে কেউ এদের বারতা ?
জানে যারা পায় তারা ব্যথা ?
অথচ পরতে হয় এদেরও তো সাফা জামাজুতা,
এদেরও পীড়ন করে নানাবিধ সামাজিক ছুতা।
ইস্কুলে পাঠাতে হয় ছেলে,
খরচ করতে হয় প্রথামত অতিথিরা এলে।
চা-খাবার কিনে আনে ছোট ছেলেমেয়ে।
অতিথি সিঙাড়া খায়, দেখে চেয়ে চেয়ে।
শ্রমিক কৃষক নয়, রিক্‌সও না টানে,
পিওন পাইক নয়, এরা কিছু লেখাপড়া জানে।
রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, কামার,
দারোয়ান, দর্জি, ধোবা, দপ্তরী, চামার
এত দুঃখী তারা নয়। যতই অভাবী হোক,
এদের থাকতে হয় সেজে 'ভদ্রলোক'।
যেখানে লক্ষ্মীর কৃপা পুত্রকন্যা দুর্লভ সেথায়।
ষষ্ঠীর কৃপায় এরা হাবুডুবু খায়।
এই সব অভাগার তরে
এ হৃদয়হীন দেশে কেবা চিন্তা করে ?

প্রেমের মর্যাদা

যাত্রার দিন-ক্ষণ ঠিক করি হাতে পঞ্জিকা ধরি'
যেখানে প্রণাম নিবেদিতে বল, সেখানে প্রণাম করি।
এ গৃহে পর্ব ব্রত উপবাস সারা বৎসরই চলে,
শীতে ভোর রাতে ইতুঘট ভরি আনো গঙ্গার জলে,
তবুও হাসিনি।   শৌচাশৌচে কঠোর বিচার তব
সহিয়া গিয়াছি। পালন করেছ পার্বণ নব নব।
তোমার শাস্ত্রে বার-তিথি-গত যেমন বিধান আছে,
তেমনি নীরবে করেছি পালন, ব্যথা পাও তুমি পাছে
পূজ্যাপূজ্য ভোজ্যাভোজ্য বিচার নিয়ম যত
সবই মেনে গেছি কাঁটায় কাঁটায় করি শির অবনত।
আমি জানি শাঁখ ধান্যদূর্বা ফুল দীপ ঘট ধূপ,
মোর শুভার্থে তারা অকপট প্রেমেরই বিবিধ রূপ।
তব প্রেম সতি সব বিচারের চেয়ে যে কাম্যতর,
বিদ্যাবুদ্ধি ধারণা যুক্তি মতবাদ হ'তে বড়॥

দূরযাত্রায় কল্যাণতরে পূজিল চণ্ডীঘট
খুল্লনা সতী, স্মরি সে ভকতি, সেই প্রেম অকপট।
পদাঘাতে সেই ঘট ভেঙ্গে দিল ধনপতি সদাগর
সেই চিত্রটি স্মরিতে আমার ব্যথা পায় অন্তর।
চণ্ডীর রোষ তুচ্ছ একটা ঘটের জন্য নহে,
সতীর প্রেমের অপমান কভু সতী দেবী নাহি সহে।
পূজা কর আর নাই কর তাঁরে, তাঁর কিবা যায় আসে!
কবিকঙ্কণ এই শিক্ষাটি দিয়াছেন তাঁর দাসে॥

সমুদ্র-তীরে

সিন্ধুর উপর দিয়ে পাখী যায় উড়ে
সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখি যতদূর দৃষ্টি যায় দূরে,
অস্বস্তি জাগায় মোর প্রাণে ;
চেয়ে রই বহুক্ষণ একদৃষ্টি নীলাকাশ পানে।
ফিরল কি ফিরল না উড়োপাখী জাগল সংশয়,
তিন পরিণাম তার হ'ল মোর অন্তরে উদয়।
হয় ত সে চলে যাবে হয়ে সিন্ধুপার,
নয় ত সে বহুদূর উড়ে গিয়ে ফিরবে আবার,
নয় ত সে ক্লান্ত হয়ে সাগরের জলে
পড়ে গিয়ে হারাবে অতলে ॥

এই তিন গতি—
মানুষেরও মৃত্যুপথে হয় ত এমতি।
পরলোক ? পুনর্জন্ম ? চির অবসান ?
কেবা জানে এ রহস্যে কি বা সমাধান ?
কিসের সন্ধানে মোর দৃষ্টিসীমা করি অতিক্রম
অত দূরে গেল পাখী অকারণে করি বৃথা শ্রম ?
উড়ন্ত যে-কোন পাখী তারি স্মৃতি মনে মোর আনে,
কি হ'ল সে পাখীটার দশা কে তা জানে ?
মনেরে সান্ত্বনা তবু দিই বারে বারে
নিশ্চয় নীড়ের টান ফিরায়েছে তারে ॥

এই সান্ত্বনায়
কেহ তার প্রিয়জন-শোক ভুলে যায় ?
রেখে হেথা অসমাপ্ত ব্রতখানি তার
যে যায় সে ফিরে কভু আসে না কি আর ?

শঙ্কর

কৈলাস ত স্বর্গে নয়, সেথা কত জনা
গিয়েছে, এসেছে দেখে, দিয়েছে বর্ণনা।
গিরীন্দ্রের কন্যা তব জায়া,
দরিদ্র সংসারে তব গৃহলক্ষ্মী—নাম মহামায়া।
আমাদেরি মত তুমি সংসারের সব জ্বালা সও,
আমাদেরি একজন, তুমি ত স্বর্গের কেহ নও॥

দেব কি দরিদ্র হয়? তোমারে দেবতা বলে মূঢ়ে।
শ্মশানে বিহার কর, শ্মশান কি আছে দেবপুরে?
সুধা তব সেব্য নয়, সুধা পান করে দেবগণ,
আমাদেরি মত তুমি কণ্ঠে বিষ করেছ ধারণ।
আমাদেরি মত ভুল কর দিনরাত,
তাই তোমা বলে ভোলানাথ।
তোমারি মতন মোরা ক্ষুৎপীড়িত অন্নের কাঙাল,
তোমারি মতন দগ্ধ মোদের কপাল।
মানুষেরই মত তুমি কর বটে রোষ,
পরক্ষণে স্তব শুনে সব ভোল' তুমি আশুতোষ॥

কে বলেছে দেবতা তোমায়?
দেবতা কি ভিক্ষা মাগে? আমাদেরি ভিক্ষা ব্যবসায়।
জন্মমৃত্যু নাই তব হে আদিপুরুষ,
তবু তুমি এ মর্ত্যেরই মানুষই যে,—আদর্শ মানুষ।
এক তুমি বহু হয়ে সারা বিশ্বে সৃজিলে মানব,
দেবতারা মানবেরই কল্পনাসম্ভব॥

বহিতেছ জটারূপে মানুষের ত্রিতাপের ভার।
চিরন্তন মানুষের রূপ হেরি মাঝারে তোমার।

দুঃখালয় অশাশ্বত এই বিশ্বভূমি
পরিহার কর নাই তুমি।
দেবতা ও মানুষের মাঝখানে তব অবস্থিতি,
দেবতার রোষ হতে তুমি রক্ষা করিতেছ ক্ষিতি।
প্রভু, তব চিরন্তন নারীত্বের ভাবরূপা জায়া,
মায়ামুগ্ধ মানবেরই মাতা মহামায়া ॥

কালিদাস

১

বহুশত বর্ষ আগে ওগো মহাকবি,
আঁকিয়াছ স্বপ্নপটে হৃদয়ের ছবি।
সে দিনের বসুন্ধরা লভিয়াছে কত রূপান্তর,
সে দিনের পুর, পল্লী, জনপদ, কান্তার, প্রান্তর,
পথঘাট, বাসগৃহ বিবর্তিত নব জন্মলাভে,
প্রকৃতি কেবল আছে সেই একই ভাবে,
অটবী তটিনী শৈল বিরাজিছে তেমনি ভূতলে,
রবিচন্দ্র তারাবলী একই ভাবে গগনে উজলে।

বিহঙ্গ-কাকলী, ফুল্ল কুসুম-সৌরভ,
সমীরণে মর্মরিত তরুর পল্লব,
শরতের কাশবন, বরষার নীলাঞ্জন মেঘ,
তেমনি জাগায় আজো হৃদয়ে আবেগ।
গর্ভাধানে বলাকারা ধায়—
দিগ্‌বধূদের কণ্ঠে আজো শুভ্র মালিকা দুলায়।
প্রিয়া সহ মিলিত যে নিরখিয়া নব জলধর
তারো চিত্তে জাগে ভাবান্তর।

রম্য বস্তু হেরি আর কর্ণে শুনি মধুর নিঃস্বন
সৌহৃদ জননান্তর আজো স্মরে বিরহী যৌবন ॥

সংসারের রীতিনীতি, আচার, বিচার, আচরণ,
সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, অশনবসন
সবই আজ বিবর্তিত। নারী নরে হৃদয়ের মিল,-
সেই মুগ্ধ প্রেমলীলা ক্ষুণ্ণ শুধু নয় এক তিল।
বিরহ মিলন-তৃষ্ণা, রূপমোহ, মান্-অভিসার
একই ধারা ধরি করে আজো চিত্তে রসের সঞ্চার।
একই কুসুমের পাত্রে আজো মধুকর
বধূরে পিয়ায়ে মধু নিজে পান করে তারপর।
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করি কণ্ডূয়ন
প্রিয়া-অঙ্গ-রসাবেশ-স্পর্শে তার ঢুলায় নয়ন।
করেণুর বদন-বিবরে
তুলিয়া মৃণাল-কন্দ দেয় করী তেমনি আদরে ॥

প্রকৃতি পিরীতি এই যুগ্মবৃন্ত করিয়া আশ্রয়
বিকশিত করেছিলে তোমার সে সুরভি হৃদয়।
সুষমারে করেছিলে অনন্তের দূতী,
বারতা সঁপিলে তারে, প্রেমের আকূতি।
নিত্যচিরন্তন যাহা শুধু তারি গীত
গেয়ে গেলে, তাই তুমি সর্বযুগজিৎ।
রসাবিষ্ট হই তব গীতে
তাই আজো, বহুকাল ব্যবধানে বিংশ শতাব্দীতে।
ধরণীর ভাঙাগড়া, উঠাপড়া, বিজ্ঞানী শাসন
টলাইতে পারে নাই রসলোকে তোমার আসন ॥

২

রম্য দৃশ্যে গন্ধে গানে প্রকৃতি জাগায় প্রাণে বিচ্ছেদের ব্যথা।
করে মোরে জাতিস্মর স্মরায় জননান্তর-সৌহৃদের কথা।
তুমি দিব্যধাম লভি ভুলিয়া কি গেলে কবি, এই অভাজনে?
তব নানা ভূমিকাতে আমি যে ছিলাম সাথে, পড়ে না কি মনে

যবে তুমি রাজরথে চলিলে আশ্রমপথে করিতে মৃগয়া,
রোধ করি রথগতি নিরীহ মৃগের প্রতি সঞ্চারিনু দয়া।
বসন্তের রূপ ধরি অনঙ্গের তূণ ভরি সাজাইলে ফুলে।
আমি ছিনু অনুচর রক্তাশোক ইন্দীবর আনিলাম তুলে।

অজ-রূপ ধরি যবে স্বয়ংবর মহোৎসবে গেলে তুমি কবি,
আমি তব ছত্রধারী তাহা কি ভুলিতে পারি সে গৌরব লভি
রামগিরিচূড়াশিরে সিক্ত করি আঁখিনীরে প্রাণের আবেগ,
পাঠালে প্রিয়ার তরে কার করে মনে পড়ে? আমি সেই মেঘ

পাঠাইলে যে বারতা তাহার গহন ব্যথা জন্মে জন্মে বই!
হায় তব এই সখা কল্পলোকে সে অলকা খুঁজে পেল কই?
আমার জীবন দলি কত যুগ গেল চলি খুঁজিতেছি তাই।
নয়নে বরষা নামে তুমি নিত্যকল্পধামে কাহারে শুধাই?

দিলে যে পথের দিশা তাই ধরি দিবা নিশা চলি প্রাণপণে,
এ বিশ্বে সন্ধান বৃথা শাপান্তে মিলেছ মিতা সে প্রিয়ার সনে,
বহিতেছি আমি তবু সে কথা ভুলিনি কভু, মোর মুক্তি নাই
বিশ্বের বিরহিগণে মন্দাক্রান্তা কলস্বনে আজো তা শুনাই॥

বিদ্যালয়-পথে

বাবলা ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে
যেই শীর্ণ পথ ধরি' চলিতাম কৈশোর-জীবনে
বিদ্যালয় পানে নিত্য। রাঙচিতা-বেড়া দিয়া ঘেরা
মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর অঙ্গনে বালকেরা
করিতেছে ছুটাছুটি। মা তাদের ব্যস্ত নানা কাজে।
জীর্ণ দরগার তলে চক্ষু মুদি নিমগ্ন নামাজে
সারি সারি কত জন। বাজে শঙ্খ শিবের মন্দিরে,
বিরাট মন্দির জীর্ণ, ঊর্ধ্বে উঠে বটধ্বজা শিরে ;
বিশ্বনাথ মুষ্টিভিক্ষা লভে নিঃস্ব সেবকের হাতে।
ওলন্দাজী গোরস্তান উপবন পুষ্পের শোভাতে।
বিদেশী বণিকগণ এসেছিল হ'তে বসুপতি,
বসুমতী অঙ্কে সেথা লভিয়াছে সুপ্তির সদ্‌গতি।
ডাহিনে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ-কমল,
বাঁয়ে বেণুকুঞ্জগুলি বায়ুভরে করে টলমল।
হাপরে ফেলিছে শ্বাস কামারের ছোট্ট কারখানা ;
বকুলতলায় ছিল কতদিন বেদের আস্তানা।
পড়ে আছে পোড়া কাঠ। বাজে ঘণ্টা আর্মানী গির্জায়
স্থবির যাজক এসে ধীরে ধীরে তোরণে দাঁড়ায়
শুধায় কুশল প্রশ্ন। গির্জা আছে, ভক্ত আর নাই,
নির্মূল ইহুদীকুল পুরোহিত আজিকে একাই
শুনিছে কালের ঘণ্টা। ঘটে ঘটে ক্ষরিছে জীবন
খর্জুর তরুর কণ্ঠে। তালীবনে দুলায় পবন
বাবুয়ের বাসাগুলি। খণ্ড খণ্ড এমনি কতই
চিত্র নিয়ে বনপথ মনে মোর জাগিছে স্বতই॥

কণ্ঠে মোর দিল ভাষা বিদ্যামঠ, শুনাইল মোরে
দেশবিদেশের বাণী, মোর রিক্ত ঝুলিখানি ভ'রে
পাথেয় সম্বল দিল, বারবার তারে নমস্কার।
আর অই বনপথ জাগাইল জীবনে আমার
আশা, তৃষা, রসাবেশ, গাঢ়প্রীতি, গূঢ় অনুভূতি,
কল্পনারে দিল মুক্তি, ক্ষিপ্র গতি, গভীর আকৃতি,
শিখাইল লীলাভঙ্গী। ভুলিব না তারে ভুলিব না,
শ্রমক্লান্ত তাপদগ্ধ এ জীবনে সঁপিছে সান্ত্বনা
আজিও তাহারি দান। জাগাইল মনের তনুতে
নব নেত্র, নব শ্রুতি, এ দেহের অণুতে অণুতে
ফুটাইল রসাঙ্কুর। ভুলিব না কভু ভুলিব না,
ছায়ার অঞ্চল দিয়া মুছাত সে সকল বেদনা,
পাঠক্লান্তি, স্বেদ, শ্রান্তি, ঘুচাত সে মালিন্যের ভার,
জীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে সে সোহাগ তার।
জীবনের সরসাংশ অই পথে রয়েছে জড়ানো
মুকুলিত জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো
ও পথের ধূলি মাঝে। কী বাঁধন ছিল যে নিবিড়
ও পথের প্রতি তরু গুল্ম সাথে! প্রতিটি কুটীর
ছিল মোর পরিচিত। তরুশাখা হ'তে লতাগুলি
বাড়ায়ে পেলব বাহু শুধাইত পথটি আগুলি
পুষ্পিত কুশল বাণী। কৈশোরের মধুস্বপ্নে ভোর
জীবনে জীবন্ত আজি ছায়াঘন সব মায়া-ডোর
তাদের স্মৃতির সাথে। কবে কার পল্লব তরুণ
হলো পুষ্ট ঘনশ্যাম, কবে কার মঞ্জরী অরুণ
হলো ফলে পরিণত ;—জানিতাম। বুকে আছে আঁকা
বৈশাখী ঝঞ্ঝায় কার কবে হায় ভেঙ্গেছিল শাখা॥

সব চেয়ে মনে পড়ে ফাল্গুনের অপরাহ্নগুলি
উদ্ধত বাদাম তরু উচ্চাকাশে রক্তকেতু তুলি'
দাঁড়াইয়া জয়গর্বে ; অন্য পাশে বিশাল শিমুল
সবটুকু বক্ষোরক্ত নিঙাড়িয়া ফুটাইয়া ফুল
অর্ঘ্য স'পে উদঞ্জলি। তার মাঝ দিয়া পথখানি
আম্রকুঞ্জতলে মোরে স্নেহভরে নিয়ে যেত টানি
মুকুলিত শাখা হ'তে যেথা বিন্দু বিন্দু মধু ক্ষরি'
পড়িত আমার ঠোঁটে—উঠিতাম সহসা শিহরি
অতর্কিত কুহুতানে। মনে হ'ত, কি যেন কি নাই
কি যেন হারিয়ে গেছে, ছিল মোর ! কারে যেন চাই,
সবি যেন স্বপ্ন-মায়া। চিত্ত মোর দেশকাল-হারা
কোকিলের কণ্ঠে পেয়ে যেন কোন্ অজানার সাড়া
ছুটিত অনন্ত পানে। বৈশাখের প্রশান্ত প্রভাতে
এক হাতে গ্রন্থভার, চম্পাহার লয়ে অন্য হাতে
চলিতাম ঘ্রাণমুগ্ধ গেয়ে গান দলিয়া বকুল,
সুরভি শীতল বায়ু অন্তরেও ফুটাত মুকুল,
সর্বদেহে রোমাঙ্কুর। ক্লিষ্ট যবে রবিকরজালে
মাতৃ-মমতার মত ছায়াখানি ফিরিবার কালে
লভিতাম তপ্ত ভালে। কৈশোরের কত মুগ্ধ আশা
ওপথের দুই পাশে গাছে গাছে বেঁধেছিল বাসা,
ধূলায় লুটায় আজ। জানে—জানে অই পথখানি
জীবনের গূঢ় তথ্য। কৈশোরের অকথিত বাণী
ওপথের দুই পাশে পাখীদের কলকণ্ঠ ভরি'
রাখিয়া এসেছি আমি। দুইধারে তৃণের মঞ্জরী
সিক্ত মোর আঁখিজলে। কাঁদিবার নিভৃত সুযোগ
দিয়েছিল এই পথ, সে কৈশোরে কত দুঃখ ভোগ

করিয়াছি, জানিত সে। মোর সুখদুঃখ তার গায়
রেখেছে বিচিত্র করি আজো আলো-আঁধারি লীলায়
ধূলায় কাদায় তৃণে। মোর যত অতৃপ্ত কামনা
আজো সেথা ঝিল্লীতানে নিশিদিন করিছে শোচনা
দরদীর প্রতীক্ষায়। তারুণ্যের সোনার স্বপন
সোঁদালের ডালে ডালে হ'য়ে আছে পুষ্পিত কাঞ্চন

পল্লী থেকে নগরে

স্বরু হ'লো জীবনের নূতন অধ্যায়
নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্যের তীর্থভূমি, বিদায়, বিদায়।
ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথ, বকুলবাসিত সমীরণ,
অঙ্গনে তুলসীকুঞ্জ, গৃহবলিভুকের কূজন,
কমল কহ্লার ভরা শরতের বিল,
গাগরীভরণে কলমুখরিত দীঘির সলিল,
আজিকে বিদায় মাগি সকলের কাছে ;
কেহ মোরে ডাকিও না পাছে ॥

জীবনসংগ্রাম ক্ষেত্রে করিব প্রবেশ
স্বল্পে তুষ্ট কামনার হয়ে গেল শেষ।
আমাদের দেবদারু চূড়ার কুলায়
আজি হায় লুটায় ধূলায়।
ফুরাইল যাত্রা পথে গতি মোর মন্থরতা ভরা
সম্মুখে শ্বসিছে মোর ত্বরাতপ্ত ধরা।
পৌরজীবনের দ্বন্দ্বে ঘর্মসিক্ত কর্ম কোলাহল-
বিমথিত তীব্র হলাহল

করিতে হইবে পান। হেমভাতি মরীচিকা পিছে
ছুটিতে হইবে শুধু, সব স্বপ্ন হয়ে যাবে মিছে॥

বিরাম বিশ্রাম হীন কর্মের প্রবাহ
কোথা নিয়ে যাবে মোরে না জুড়ায়ে অন্তরের দাহ
কে বা জানে? তরঙ্গ তাহার,
কে বা জানে কোন কূলে করে দেবে পার।
তবু যেতে হবে
যৌবনের কুঞ্জ ত্যজি গঞ্জের সে পৌর কলরবে॥

টেলিমেকাসের মতো স্বস্তিমুগ্ধ বৈচিত্র্যবিহীন
জীবন বহিব কত দিন!
বিনা ঘাত প্রতিঘাত, বিনা পৌরজীবন-সমর
সুপ্ত শক্তি লুপ্ত হবে—জাগিবে না, হবে না ভাস্বর।
মৃগের জীবন বটে এজীবন, তবু ইহা পশুর জীবন
ছায়াচ্ছন্ন বনকুঞ্জে সঞ্চরণ কিংবা রোমন্থন,—
পরিহরি যেতে হবে মানুষের ভিড়ে,
কর্মণ্বতীতীরে
যাপিতে হইবে রাতি, শিবিরে শিবিরে।
আসিয়াছি ধরা ধামে যাহা কিছু লভি
ঋণমুক্ত হতে হবে নিঃশেষে সঁপিয়া সেথা সবি।
সেই পথে যেতে হবে স্বপ্নলালা পর্ব করি সারা
যেই পথে চলিয়াছে দেশে দেশে জীবনের ধারা॥

রুপার বাসন

অতিথি হইয়াছিনু আমি এক দিবসের তরে
কলিকাতা হতে দূরে কোন এক শিক্ষকের ঘরে।
বাড়ীঘর বেশভূষা গৃহে আস্‌বাব
কোনটিতে দারিদ্র্যের মালিন্যের নেইক অভাব।
শিক্ষক দরিদ্র হবে এই কথা নয়ক নূতন,
ভাবিনু আতিথ্য লভি শিক্ষকেরে করিনু পীড়ন।

মধ্যাহ্নে পড়িল মোর আহারের ডাক,
ভাবিলাম ঝোল শুক্ত মোচাঘণ্ট শাক,
দিয়া দিব্য পীঁড়ি পাতি কলার পাতায়
ব্রাহ্মণীর রান্না অন্নে সুসঙ্গতি রহিবে বজায়।
গিয়ে দেখি পাতা আছে কার্পেট আসন
চটাওঠা মেঝে ঢাকি। শোভে রাজভোগ্য আয়োজন

অবাক হইয়া ভাবি একি—এ ব্যাপার !
থালা, ডিস, বাটী কটা সমস্ত রুপার,
ঘি-ভাতের সঙ্গে লুচি, এগারো ব্যঞ্জন
প্রকাণ্ড মাছের মুড়া রসনা-রঞ্জন,
সন্দেশ পিষ্টক দধি সুগন্ধি পায়স।
বলিলাম—হায় বন্ধু আমি কি রাক্ষস ?
বলিলেন বন্ধু তায়—সামান্যই মোর আয়োজন,
বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া দয়া করি করুন ভোজন।
সমারোহ-রুদ্ধ কণ্ঠে করে দৈন্য আর্ত হাহাকার
শুনিলাম। নানা চিন্তা মনে মোর করে তোলপাড়।
অন্যমনা হয়ে আমি যথাসাধ্য করিনু আহার।

কত কথা বলিল সে হয়ে কৃতাঞ্জলি
এটা খান ওটা খান বলি'
আধা মোর কানে গেল, গেলনাক আধা
পরম অস্বস্তি সহ করিলাম ভোজন সমাধা।
ভাবিনু শুধাই তায়, রজতের সেট
পৈতৃক সম্পদ কিংবা শ্বশুরের ভেট ?
যারই দান হোক তাহা গণ্যমান্য অতিথির তরে,
সম্বল রূপার সেট, তোলা থাকে বাক্সের ভিতরে।
গণ্যমান্য অতিথি সে কোথা পাবে ? আমারি মার্ফতে
আরেক শিক্ষকে পেয়ে, জানাইয়া দিল সে জগতে—
'যতটা কাঙাল ভাবো ততটা কাঙাল আমি নই
ঘৃণা করো, চুপ ক'রে সই।'

ভাবিলাম দারিদ্র্যের চরম ত এই—
দারিদ্র্যে যে লজ্জা পায় এ জগতে দীনতম সেই।
রূপার মুদ্রার দৈন্য সংগোপন রূপার বাসনে,
হৃদয়ের ক্ষত ঢাকা কষ্টিক লোশনে।
ভাবিলাম, নিষ্কলঙ্ক দৈন্যে ঘৃণা করি
এ সমাজ কত কাল ধরি'
দরিদ্রেরে বাধ্য করিয়াছে
ধনিত্বের অভিনয় করিবারে অতিথির কাছে।
দৈন্য নয় অপরাধ। অপরাধ গোপনের ছল।
চোখ ফাটি এলো অশ্রুজল॥

কালিদাসের বসন্ত

দ্বিরেফ-মালায় কল্পিত যার ধনুর্গুণ
রসাল-মুকুল-শায়কে পূর্ণ যাহার তূণ,
কামীদের হৃদি বিদ্ধ করিতে শীতের শেষে,
আসিল কান্তে, সেই বসন্ত যোদ্ধৃবেশে।

হের সুদন্তী, এই বসন্তে রম্য সবি।
দ্রুম কুসুমিত, বাপী কমলিত, স্নিগ্ধ মলয়ানিল সুরভি,
রম্য দিবস, সৌম্য সন্ধ্যা আজি মধুরা,
পুরবাসিনীরা মদনাতুরা।
আজি বসন্ত করে শ্রীমন্ত দীর্ঘিকারে
নব বিকসিত কুমুদহারে,
ইন্দুকান্তি সুন্দরীদের মণিমেখলার সঞ্জরণে,
শোভায় শোভন মুকুলে রসাল কুঞ্জবনে।

স্ফুটকুসুম্ভ-রাগে অরুণিত চারু দুকূল,
বিলাসিনীদের নিতম্বতটে শোভা অতুল,
করেছে সৃজন নবীন কান্তি তাদের বুকে
কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত নব চীনাংশুকে।

প্রমদাজনের কর্ণে শোভিছে কর্ণিকার,
বিলোল অলকে নব মল্লিকা অশোক হার।
সিত চন্দনে চর্চিত মালা উরঃস্থলে,
বলয়াঙ্গদে ভুজতটে মণি মাণিক জ্বলে।
উরসিজ যুগ পত্রলেখায় মণ্ডিত হেমকলসসম
বদনে হয়েছে মদনের তাপে স্বেদোদ্‌গম,
মনে ভায় যেন মণিরত্নের পংক্তি মাঝে
থরে থরে চারু মুকতা রাজে।

প্রিয় পাশে তবু, ললনার বুকে আজি কি ব্যথা
উচ্ছ্বসি' উঠে? শ্লথ হয় কেন অঙ্গলতা?
স্মরবিচলিতা বরাঙ্গনা,
আজি বসন্ত করে কি তাহারে অন্যমনা?

গণ্ড তাহার আজিকে পাণ্ডু বরণ ধরে
কৃশ তনু তার আলসে লালসে এলায়ে পড়ে,
ঘন ঘন শুধু জৃম্ভণ উঠে মুখাম্বুজে,
লাবণ্য তার মুখবায়ে যেন স্মরেরে পূজে।
মদালস চোখে হইয়া বিলোল, কঠিন হইয়া স্তনযুগলে,
পাণ্ডু হইয়া গণ্ডের তটে, আনত হইয়া নাভিস্থলে,
পীনতা লভিয়া শ্রোণী-শ্রীতে
জাগাইয়া যুবজনের ক্ষুধা,
আজি অনঙ্গ অঙ্গনাঙ্গে জাগে বহুধা।

আজিকে মদন করে প্রমদারে নিদ্রালস,
বচনেরে করে মদবিবশ,
কণ্ঠে আনিয়া জড়িমাভার,
ভ্রূলীলা-বিলাসে কুটিল করেছে চাহনি তার।
অঙ্গনাগণ প্রিয়ঙ্গুরেণু-কুঙ্কুমাক্ত পীবর স্তনে
রঞ্জিত করে চুয়াচন্দন কস্তুরিকার অনুলেপনে।
ঐ হের তারা গুরু বাস ত্যজি' ঊরুর 'পরে
কালাগুরু ধূপে বাসিত সুসিত বসন ধরে

চূতমঞ্জরী-মদিরা-হৃষ্ট পিক পল্লবকুঞ্জাগারে
চুম্বন করে বল্লভারে।

ভ্রমরীর সাথে ভ্রমর বসিয়া পদ্মাসনে
প্রিয়ারে তুষিছে গুঞ্জরণে।
তাম্রপ্রবালে নম্র শোভন আম্রশাখী
পুষ্পিত চারু শাখাপল্লবে অঙ্গ ঢাকি'
কম্পিত হয় পবনভরে,
অঙ্গনা বুঝি অনঙ্গদেবে বোধন করে।

বিদ্রুমরাগ তাম্র কুসুম আমূল সর্ব অঙ্গে ধরি'
অশোকদ্রুম নব পল্লবে গিয়াছে ভরি'।
অশোকের পানে চাহিয়া আজিকে বিরহিণীর
সশোক হৃদয় গলিয়া বরিষে নয়ননীর।
মত্তদ্বিরেফ-পরিচুম্বিত পুষ্পিত চূততরু চপল
মন্দমলয়াকুলিত যাদের প্রবালদল,
তারা আজ করে কামিজনমন সমুৎসুক
বিরহিজনের পুড়ায় বুক।

অনলের মত শিখা বিস্তারি কর্ণিকার
করিছে তাহারে ভস্মসার।
পিককণ্ঠের স্বর-শর কেন তাহার পরে?
মৃত যেবা সে কি আবার মরে?
কোকিলকুজনে মধুপকুলের গুঞ্জরণে
জাগে চাপল্য লজ্জাবিনীতা কুলবালাদেরও সরল মনে।
নীহারমুক্ত সমীরণ সুখস্পর্শ আজি
কম্পিত করি কুসুমিত শাখা-প্রশাখা রাজি,
বিস্তার করি কোকিলের স্বর দিগ্‌বিদিকে,
হরণ করিছে তরুণ জনের হৃদয়টিরে।

নবোঢ়া বধূর লজ্জা-মধুর হাস্যসম,
অমল ধবল কুন্দকুসুমে উপবন রাজি মানসরম।
বাসনামুক্ত মুনির মানসও করে মোহিত,
লালসারক্ত বিলাসাসক্ত তরুণের মন আগেই হৃত

নানা মঞ্জুল কুসুমে আকুল তরুলতায়,
কোকিলকুলের কলমুখরিত সানু শোভায়,
শিলাজতু-ধূলি সুরভিত শিলাসমুচ্চয়ে
অচল ভূধরো চলে যেন আজ হৃদয়-জয়ে।
কান্তা-বিরহবিধুর জনের কি দশা আজি!
নয়ন মুদিছে হেরি সে রসাল মুকুলরাজি।
শুধু আঁখি নয়, নাসিকার পথও গাত্রবাসে
করিছে বন্ধ যদি বা গন্ধ নাসায় আসে।
মুদিত আঁখির পত্রের ফাঁকে অশ্রু ঝরে
ক্ষুধিত হৃদয়ে বিলাপ করে।

আম্র মুকুল শায়কে যাহার পূর্ণ তূণ,
অলিমালা যার ধনুগুর্ণ,
নব কিংশুক কুসুমে রচিত ধনু যে ধরে
সিতাতপত্র নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক যার মৌলি 'পরে,
নান্দীগায়ক বন্দী যাহার কলকোকিল
গজযূথ যার মলয়ানিল,
অঙ্গে যাহার মধু-বিরচিত রম্য সাজ
ত্রিলোকবিজয়ী সেই অনঙ্গ রাজাধিরাজ
করি প্রসন্ন দৃষ্টি দান,
করুক তোমার শুভ বিধান॥

কাঁটাল

কাঁটাল তোমারে পাঁঠা ছাড়া আর কে না বলো ভালবাসে?
বারোমেসে কেন হলে না? কেবল পাই যে আষাঢ় মাসে।
তুমি যে আমার জন্মমাসের ফল,
বাল্যে আমার লীলাভূমি ছিল তোমারি গাছের তল।
ফলরাজ্যের ভূপ,
পশুর মধ্যে গজরাজসম তোমার বিশাল রূপ।
তব মধুরস আস্বাদনের শখে
কিলায়ে কিলায়ে পাকাতে যে চায় সেই বোকা শুধু ঠকে॥

সেয়ানা লোকেরা বোকার মাথায় তোমারে ভাঙিয়া খায়
একেবারে বোকা ঠকে না, গড়ানো রস কিছু কিছু পায়।
সাধলে জামাই খায় না সে রস লজ্জা বা অভিমানে,
শেষে সে বেচারা ভুঁতিও পায় না একথা সবাই জানে।
গাছে রও যবে দিন দিন তোমা দেখে
শ্বশুর তাহার গোঁপে দেয় তেল বৈশাখ মাস থেকে॥

থাক এবে পরিহাস।
বোধ হয় জানো মাংস খায় না আমাদের হরিদাস।
মাংসের স্বাদ জানিতে বাসনা, মুখে ঝরে তার লাল,
খাওয়ানো হইল তাহারে রাঁধিয়া কচি ইঁচড়ের ঝাল
খেয়ে তার গায়ে জাগিল পুলকে তোমার মতন কাঁটা,
সেই হতে তব নাম হ'ল গাছপাঁঠা॥

আসল কথাই বাকি,
অমৃতই হয় তোমার সুরস ঘনত্বুধে যদি মাখি।
গুরুপাক বটে, দেবের ভোগ্য হবেই ত গুরুপাক!
আচ্ছা সে কথা থাক!
আর সব ফল শুধু ফল আর একা তুমি 'ফলাহার'
তোমা ভেঙে দিলে ফলারে বামুন কিছুই চাবে না আর॥

এত ফল আছে সুরভিত লিপি বহি কার সমীরণ
পাড়ায় পাড়ায় পাঠায় নিমন্ত্রণ?
সৌরভ তব ফুলসৌরভে গৌরবে করে জয়
তাই চুরি করি সে গন্ধ চাঁপা কাঁটালিয়া-চাঁপা হয়॥

এত ফল আছে আঁঠি কার এত মিঠা?
ভাদ্রমাসের পাকশালে তা যে পৌষ মাসের পিঠা।
মায়ের হাতের তালবড়া সাথে তোমার সে বীচিভাজা,
মায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো এখনো সে স্মৃতি তাজা—
থাক সেই কথা! পড়ে যে দীর্ঘশ্বাস,
জিভে জল সহ চোখে জল এসে ঘটায় যে রসাভাস॥

যাক এবে শেষ করা
বহিরঙ্গটি কর্কশ তব ঘনকণ্টকে ভরা;
অন্তর তব বড়ই পেলব রসময় স্বভাবতঃ,
কাঁটালপাড়ার সেই মিঠেকড়া হাকিম বাবুরই মতো॥

কবিবর কুমুদরঞ্জন

ঐ—মোহন বেণুতে কেবা গান গায় ধেনুচরা মাঠ ভরিয়া ?
টানে মাঠপানে হাটের পশারী ধরিয়া ?
এ কোন বাউল পল্লী-তুলাল,
এ কোন ব্রজের গোঠের রাখাল ?
নীলকণ্ঠের লীলার কণ্ঠ শুনি যে নতুন করিয়া।
নতুন জনম লভিল কি দাশু মরিয়া ?

কে তুমি এনেছ মথুরার দ্বারে গোপিকা-মথিত নবনী,
বনফুল আর শিখিচূড়া, ধড়া পাঁচনী ?
কে তুমি এনেছ সিত শতদল
দূর্বার দল ঘনশ্যামল,
তুষার-শীতল সমীর-বাহিনী উশীরমূলের ব্যজনী ?
তব চোখে ধরে যশোদার রূপ অবনী ॥

তোমার সঙ্গে কোন বনবালা অতসী-খচিত কবরী,
তনুতটে যার উছলে যমুনা-লহরী ?
মুখর শুকে সে কোথা পেলু বনে
ধরিয়া আনিল নগর-তোরণে,
গন্ধে চিনেছি কস্তুরী-কলি এনেছে বাকলে আবরি'
চামরহস্তা তোমার সাথের শবরী ॥

তোমার গাঁয়ের শিশিরকণারা মুকুতা কি হয় জমিয়া ?
সেথা কি বধূর কলসের জল অমিয়া ?
সেথায় হর্ম্যছায়া পড়ি রাকা-
কৌমুদী বুঝি পড়ে না-ক ঢাকা।
উদার আকাশে পাখী হয়ে হৃদি পাখা মেলি গায় ভ্রমিয়া।
পড়ে ভুঁয়ে ধান দেবালয়ে প্রাণ নমিয়া॥

ওগো রঞ্জন, হৃৎপল্বলে সুরভি কুমুদ ফুটালে,
আঁখির উজানি ধারাকে উজান ছুটালে।
হাঁস পারাবতে প্রাণের খামার
সোনার ধান্যে ভরে যে আমার,
আফল খেলে এ মনোমীন, তারে নগরের জাল টুটালে
তাপিত এ চিতে শেফালি শয়নে লুটালে॥

এস কবি এস, বরিব তোমায় বনতুলসীর কাননে।
হরিপদ-নখ-দীপ্তি তোমার আননে।
বাহুদুটি দিয়ে রচি নবহার
দিব উপহার কণ্ঠে তোমার,
ফুটালে যে হরিচন্দনরস আমার শুষ্ক নয়নে,
তারি অনুলেপ দিব তব দুটি চরণে॥

দ্বিজেন্দ্রলাল

শতবর্ষ পরে তব নবজন্ম মোদের স্মরণে,
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে দিকে দিকে তোমার বরণে।
শতবর্ষ শতদলে দেশের মানস সরোবরে
আজি তুমি সমাসীন হৈম বীণা করে
দিব্য-জ্যোতির্বলয়িত। এই রূপই শাশ্বত তোমার,
সঞ্চিত মালিন্য গ্লানি মুক্ত হ'ল বহুদিনকার
হেরি সেই দিব্যরূপজ্যোতি অপ্রমেয়,
বরাভয়ে শ্রেয়োধনে পুন দেশ লভিল পাথেয়।
মরদেহ তিরোহিত। তোমার অমর অবদান
বর্ষে বর্ষে সারা দেশে হইতেছে উপচীয়মান।
মণিকাঞ্চনের যোগ অলৌকিক বাণী আর সুরে
ধ্বনিত ঘোষিত আজ সারস্বত বিশ্বভূমি জুড়ে।
তব নাট্যে গীতে জাতি চিনিয়াছে দেশমাতৃকারে,
জিনিয়াছে ক্লৈব্য-দৈন্য, ফেরু-বৃত্তি, মূঢ় ভীরুতারে ;
মুক্তির সংগ্রামে
দৃঢ় করিয়াছে ব্যূহ দক্ষিণে ও বামে।
রাজপুত বীর-ধর্মে দীক্ষা দিলে এ মূঢ় জাতিরে,
তাই রণভীরু দেশ ভরিয়াছে শত শত বীরে।
যে জাতি ভুলিল হাসি সে জাতির তরে
হাসির ভাণ্ডার তুমি রেখে গেছ রসিকের ঘরে।
মিথ্যাচার কপটতা ভণ্ডামির পিঠে
তব ইক্ষু-দণ্ডাঘাত জ্বালাময়, কিন্তু তবু মিঠে।
সার্থক হয়েছে তব সারস্বত তপ,
দিব্যলোক হতে হের করে দেশ তব নাম জপ ॥

সুপ্তা

ঘুমাও ঘুমাও ভাঙাব না তব মধুর ঘুম,
যদিও পিয়াসী, লঘু পরশেও খাব না চুম।
নিদের অঙ্কে সুখ-পালঙ্কে শয়ান সখি,
রূপটি তোমার অনিমেষ চোখে শুধু নিরখি।
আত্মা তোমার স্বপ্নলোকের এবে পথিক,
সে স্বপন তব রূপেরে করেছে অলৌকিক।
সে স্বপন তব পার্থিবতাও হরেছে হেরি
জ্যোতির্বলয় করেছে রচনা তোমারে ঘেরি'।
নিদের বৃন্তে ফুল্ল ও রূপ ফুলের মতো,
নিশ্বাসে তাই সৌরভ হয় বিনির্গত ॥

সদ্যঃস্নাত রূপটি তোমার দিব্যরুচি,
পূজার দেউলে রূপটি তোমার পুণ্য শুচি।
গৃহকাজে রত রূপটি তোমার মধুর বড়,
থালি হাতে তব অন্নদারূপ মধুরতর।
সহসা আজিকে করিলাম প্রিয়ে আবিষ্কার,
সুপ্ত তনুর রূপটি তোমার সেরা সবার।
দেবী, সখী, দাসী—সুন্দরী, তাহা স্বীকার করি,
এই রূপে তুমি স্বপ্নলোকের বিদ্যাধরী।
এইরূপ শুধু চেয়ে দেখিবার জুড়াতে আঁখি
তাই আঁখি দিয়া অই রূপ শুধু পিইতে থাকি ॥

শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ

অশ্বারোহণে ছুটেছে মৃগয়া-বীর।
বার বারই তার ব্যর্থ হয়েছে তির।
ছুটেছে হরিণ আগে আগে, তার নাইক' অব্যাহতি,
প্রাণভয় তারে দিয়াছে আজিকে বিদ্যুৎসম গতি।
বহুবহুদূর করেছে অতিক্রম,
ক্লান্ত করেছে চারি চরণেরে দারুণ পথিশ্রম।
সম্মুখে উঁচু পাহাড় হেরিয়া উঠিয়া তাহার শিরে
এড়াইল শিকারীরে।
তৃষ্ণা তাহার জিনেছে মরণভয়,
এক মুহূর্ত ত্বরা নাহি আর সয়।
সানুদেশে তার তৃষিত হরিণ উৎসের জল দেখে,
তিনটি লম্ফে ঝাঁপিয়ে পড়িল পাহাড়ের চূড়া থেকে।

স্বচ্ছশীতল উৎসের জল জমেছে গর্তে এসে,
নাসাগ্র তার তারি কিনারায় ঘেঁসে
শেষ নিশ্বাসে বিমোচিল তার প্রাণ।
হেরিল শিকারী গর্তের জল তখনো স্পন্দমান
শেষ নিশ্বাসে তার।
করিল শিকারী উল্লাসে হুঙ্কার,
যেন কত বড় রণ
বিজয় করেছে এমনি তাহার দৃপ্ত আস্ফালন।
বনের মৃগের এতই স্পর্ধা তার মত বীরবরে
সারাটি দিবস ছুটায়েছে বৃথা বন-গিরি-প্রান্তরে!

Wordsworth-এর Hart Leap Well পাঠে

শুনিল না হায় প্রকৃতি মাতার বেদনার হাহাকার।
অট্টহাস্য করিল সে বার বার!
নিরীহ অবলে বধিয়া সবলে যুগে যুগে দেশে দেশে
বীর গৌরবে মেতেছে মানুষ এমন হাসিই হেসে।
তৃষ্ণার জল ঠোঁটে না ঠেকিতে বাছা যার গেল মরি
তাহার বিলাপ কবিরে কাঁদায়। এই চিত্রটি স্মরি'
কবির নয়নে গভীর শোকের অশ্রু পড়িল ঝরি'।
প্রতিবিন্দুটি তার
শ্লোকের মুকুতা হইয়া রচেছে বাণী-কণ্ঠের হার॥

তবু ভাল লাগে

রবীন্দ্রনাথের গানে পরিতৃপ্ত কান,
তবু ভাল লাগে আজো নিধু-দাশু-শ্রীধরের গান
কতই বিলাস-হর্ম্যে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভাল লাগে সেই তকৃতকে বেঁশো ঘরখানি,
পাঁশ-ঢিপি বাঁশঝাড় কলাবনে ঘেরা
বাঁধা যার চারি পাশে রাঙচিতা বেড়া॥

কত নব নব বেশে হেরিলাম নাগরীর দল,
লজ্জার বদলে সজ্জা যাদের সম্বল।
তবু ভালো লাগে সেই নিষ্ঠাবতী কুলের ললনা
মাতৃ-মমতায় স্নেহে করুণায় সজল-নয়না।
যাহাদের অঙ্গে কোন নাই আভরণ,
ধরণীরে ধন্য করে শুধু লাক্ষা-রঞ্জিত চরণ॥

রজনী দিবস আজি বনিয়াছে বিদ্যুৎ আলোকে
আলোর ছটার শিল্প হেরি আজি চমকিত চোখে
তবু ভালো লাগে সেই দীপখানি তুলসীর তলে,
সাঁঝে যাহা মিটি-মিটি মিঠি-মিঠি জ্বলে ॥

আজিকে কত না যানে করি আরোহণ,
তবু ভালো লাগে সেই গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ভ্রমণ।
কত শাল-দোশালায় মুড়ায়েছি আমার শরীর,
তবু ভালো লাগে সেই কাঁথাখানি মোর জননীর
সূচি-শিল্পে কুসুমিত শুচি।
অমার্জিত অনুন্নত হায় মোর রুচি।
ঘরে ঘরে সোফা কোচ দামী আস্তরণ,
তবু ভালো লাগে সেই দীঘি-পাড়ে দূর্বার আসন ॥

ভূরিভোজে খুরিভরা সুখাদ্য কত না
তৃপ্ত করিয়াছে মোর লোলুপ রসনা,
তবুও মোচার ঘণ্ট ভালবাসি আমি
শচী মা-র হাতে রান্না যে ব্যঞ্জন শ্রীরঙ্গম স্বামী
জীবনে যাননি ভুলে, চৈতন্যের সাথে
ঘটাল যা পরিচয় স্বামীজির প্রথম সাক্ষাতে ॥

শুনি নাকি হইয়াছি অধিকারী বিশ্ব-সভ্যতার,
বাঙ্গালী আমি যে তাহা কী আছে উপায় ভুলিবার
ভুলিতে পারিনি আমি তা'ত।
এ সভ্য সমাজ-মাঝে তাই আমি ব্রাত্য অবজ্ঞাত ॥

রসাবেশ

পড়িতেছি বই খুলি গুরুর কবিতাগুলি
বহুদিন আগে ছিল পড়া !
আমার যৌবনে দেখা কবির যৌবনে লেখা
আঙ্গুরের মত রসভরা।
যৌবনের দিনগুলি রসের তুফান তুলি
হৃদয়ের তটে এসে লাগে।
ফিরে যাই সেই ঘরে বিছানো মাতুর 'পরে
পঞ্চাশ বছর কাল আগে।
পিয়ারা গাছের ডালে তরুণ পল্লবজালে
খেলে যেত ছায়া আর আলো,
ভিজিত চোখের কোণা, কলেজের পড়াশোনা
একেবারে লাগিত না ভালো।
পাখীরা নতুন সুরে ডাকিত নিকটে দূরে
জাগাইয়া নতুন পিয়াস,
মনে হ'ত কি যে নাই কি হারানু কি যে চাই,
পড়ে কেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস !
মনে মুকুলিত আশা ফুটিত না তার ভাষা
কবিতা লিখিতে হ'ত সাধ !
সৃজন-বাসনা মোর ত্যজি যোগনিদ্রাঘোর
জেগে উঠে গণিত প্রমাদ।
বহু বর্ষ হ'ল গত সে দিনের স্মৃতি যত
মুছে গেছে, আছে শুধু রেশ।
জীবনের গোধূলিতে আবার জাগিল চিতে
পুনঃ সেই প্রভাতী আবেশ ॥

পত্রপুট

দুই ছত্রের পত্রেই ভাই করেছ তো দায়সারা
আফিসে বসিয়া মেমো লিখেছ কি পেয়ে মনিবের তাড়া ?
লিপি ত শুধুই মসীরেখা নয়, হৃদয়-চন্দ্রমার
মানস নয়নে শশিলেখা রূপে নিভৃত উদয় তার।
যে পায় পত্র সে চায় তত্র তব হৃদয়ের ছাপ,
তথ্যের সাথে পত্রের পাতে দরদের উত্তাপ।
তোমার প্রীতির পারাবতটিরে পত্রের ফাঁকে খুঁজে,
চায় যেন সেটি এসে তার নীড়ে কূজে॥

পত্রের সাথে পুষ্পও করি আশা,
শুনিতে চাই না শুষ্কপত্রে শুধু মরমর ভাষা।
যাতে প্রীতিভরা আঙুলগুলির পরশন নাহি থাকে,
তারে বলি আমি কলমের খোঁচা, পত্র বলি না তাকে॥

ডাকহরকরা আমার নয়নে হংসদূতের মত,
নিত্য তাহায় জানাই সুস্বাগত।
তার কাছে চাই মৃণালকন্দ মানস-সরসীজাত,
গুগুলি শামুক তার কাছে চাহি না ত॥

সাহিত্য রচা সে ত ক্ষণেকের শিল্পীর অভিনয়,
পত্রেই মিলে আসল সহজ মানুষের পরিচয়।
তার কল্পিত বহু চরিত্র সাহিত্যে ফুটে উঠে,
নিজ চরিত্র ফুটে পত্রের পুটে।
আসল শিল্পী রসিক তারেই বলে
পত্র যাহার ফ্রেম দিয়া ঘরে বাঁধাইয়া রাখা চলে।
পত্র যাহার নয় সাহিত্য সে নয় সাহিত্যিক,
সাহিত্যে তার ব্যবসায় ছাড়া নয় কিছু তদধিক॥

মূর্খ-প্রশস্তি

মূর্খ তোমা নমি,
বিদ্বানে ক্ষমি না হ'লে অপরাধ, তোমা কিন্তু ক্ষমি।
অন্নে অধিকার জন্মে ঘর্মপাতে শ্রমমূল্য দিলে—
তুমি জানো, তাই তুমি বসুধারে অন্নদা করিলে।
পাপের তাপের গণ্ডী ঢের ক্ষুদ্র, তাই তুমি সুখী,
জানো নাক' জটিলতা, জালিয়াতী, কূট, ফাঁকিজুকি।
অগাধ বিশ্বাসশক্তি শিশুসম পাইয়াছ তুমি,
চিত্ত তব ধর্মবীজ বপনের উপযুক্ত ভূমি।
মৃত্যু ঘনাইলে দিন গণো নাক' তুমি বসি বসি।
যখনই আহ্বান আসে তখনই শৃঙ্খল পড়ে খসি'॥

কোরো নাক' শোক,
রয়েছে তোমার দলে ইতিহাসে বড় বড় লোক।
মহীশূর রাজ্য গড়ে মহাশূর মূর্খ হায়দর,
আদর্শ সম্রাট-শ্রেষ্ঠ এ ভারতে মূর্খ আকবর।
গড়িল বীরের জাতি পঞ্চনদে মূর্খ রণজিৎ,
মূর্খ শিবাজীর চেয়ে বীরলোকে কাহার চরিত?
সব চেয়ে বড় কথা মূর্খ এক পূজারী ব্রাহ্মণ
সকল জ্ঞানীর গুরু বিশ্ব-পূজ্য নর-নারায়ণ॥

ভগবানে পেতে হলে অকপটে ঘুচায়ে সংশয়,
ভুলিয়া সকল বিদ্যা শুদ্ধচিত্তে মূর্খ হতে হয়।
চরম বিচার দিনে জ্ঞানপাপী কভু নাহি বাঁচে।
তুমি যদি কর পাপ, ভ্রান্তি বলি গণ্য তাঁর কাছে।
পণ্ডিতের যুক্তিজাল মুক্তিপথে মূল্য নাহি পায়,
তোমার করুণ আঁখি কাণ্ডারীর হৃদয় গলায়॥

রসজ্ঞের প্রতি

বিদ্যার জাহাজ নও, খাঁটি বাংলা কথা কও,
পদ-গর্ব কিছু তব নাই।
যত হও অর্বাচীন আপনাকে ভাব হীন,
রসবোধে তোমাকেই চাই

কবিতা শুনাতে হলে যেতে হবে কোন টোলে ?
বুঝিতে কি লাগিবে ডি-ফিল ?
এসেম্ব্লি কাউন্সিলে কোথায় রসিক মিলে ?
চাই হাইকোর্টের উকিল ?

খুব বড় অফিসার না হলে কি অধিকার
হয় নাক কবিতা বুঝিতে ?
কাননে কুসুম ফুটে ভ্রমর আপনি জুটে
সে কি যায় তাহারে খুঁজিতে ?

এস বন্ধু এস কাছে, তোমার হৃদয় আছে
চুলচেরা কর না বিচার।
আঙুর পাইলে হাতে করো নাক পরীক্ষাতে
রসায়নী বিশ্লেষণ তার।

হৃদয়ে করিয়া হেলা চাহিনা বুদ্ধির খেলা,
চাই আমি হৃদয়েরই সাড়া।
তুমি এসো তুমি শোনো—শ্রোতা মোর আর কোনো
না হলে চলিবে তুমি ছাড়া।

ষাটের পরে

পিওন হাঁকিয়া দিয়ে যায় যদি 'তার'
ভাবি এলো বুঝি বিপদের সমাচার।
হাত কাঁপে মোর খুলিতে চিঠির খাম,
হয়ত দেখিব আনে কোন হাঙ্গাম॥
পরিজনগণ জোরে যদি কথা কয়,
ভাবি বেধে গেল ঝগড়াই নিশ্চয়।
শিশুদের কেউ হাঁচে যদি তুইবার
বলি ভয়ে ডাক এক্ষণি ডাক্তার॥
একদিন যদি করে কেউ জ্বর ভোগ
ভাবি হ'ল নাকি অসাধ্য কোন রোগ।
রক্তের চাপ মাপাই না একেবারে,
জ্বর হলে হার্ট দেখাই না ডাক্তারে॥
বাড়ীর সকলে ফিরে না যতক্ষণ,
উদ্বেগে রই কাজে লাগে নাক মন।
দূরে যদি কভু যেতে হয় একবার,
বেলা নয়টায় ট্রেন যদি থাকে তার,
সারা রাত্রিটা জেগে বসে রই ঠায়,
তু'ঘণ্টা আগে পৌঁছাই হাওড়ায়॥
ষাটের উপরে যত দ্বিধা ভয় জুটে
ভয়ে কাঁপি যেন কুতবমিনারে উঠে।
হাসি পাবে জানি এতে যত তরুণের,
ষাটের বাছারা বুঝিবে মর্ম এর॥

নামাবলী

বড় উৎপাত করিয়া গিয়াছে সাহেবেরা আসি মোদের দেশে।
ভাবিলাম আমি কবিতা লিখিব গালাগালি দিয়া তাদেরে ঠেসে।
লিখিতে যাইয়া কই আর মোর কলম সরে?
কবিতা আমার শেষে তালিকার রূপটি ধরে॥

মনে পড়ে যায় জোন্স, কোলব্রুক, গ্রিয়ারসন ও রিচার্ডসনে।
কেরি, মার্শম্যান, এলফিনষ্টোনে, টড, উডরফে পড়ে যে মনে।
মনে পড়ে যায় বেথুন, হেয়ারে, স্মিথ, মনিয়ার, কানিংহামে।
এমনি কতই জ্ঞানগুরুগণ দাঁড়ায় আমার ডাইনে বামে॥

মনে পড়ে যায় এনি বেশান্তে,—রিপন, কটন পড়ে না বাকি,
রেভারেণ্ড লঙ্ উঁকি দেয় মনে জেলের ভিতরে বন্দী থাকি।
এনড্রুজ আর পিয়ারসনের সাথে কত মুখ, চিনিনা সব,
মনের নয়নে হেরি গুরুদেবে করিছে স্তব॥

মনে পড়ে যায় নিবেদিতা মায়, কলমে আমার সরে না কালি।
গালির ভাষার থলি যে খালি।
সবশেষে মোর দুই গুরুদেব হুইলার আর ষ্টিফেনে স্মরি'
গালির পালাটি সাঙ্গ করি॥

সংসারী

উদ্বেগ অশান্তি দৈন্য ব্যাধি জরা নানা দুঃখ শোক।
তার মাঝে লয়ে অশ্রুবিগলিত চোখ—
ক্ষুধায় দিনের পিণ্ড না গিলিলে নয়,
স্নানান্তে বসনান্তরও পরিতেই হয়।
এলে বন্ধু প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন,
তারেও করিতে হয় মিষ্ট ভাষে শিষ্ট আপ্যায়ন॥

নিত্যকার দাবি যত সামাজিক জীবনধারায়,
সকলি মিটাতে হয় কড়ায় গণ্ডায়।
মর্মপীড়া যত হোক কর্মধারা করে না ত ক্ষমা
অক্ষমেরে। যত কাজ হয়ে থাকে জমা
সকলি সাধিতে হয় শ্লথ হস্তে, যদিও দুর্ভর,
কোন কাজই হয়নাক সর্বাঙ্গসুন্দর।
সদ্যঃপুত্রশোকাতুরে রুদ্ধ করি অশ্রুর উৎসার,
বহিতে সহিতে হয় নিত্য কর্মভার।
শুধু পড়ে দীর্ঘশ্বাস, কাঁদিবারও পায়না সময়,
সংসারী সে। নাই গৃহে দিবসের অন্নের সঞ্চয়॥

ঘটে কাজে কত ক্রুটি, ঘটায় তা নব বিড়ম্বনা,
যতটুকু ভুলায় বেদনা
তার চেয়ে ঢের বেশি ঘটায় তা ভুল,
শেলাহত বুকে যেন শূল।
কর্ম যেন মূলধনী প্রভু
কিণাঙ্ককঠিন চর্ম। মর্ম তার গলেনাক কভু।
শত দুঃখ শোকে এই নিত্য কৃত্যপালনের দায়
সব চেয়ে সংসারীরে করে নিরুপায়॥

পৌষের গান

এলো ফিরে পোষ মাস, আষাঢ়ের জমিচাষ,
শাওনের ভাদরের যত আশ ফল্‌লো।
সবুজ সে হলো সোনা, যত বীজ হলো বোনা
শতশত হয়ে তারা গাঁ-র পানে চল্‌লো॥

কাটা ধান গাড়ী গাড়ী চলে যায় বাড়ী বাড়ী
নিকানো চুকানো সাফ তকতকে খামারে।
তাড়াতাড়ি এত কেন, শীষ ভাঙেনাক যেন,
বাপ কয় সাবধানে গাড়ী থেকে নামা রে॥

চারিদিকে কল হাসি, ধান কেটে যায় চাষী,
ফাঁকা মাঠ একে একে ভরে উঠে ধেনুতে।
মিঠে রোদে সারা বেলা রাখালেরা করে খেলা,
গাছতলে কেউ কেউ তান ধরে বেণুতে॥

কৃষাণীরা ভাজে খই, বাঁধে নাড়ু, পাতে দই।
সকলেই খুব খুশী মওয়া আর পায়েসে।
সারা বছরের পরে অভাব ঘুচেছে ঘরে,
পোষ মাস কাটে বেশ হেসে খেলে আয়েসে॥

মা-র মুখে মিঠে বুলি, শিশু খায় পিঠে পুলি,
বাবা বলে, খাও তবে খুব বেশী খেও না।
শাঁখ বাজে বারে বারে, আলপনা ঘরে দ্বারে
গায় সবে পোষ মাস তাড়াতাড়ি যেও না॥

কৈফেয়ত

যা কিছু জেনেছি, যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু পেয়েছি, পাবো,
না করি বিচার সকলি তাহার ছন্দে গাঁথিয়া যাবো।
ছন্দে রচিত জীবনচরিত ছড়ানো পুঁথির পাতে,—
আমারি কি শুধু? কতটুকু মোর তফাৎ তোমার সাথে?
সবই ত সরস কবিতা হইবে এমন কি আছে কথা?
কোনটি খেয়ালই, কোনটি হেঁয়ালী, কোনটি বা বাচালতা।
কোনটি কেবল সুরভাঁজা, আর কোনটি হয়ত নীতি।
কোনটি ব্যঙ্গ, ইঙ্গিত কেউ, কোনটি পুরানো স্মৃতি।

আমার কল্পকাননে সতত বিরাজিছে ঋতুরাজ,
সকল গুল্মলতিকা পরেছে উৎসবোচিত সাজ।
কাঙালিনী মেয়ে ভিক্ষার দান জড়ায়ে পরেছে গায়,
পুঁই-মেটুরীর রঙিন রসে সে আল্‌তা এঁকেছে পায়।
মাঠের মজুর শুধু রঙ-করা গামছা ফেলেছে কাঁধে,
রাখাল শুধুই বাবরীতে চাঁপা গুঁজেছে নতুন ছাঁদে।
তাই ব'লে আমি ভাবিতে পারি না তারা না আগুনে রয়,
সবার মিলনে উৎসব এটা ধনী-মজলিস্ নয়॥

দোপাটীর বন লোপাট করিয়া শিমুলে নির্মূল ক'রে
দ্রোণে দলি পায় অপরাজিতায় পরাজিত করি জোরে,
বেলা চম্পকে মল্লীতে শুধু বনভূমি র'বে সাজি,
এ বিধি বিধানে আর যেই হোক ঋতুরাজ নয় রাজী।
শুক্‌নো গাছের ডালে ডালে উঠে ঝিঙাফুলও করে আলো,
এমনো দেবতা আছে যে গরল-ধুতুরাই বাসে ভালো॥

কৃষকের শোক

এমন ক'রে কেমন ক'রে আঁধার ঘরে আর
তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার?
দুয়ারে নেই জলের ছড়া—উঠানে নেই ঝাঁট,
বিহানে আর গোয়াল ঘরে করে না কেউ পাট।
গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয়না গাই দোয়া,
খামার ক্ষেতে তোমার ধান খড় যে যায় খোয়া।
গোয়ালে নেই সাঁজাল ধোঁয়া, জ্বলে না ঘরে সাঁজ,
মাদুর পেতে কে দেবে? শুই গামছা পেতে আজ।
বারেক ফিরে এসে
লক্ষ্মী মোর লওগো ভার তোমার ঘরে হেসে॥

একটি বাছা ধুলায় কাঁদে, আরটি রয় কাঁখে,
তিলেক পিছু ছাড়ে না খুকী, মাঠেও সাথে থাকে।
ক্ষেতের ধারে খোকাটি যায় নালায় গড়াগড়ি,
সকল কাজে অবুঝ মেয়ে ঘাড়েই রয় পড়ি।
টোকায় করি বিহানে তারা পায়না মুড়ি লাড়ু,
নেইক নাওয়া সময়ে খাওয়া, ঘুমটি নাই কারু।
দুপুর রাতে উপুড় হয়ে কেঁদে সে তোমা চায়,
উদুম গায়ে কাঁপে যে জাড়ে দোলাই সে না পায়।
বারেক ফিরে এসে
তোমার ছেলে লওগো কোলে বদন চুমি' হেসে॥

নিড়ানী হাতে আখের ক্ষেতে কাদাতে রই ব'সে,
পায়ের চাপে ডোবে না তুনী, কোদাল পড়ে খ'সে।
কাঁদ-কাঁদ' সে কাজল আঁখি মনে যে ওঠে জ্বলে,
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা ব'লে।
বাড়ীতে ফিরে জিরানো নাই, চড়াতে হয় হাঁড়ী,
যে-কাজ শুধু তোমারে সাজে আমি কি তাই পারি ?
হারাই হুঁস হেঁসেল ঘরে কিছু না খুঁজে পাই,
ফেনে যে ঢালি মুনের সরা, ডা'লে যে ঢালি ছাই।
বারেক ফিরে এসে
হলুদপোঁছা শাড়িটি পরি' হাতাটি ধরো হেসে॥

কল্‌কা পেড়ে তোমার ডুরে আঁকড়ে চেপে ধরে'
চোখের জলে অঝোরে ভিজে মেঝেয় রই পড়ে।
কার কোমরে সোহাগ ভরে পরিয়ে দেব গোট,
যার লাগিয়ে আর ফাগুনে ধরেছিলে সে খোট ?
মনে যে আসে রোগের মাঝে সকল-সওয়া মুখ,
পায়ের-ধূলো-মাথায়-লওয়া, গুমরে ওঠে বুক।
বাদলে ভিজে হেঁটেছিলে যে উঠানে মোর লেগে,
ফুটে যে আছে পায়ের দাগ গোলার পাশে জেগে।
বারেক ফিরে এসে
আলতা প'রো আরশী ধ'রে খোঁপাটি বাঁধো হেসে॥

উদয়শঙ্কর

শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর শিল্পী, তব সৃষ্টি উপাদান
পৃথিবীর কোন বস্তুপুঞ্জে তুমি করনি সন্ধান।
যে প্রতিভা নিয়ে তুমি একদা জন্মিলে শুভক্ষণে
তাই সাথে নিয়ে এলো সবই দিব্য তনুর বন্ধনে॥

প্রমূর্ত সঙ্গীত তুমি সুরচ্ছন্দোহিল্লোলে কম্পিত
তব তনুতটে নবরস সম্মিলিত।
তাহাতে অদ্ভুত রস সর্ব রসে করেছে বিজয়,
প্রতি পদক্ষেপ তার তাই চিত্তে জাগায় বিস্ময়।
নিত্য নব লীলাভঙ্গী সে তনুর তব
চির বসন্তের যেন পুষ্প নব নব,
তাহাই সঁপিছ নৃত্যগোপালের পায়,
রসলক্ষ্মী যশোমতী মুগ্ধ নেত্রে তোমা পানে চায়॥

নটরাজ নৃত্য করে তাই বিশ্ব উত্থানে পতনে
সৃজনে বিলয়ে আর আবর্তনে ক্রম-বিবর্তনে
বিচিত্র অদ্ভুত এত! সেই নৃত্যোৎসবে যোগদান,-
কোন্ উপাসনা আছে তাহার সমান?
সে উৎসবে তুমি পুরোহিত,
স্থাবরও জঙ্গম হয়ে যোগ দেয় তোমার সহিত।
আমরা ললাটে হস্তে করি তাঁরে প্রণাম বন্দনা,
সর্ব অঙ্গ সমর্পিয়া কর তুমি তাঁহার অর্চনা।
ধূপে পুষ্পে করি মোরা মন্দিরের গন্ধাধিবাসন,
চন্দনক্রমের মত সারা অঙ্গ তব নিবেদন॥

একটি গান শুনে

'স্নেহ বিহ্বল করুণা ছল ছল'
গায় কে রেডিয়োয় আহা রে।
আমার হৃদয়ের আকূতি বিগলিত
জানাই দূর থেকে তাহারে।
শুনিনু এই গীতি কবির কণ্ঠেই
উছল মাধুরীর লহরে
বছর পঞ্চাশ আগে, তা মনে পড়ে
একদা রাজশাহি শহরে।
পূরব জনমের স্মৃতির মতো যেন
মানসে হয় মোর উদিত,
সে গান শুনি মোর ঝরিল আঁখি লোর
নয়ন হয়ে এল মুদিত।
সে গান সেতুসম কবির সাথে মম
গভীর স্নেহময় মিতালি
আবার রচি দিল, হৃদয়ে দেয় সাড়া
তাঁহারি আরো কত গীতালি।
ফাগুনী প্রাণে মোর তখন জাগাইল
জীবনে কত আশা ভরসা।
ভরেছে মেঘে মেঘে পবন বয় বেগে
জীবনে আজ ধারা-বরষা।
এমন বরষায় কে আজি শুনাইল
আবার ফাগুনিয়া কাকলী,
ফিরায়ে নিয়ে গেল সে ভোলা যৌবনে
তুলিল এ হৃদয় আকুলি' ॥*

---

* কান্তকবি রজনীকান্তের উদ্দেশে

শ্রোতা ও সন্ধানী

অনেক কথাই বলিয়াছি আমি জীবন ভরি
সে সব অসার ফেনোচ্ছলা,
আজি জীবনের দিবা অবসানে স্মরণ করি—
আসল কথাটি হয়নি বলা।

গুছায়ে বলিব একদা ভাবিয়া, মরম মাঝে
রাখিনু তাহারে শাসন করি।
অশোকবনের সীতার মতন রহিল তা যে
মুক্তির আশা পোষণ করি।

যদিও পাইনু ভাষা তার, খুঁজে পাইনি শ্রোতা,
হয়নিক বলা কাহারো কানে,
আজি খুঁজে মরি হায়রে মনের মানুষ কোথা,
বলার আবেগ পীড়িছে প্রাণে।

বচনের রাশি জমা হয়ে আছে, কখন, কারে
হয়ত বলেছি অসাবধানে,
বচনের স্তূপ খুঁজিলে হয়ত মিলিতে পারে
সন্ধানীদের প্রাণের টানে।

যায় না আসল কথা বলা শুধু শ্রাবক পেলে,
বৃথা শ্রোতা ডেকে বলিতে যাওয়া।
কবিও জানে না কখন সে কথা বলিয়া ফেলে,
সন্ধান ছাড়া যায় না পাওয়া॥

পক্ষিজীবন

বনের পাখী ছিলাম নাকি কর্‌ল মানুষ বিধি !
জীবন তাতেই হ'ল কি হায় নিধির প্রতিনিধি !
হারায়ে সেই নিধিস্থ মোর পরাণ উচাটন,
তারেই খুঁজি তার বিরহেই মন করে কেমন ॥

নীড়ের কল কূজন করে আমায় জাতিস্মর ।
হারানো ধন খুঁজে তাতে অশান্ত অন্তর ।
মন ছুটে যায় বুনো হাঁসের যেথায় কলরব,
রাঙা ফলের বটের ডালে যেথায় মহোৎসব ॥

কপোত আমায় ঢুলায় ঘুমে, জাগিয়ে তোলে কাক,
উদাস করে পরাণ আমার ঘুঘুর ঘু-ঘু ডাক ।
কেকা আমার মিষ্টি লাগে, কুহুতে চমকাই,
পানকৌড়ির ডাকে আমি কমলগন্ধ পাই ॥

চখাচখী স্মরায় আমায় সখাসখীর কথা,
ডাউক জাগায় অজানা কোন দূর বিরহের ব্যথা ।
ঝিঙের মাচায় ফিঙের নাচন মুগ্ধ করে মন,
চড়ুই করে চড়ুইভাতির নিত্যি নিমন্ত্রণ ॥

স্বপ্ন একি ? মনে যে হয় ছিলাম না এমন,
তুরন্ত আবেগে ছিল উড়ন্ত জীবন ।
মন যে আমার কুলায় ছেড়ে আকাশ পানে ধায়,
বকের পাঁতির চপল পাখায় মুক্তি সে যে চায় ॥

হেমচন্দ্র

দিব্যদৃষ্টি কল্পনা তোমার
স্বর্গ-মর্ত্য রসাতলে করিয়াছে অবাধ বিহার।
হস্তামলকিত তব, আন্তরীক্ষ কবি,
অনন্ত রোদসী সহ গ্রহ তারা ত্রিভুবন সবই।
চেয়ে চেয়ে জ্যোতির্লোকে অন্তরীক্ষ-পানে নিরন্তর
হারালে কি চক্ষূরত্ন—পরশপাথর?

তামসিকও করে তপ, তপে আছে তারো অধিকার,
দানবিক শক্তি লক্ষ্য তার।
জগতের অকল্যাণে করে তা নিয়োগ
জীবলোক করে দুঃখ ভোগ।
রাজসিকও করে তপ, তাতে যেই মহাশক্তি লভে
তার ফল ভোগ করে ঋদ্ধির গৌরবে।
শৌর্যে বীর্যে প্রভু হয়ে সমারোহে যাপে সে জীবন,
ধর্মপথে রহি করে বহুজনে শাসন পালন।
সাত্ত্বিক তপের কাম্য ভুবন-কল্যাণ
তমের প্রসার রোধে তার অভিযান।
সত্ত্বের দুশ্চর তপ তাই উগ্রতম
তাপস কঙ্কালে তাই করে বজ্রসম।
তমের সমূল ধ্বংস রজঃ একা করিতে না পারে,
সত্ত্বের তপের ফল যদি নাহি আসে অধিকারে।
তপ ছাড়া কোন স্বর্গে জন্মে না দৈত্যেরো অধিকার,
উগ্রতর তপ ছাড়া সে স্বর্গের হয় না উদ্ধার।
বহু বর্ষ আগে কাব্যে এই বাণী শুনালে এদেশে,
তারি ফল ফলিল কি শেষে?

করিল কি সেই বাণী সার্থকতা লাভ ?
এ যুগের দধীচির হলো আবির্ভাব ?
স্বর্গাদপি গরীয়সী তব মাতৃভূমি
তার উদ্ধারের ব্রতে দিয়া গেলে মূলমন্ত্র তুমি

কুশ

তুমি কৃশানুর প্রথম অর্ঘ্য, ভূমি-সিংহের কেশর-শটা,
ব্রহ্মাবর্তে শ্যাম রোমাঞ্চ, ব্রহ্মর্ষির শ্যামল জটা।
ঊষর ধূসর ভূমিরে হে কুশ, দিলে কি হরিৎ আকর্ষণী,
প্রথম আর্য গো-স্বামিগণে পাঠাইলে তুমি আমন্ত্রণী।
রচেছ আর্য অতিথির লাগি আসন, ভূষণ, উটজ-গৃহ,
যজ্ঞদেবের চরণে আহুতি বহেছ নিত্য, হে নিঃস্পৃহ ॥

বেদী-মার্জন করেছ, আর্য, ব্যজনে হরেছ তপঃস্বেদ,
তব শ্যামাঙ্গে তুলি রোমাঞ্চ উদীরিত সাম যজুর্বেদ।
শাপোদকে তুমি অগ্নিগর্ভ , কুশল ছিটালে শান্তিজলে,
সুর-তটিনীর তুমি প্রসাধনী, উপবীত তুমি বটুর গলে।
প্রেতপুরুষের ওদন-পিণ্ড নিবেদনে হ'লে তৃণাঞ্জলি,
কুশণ্ডিকায় গৃহ আঙিনায় রচিলে তীর্থ কুশস্থলী ॥

তব বুকে, কুশ, আর্যযোগীর চিৎকুশেশয় প্রস্ফুটিত,
তাদের শয্যা করিতে রচনা হ'লে কুশ তুমি কুসুমায়িত।
ছেদিলে সর্ব সংশয় তার হৃদয়-গ্রন্থি তীক্ষ্ণ ধারে,
তব জ্বলন্ত শাণিত অগ্রে বিঁধি অজ্ঞান অন্ধকারে।
সে দিনের কথা স্মরি আজ বৃথা, আজিকে তোমার কি দুর্গতি!
কিসে আজি তোমা করিল নিয়োগ আর্যগণের কুসন্ততি ?

ভগবানে ভুলে তোমার পুতুলে ভরিল তাহারা আপন গেহ।
অমৃত না পেয়ে হলো দ্বি-রসন লেহিয়া তোমার দ্বি-ধার দেহ।
কৌষেয় বাসে ঢাকিতে চাহিল তব দরিদ্র আসনখানা,
হে কুশ, তোমারে মূলধন করি হরিতে লাগিল কুশীদ নানা।
বক্ষো-গ্রন্থি আর ছেদিলে না কক্ষ-গ্রন্থি-ভেদক হ'লে
নখ-দশনের মতনই দর্ভ, জাতির মর্ম্ম ছেদক হ'লে॥

জঠর-যজ্ঞে আহুতি সঁপিতে হ'লে ঘৃতাক্ত নগরে গ্রামে,
কৌশলী-করে পিণ্ড বহিলে জীবিতের লাগি মৃতের নামে।
কুশায়ুধদের কু-শাসনে হায় কুশের 'কু' টুকু লভিল গৃহী,
কুশের আবাদ করিল ভীরুরা ফেলিয়া গোধূম যবব্রীহি।
মুক্তি-পথের আছিলে সহায়, মুক্ত ভূভাগে গাহিতে সাম,
শত শত পাকে রচিল তোমারে তাহারা বাঁধন রজ্জুদাম॥

সেই কুশাডোরে দেশ বাঁধা প'ড়ে পঙ্গু হয়েছে মুদিয়া আঁখি,
অঙ্গুলি হতে কণ্ঠ চরণ কোন ঠাঁই তার পড়েনি বাকী।
আজিকে তাহার যাত্রার পথ ভরিয়া রেখেছ কুশাঙ্কুরে,
দুই পা আগায় পায়ে ব্যথা পায় ভয়ে ভাবনায় দাঁড়ায় ঘুরে।
নব কৌশিক কোথা চাণক্য কে তুলিবে এ কুশের কাঁটা?
গুপ্তচন্দ্রে পুন জাগাইবে সহজ হইবে এ পথ হাঁটা॥

ধুলা ঝাড়ার দিন

ধুলা ঝাড়বার দিন এসেছে এখন,
ধুলা ঝেড়ে পাব ভাবি হারাধন, হারানো রতন।
অর্জন হয়েছে শেষ, বর্জনের স্তূপে
অনাদরে ফেলেছি কি তাই আজ খুঁজি চুপে চুপে।
জঞ্জাল জমেছে ঢের এ গৃহের কোণে
ঢের বেশী মনে।
ডাষ্টবিনে এইসব ফেলিবার কথা
ফেলে দিতে হাত কাঁপে, তাই পাই ব্যথা।
একবার ভালো করে দেখে
চির বিসর্জন দিতে হবে একে একে।
নির্বিচারে ফেলে দিলে পাছে কিছু দামী—
চলে যায় অজানিতে, জড়ো করে রেখেছিনু আমি।
এতদিনে অবসর পেয়ে বাছিবার
নাড়া চাড়া করে দেখি কিছু কিছু আছে কি রাখার ?
দামী কিছু বৃথা হায় খুঁজি।
এ জঞ্জালে আছে শুধু পুঁজি
ছোটখাটো সুখ দুঃখ, হাসি, কান্না, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়,
আশা, তৃষা, উদ্বেগ, সংশয়,
সবই আজ ভুলে-যাওয়া নিদর্শন টুকরা স্মৃতির,
কত চিহ্ন মমতা প্রীতির,
সমাচ্ছন্ন মাকড়ের জালে আর ইটের গুঁড়ায়
ধুলা ভরা অতীতের পথে পথে এ চিত্তে ঘুরায়।
দীর্ঘশ্বাস পড়ে খনে খনে,
ঔদাস্য জাগায় শুধু মনে,

মেজে ঘষে মুছে পুঁছে রাখবার মতো কিছু নয়।
ফেলে দিতে হাত কাঁপে, তবু মায়া হয়।
কিছু ফেলি বাকি থাকে ঢের,
চলে তাই মনে আর গৃহকোণে জঞ্জালের জের,
আর কারো প্রয়োজন সিদ্ধ নাহি হবে
ফুরাল আমার দিন, রাখি কেন তবে?
যাব সব নিয়ে যাব সাথে,
এ সব সমিধ্ হবে আমার চিতাতে॥

নীরবতার গান

মুখের কথা কইবে না সই?
নীরব থাকাই চাই।
নয়ত বড় মুখের কথাটাই।
নয়ন তোমার কইছে যত কথা
অত কথা রামায়ণেও নাই।
অঙ্গে তোমার হাজার রোমাঞ্চন
করছে সৃজন কথার নীপবন,
অলকগুলোও মুখর হলো কেমনে সামলাই?

অধরে ধরে না কথা
জানায় সে কোন তৃষার ব্যথা?
ইচ্ছা করে বাচালতা সবলে থামাই॥

কবি-ভ্রাতা কাজী নজরুল ইস্‌লাম

নজরুল নজরুল !
কখনো বা ভোমরা, তুমি কখনো ভীমরুল।
মিলন তুমি মরু মেরুর একাধারে অরুণ গরুড়,
ভাষায় তোমার যেমন মধু, তেমনি তীখন হুল।

নজরুল নজরুল !
মেঘে তুমি শশীর কলা, অসির ফলায় গুল।
বাংলা দেশের দেহাদ থেকে ছুটলে তুমি জেহাদ হেঁকে
নেশায় ব্যাকুল হ্রেষায় বাতুল বিদ্রোহী দুলদুল।

নজরুল নজরুল !
একাই তুমি বাহার আনো ইরানী বুলবুল।
তোমার পাখার পরশ লেগে গোরেও ওঠে হরষ জেগে।
শুক্‌নো হাড়ে গজায় তৃণ রুগ্ন দাঁতেও ফুল।

নজরুল নজরুল !
ফুল হয়ে সব উঠল ফুটে যতই করো ভুল।
স্বপ্নলোকের কল্পবনে চাঁদের বুড়ীর গল্প শোনে
যারা সদাই তোমার সাথী তাহারা বিলকুল।

নজরুল নজরুল !
কলম তোমার গৌরবে রসবৈভবে অতুল।
কৈতবের ক্রূর বক্ষ পানে আকৈশোরই লক্ষ্য স্থানে
ভৈরব হে—ভৈরব সে কই তব ত্রিশূল ?

বৌবাজার

বাজার মানেই বৌবাজার,
বৌঝিদেরই মন যোগাতে বাজার জিনিস বয় হাজার।
গয়নাগাঁটির দোকানগুলোয়
শোভায় কাদের নয়ন ভুলোয়,
কাদের তরে বিরাজ করে শো-কেসে চূড়, কাঁকন, হার?

মনিহারির দোকানগুলোয় এত বাহার কার তরে?
সেগুলোতে কেন ঢুকে স্ত্রৈণ পুরুষ ধার করে?
ধুতির জন্যে চাই না দোকান,
মাসে যে চাই শাড়ী দুখান
যে দিকে চাও পাড়ের বাহার দেখ্‌বে বস্ত্রাগার ভরে॥

খাবারওলার দোকানগুলায় দেখতে পাবে কাদের ভিড়?
কার হুকুমে হাতে ঠোঙা ছেলেমেয়ে চাকর-ঝির?
ছেলেমেয়ের মাসীমারা
বিকালবেলার অতিথ যাঁরা
তাঁদের তরেই চপ শিঙারা, মোদের বরাত ডালরুটির॥

আনাজবাজার, মেছোহাটও ওঁদের রুচির পদানত,
মর্দেরা তো ফর্দবাহী কেনেন ওঁদের বরাত যত।
আমরা আনি গামছা বেঁধে
তাই খেতে হয় দেন যা রেঁধে,
মুদি বেনে দর্জি সবই যোগায় ওঁদের মর্জিমতো॥

নভেল পড়েন ওঁরাই, তাতেই বই-এর দোকান হয়নি কাত,
জুতাছাতার দোকানগুলায় বাড়ছে ওঁদের যাতায়াত।
বিড়ির দোকান পথের ধারে
ছিল মোদের অধিকারে,
বিড়ির সঙ্গে পানের যোগে হয়ে গেল তাও বে-হাত ॥

সব বাজারই বৌবাজার!
পুরুষ শুধু হাট বাজারে বৌ-রানীদের যোগানদার।
পুরুষ এবং বিধবাদের
প্রয়োজনের নয় দাবি ঢের,
বাজার মানেই যোগায় যাহা সব উপচার বৌ-পূজার ॥

যৌবন-প্রশস্তি

বিশ্বের যত মাধুরী আহরি করি তায় প্রেম-বৃষ্টি,
যৌবন তোমা রচিল বিধাতা, তুমি তাঁর পরা সৃষ্টি।
কুৎসিতে তুমি কর শ্রীমন্ত, কর্কশে কর কান্ত,
তব আতিথ্যে 'পাথেয়বন্ত' মানসসরের পান্থ।

তোমা লাগি ফুটে নীলিমায় তারা, শ্যামলে কুসুমপুঞ্জ,
ঝুলনদোলায় রভস লীলায় তব রসে ভরে কুঞ্জ।
তুমি আছ বলি' বিশ্ব পুলকি' এত রূপ, রস, গন্ধ,
গৃহে গৃহে ছুটে তোমার লাগিয়া উৎসবে প্রেমানন্দ।

তুমি ভোগী, মধুপর্কের মত ধরণী তোমার ভোগ্য,
ষোড়শোপচারে বিশ্ব রচিত হইতে তোমারি যোগ্য।
ভাবরস ধরে মোহন মূর্তি তোমার ধ্যানের-নেত্রে,
কল্পলক্ষ্মী কমলাত্মিকা তোমার মানস ক্ষেত্রে।

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' করেছ সৃষ্টি রম্য,
প্রেম-দ্যুলোকের অ-লোক সুষমা তোমারি দৃষ্টিগম্য।
কল্পনা তব জলধনুময়ী অপরূপ নানা বর্ণে,
অঙ্গুলি তব মৃৎপ্রস্তরে পরিণত করে স্বর্ণে।

তুমি বীর, দেশমাতার লাগিয়া কর প্রাণ উৎসর্গ,
রক্তসিন্ধু সন্তরি' তুমি লভ' কূলে অপবর্গ।
তব মুখে প্রাণ-মারুতে ধ্বনিত যুগে যুগে জয়শঙ্খ,
সপ্তরথীতে বেষ্টিত ব্যূহে পশ' তুমি নিঃশঙ্ক।

তুমি বিধাতার সৃষ্টিধর্ম পাইয়াছ তুমি স্রষ্টা,
রহি জীবনের তুঙ্গ শিখরে তুমিই বিশ্বদ্রষ্টা।
তোমারি ত্যাগের সম্বল আছে, ত্যাগী জানে তোমা বিশ্ব
তোমারেই সাজে ত্যাগের ধর্ম, কি ত্যাগ করিবে নিঃস্ব!

জীবনের ব্রতে অমৃতের পথে জয় কর দ্বিধাদ্বন্দ্ব,
বুদ্ধ নিমাই শঙ্করে তুমি করেছ ভুবন-বন্দ্য॥

শ্রম ও প্রেম

দিনের কর্মের অন্তে লভি যবে নিশীথে বিশ্রাম,
সে বিশ্রামে পাই তোমা, সে মিলন তাই সুমধুর।
তুমি রও কর্মরতা সারা দিন। যদি অবিরাম
পেতাম তোমার সঙ্গ, হতো কি এ চিত্ত তৃষাতুর?

আইসে বিলাসে যদি কেটে যায় উভয়ের বেলা,
কে না জানে প্রেম তবে অলৌকিক স্বাদুতা হারায়
প্রেম যদি খেলা হয় কর্মান্তেই জমে সেই খেলা,
প্রেমের ফসলে প্রিয়ে শ্রমজলই ফলন বাড়ায়।

যে মিলন লভি মোরা ক্লান্তদেহে, অয়ি সুচরিতা,
গৌরচন্দ্রিকার পরে তাহা যেন পদাবলী গান।
দীর্ঘ প্রবন্ধের পরে রসঘন সরস কবিতা,
অর্ধরাত্রে তমোভেদী অর্ধচন্দ্রোদয়ের সমান।

দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাসে যেন কাম্য পরীক্ষার ফল,
সন্ধ্যাস্নাত শ্রমিকের যেন তাহা দিনান্তভোজন।
দীর্ঘপথক্লান্ত দেহে বটচ্ছায়ে পানীয় শীতল,
বহু সন্ধানের পরে ফিরে পাওয়া যেন হারাধন॥

দ্রোণ পুষ্প*

শ্রী-হারের দুল, নীহারের ভুল, ডহরের ফুল তুই
বাগবাগিচায় ঠাঁই নাই তোর, মাঘফাগুনের যুঁই!
বাণীর চরণে ফুটুক কুন্দ ভক্তের প্রাঙ্গণে,
রমার চরণে ফুটে থাক্ তুই ক্ষেতের একটি কোণে।

ক্ষেত্রমাতার নবজাতকের শুভ মঙ্গলাচারে,
খই হ'য়ে তুই ছড়ানো আছিস প্রান্তরে কান্তারে।
নববসন্ত প্রসূত বুঝি রে ব্যোমের সূতিকাঘরে,
দুধে' হাসি তার ক্ষুদে ফুল হ'য়ে ফুটিলি কি থরে থরে?

অথবা শুনিয়া হৈমবতীর হিমাক্ত বিদ্রূপ
কেদারনাথ কি মুচকি হাসিল,—পুষ্পিত তারি রূপ?
হরের বৃষভ নিজ শৃঙ্গের বপ্রতুষার-ভার
গ্রীবা আস্ফালি দিয়াছে ছড়ায়ে তোরা বুঝি কণা তার?

দ্রোণ তোর নাম দ্রোণপুত্রের দুধের তৃষ্ণা বুঝি,
ক্ষুদের মণ্ডে উঠেছিস ফুটি কাঙাল গুরুর পুঁজি।
তপন-রথের অয়নযাত্রা-পথতল-খানি ভরা
তুই কি ফেনিল স্বেদের বিন্দু অশ্ব-কেশর ঝরা?

তৃপ্ত ভুবন শস্যসিন্ধু নিঃশেষে পান করি,
সৈকতে তার শঙ্খশুক্তি তোরা বুঝি ছড়াছড়ি?
নিঃস্ব আজিকে প্রান্তর-ভূমি, তুই সম্বল তার,
কাঙাল-বধূর আয়তি-চিহ্ন যেমন শঙ্খসার।

---

* গলঘেসেনামে এক প্রকার মেঠো ফুল

মুখরা

কেন কোন' কথা গায়ে স'য়ে যাব? কেন কোন অপরাধে?
'মুখরা মুখরা' বল্‌ছ ত সবে,—মুখরা হয়েছি সাধে?
পাড়ার লোকের কথা শুনে সাধে সারা দেহ যায় জ্বলে'
তোমরা সবাই হ'তে মুখরাই—মোর মত দশা হ'লে।
মা-হারা হ'লাম বয়স যখন,—মাত্র বছর দেড়,
না যেতে ছ'মাস গেল বাপ মরে' এমনি গেরোর ফের।
কোলহারা হ'য়ে, রোগে ভুগে ভুগে, রোদে পুড়ে, শীতে জ'মে,
গড়ায়ে গড়ায়ে মামার বাড়ীতে ডাগর হ'লাম ক্রমে॥

বড় ত হলাম, বড় হয়ে ওঠা লাগল না কারো ভালো,
বেয়ারামে-ভোগা দেহখানা রোগা তায় রং ছিল কালো।
যত বড় হই দাদারো ততই মুখখানা হয় ভার,
দূরে যাক্ কোনো দরদ দেখানো, কথাও ক'ন না আর।
বউদি আমার উঠ্‌তে বস্‌তে কেবল পাড়ত গালি,
ছিলনাক খাওয়া,—ছিল দুই বেলা পিণ্ডি গেলাই খালি।
রুখু কটা চুলে,—ময়লা টেনায় হ'য়ে উঠলাম ধাড়ী,
দাদার গলায় আট্‌কে গেলাম আমি এ লক্ষ্মীছাড়ী॥

অল্প টাকায় তেজবরে এক বুড়ো বর খোঁজ ক'রে,
একদিন দাদা বিদেয় দিলেন,—ঠিক যেন ঘাড় ধ'রে।
বিধবা ননদী ছিল একজন, শাশুড়ী ছিল না মোর,
উগ্রচণ্ডা মূর্তি,—বাপরে,—তার কি মুখের তোড়!

তোমরা আমারে মুখরা বলছ—তারে দেখনিক ব'লে।
পান হতে চুণ খসে পড়লেই উঠত সে রাগে জ্ব'লে।
সোয়ামী থাকত বিদেশে, কাজেই কেউ মোরে পুছিত না,
ময়লা ফেরানি, রুখু চুল,—তাই সেখানেও ঘুচিল না॥

বুড়ো ছিল বটে, লোক ছিল ভাল, ক'দিনই বা পরিচয়!
মনে হতো যেন অভাগীরে ভালবাসত সে নিশ্চয়।
তা হ'লে কি হয়? কপাল কেমন? রোগ নিয়ে বাড়ী এল
না যেতে বছর ছারকপালীর সীঁথির সিঁদুর গেল।
নানা দুখ সয়ে দেওরের ঘরে ছিনু মাস নয় দশ,
সেথা হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও হলো না একটু যশ।
ননদী জায়েরা একদিনও মোরে কথা কহিল না হেসে,
কাঁদতে কাঁদতে দাদারি বাড়ীতে ফিরেই এলাম শেষে॥

গম যব পিষি, ঢেঁকি পাড় দিই, সারাদিন ধরে' রাঁধি,
দিনে অবসর পাইনাক বলে' রাতে বসে' বসে' কাঁদি।
তবু বৌদির টিস-টিস করা ক্রমেই বাড়তে রয়,
বাপেরি বাড়ীতে খেটেখুটে খাই বেশী কথা কিছু নয়।
মাথা গুঁজে গুঁজে মুখ বুজে বুজে বল' আর কত সই?
বরাবর আমি—তোমরাতো জান—এমন মুখরা নই।
বাপ ভাই বোন মায়ের আদর, সোয়ামীর ভালবাসা,
মা-বলিয়া-ডাক জুটিল না হায়—এ জীবনে নেই আশা॥

ভুলেও মিষ্টি কথাটি যে জনে কেউ কয়নিক ডাকি,
সে পোড়ামুখীর পোড়ামুখে শুধু অমৃত ঝরবে নাকি?
তোমরা কি বলো নিম খেয়ে খেয়ে চিনিমুখী হ'য়ে রবো!
মড়ার বাড়াতো আর গাল নেই, কেন কারো কথা স'বে

নব-বিবাহ

যেমনটি ঠিক ছিলে তুমি বারো বছর আগে,
এখন তুমি তেমনটি নও নতুন তোমায় লাগে।
নতুন রসে নতুন রূপে বরেণ্যা আজ প্রিয়ে,
তোমার সাথে নতুন ক'রে করতে হবে বিয়ে॥

বিনা পরিচয়ে হঠাৎ প্রথম পরিণয়,
সেটা তেমন সিদ্ধ নহে সভ্যলোকে কয়।
বারো বছর পূর্বরাগে জম্‌ল প্রণয় প্রিয়ে,
কাজেই তোমায় করতে হবে নতুন ক'রে বিয়ে॥

অনেক বাধাই ছিল তখন—আশঙ্কা, সংশয়,
লজ্জা ছিল, কুণ্ঠা ছিল, ছিল অনিশ্চয়,
সে সব গেছে, নির্ভাবনার নির্ভীকতায় প্রিয়ে,
নিরুদ্বেগে আজকে তোমায় করব আবার বিয়ে॥

তৃষ্ণা তখন প্রখর ছিল রূপের মোহ ঘিরে,
অসংসারের বিয়ে সেটা দৈববতীর তীরে।
গৃহ্যনীতি ঠিক ব'লে তায় মান্‌বে কেন প্রিয়ে ?
গঙ্গাতীরে নতুন করে করতে হবে বিয়ে॥

বরযাত্রী ডাকবনাক, বল্‌বে পাগল লোকে,
দৃষ্টিবদল হ'বে এবার মনের চারি চোখে।
তিনটি বাছা মাঝখানেতে থাক্‌বে শুধু প্রিয়ে
সাক্ষী হ'য়ে। নতুন ক'রে করব তোমায় বিয়ে॥

লেখক ও পাঠক

আপন জনের খোঁজে পাঠালাম লেখা দেশে দেশে
তুমি সেইজন বন্ধু চিনিলাম শেষে।
ছ-আনার খাতা ভরি প্রাণের বারতা
ব্যক্ত করিলাম, আমি শুধু কথা সাথে গেঁথে কথা।
পুস্তক-বণিক এক নিয়ে গেল উপেক্ষার ভরে,
আঁখরিয়া রূপ দিল সে লেখারে সীসার অক্ষরে।
মুদ্রাকর ছাপাইল, প্রুফ-বীক্ষারত
মিলাল খাতার সাথে মাছিমারা কেরানীর মতো।
অশিক্ষিত দপ্তরীর হাতে হ'ল বাঁধা
না বুঝিয়া একবিন্দু ইহার মর্যাদা।
না পড়িয়া বার্তাজীব দিল বার্তাপত্রে পরিচয়,
গ্রন্থবণিকেরা কিছু লভ্য তরে করিল বিক্রয়।
যারে চিনিনাক তার হাতে গিয়া পহুঁছিল শেষে
আমার খাতার লেখা ছন্নছাড়া সুসজ্জিত বেশে।
অবশেষে, যার জন্য ভাবঘোরে লেখা
সে লেখা পাইল তার দেখা।
এ যেন চিঠিরই মতো ডাক-গাড়ী—পিওন, রানার
অনেকের মারফত খুঁজে পেল মালিকেরে তার।
বঙ্গের প্রাণের বার্তা যেন যোগ্য শ্রোতা অন্বেষণে
ঝাড়খণ্ড পার হয়ে গেল বৃন্দাবনে।
গথ, তুর্ক, ভ্যাণ্ডালের রাজ্য হয়ে পার
প্রাচীন সভ্যতা যেন খুঁজে পেল রিনাশাঁসে তার॥

যৌবন ও জরা

ইণ্টার ক্লাসের গাড়ি বম্বে মেলে, হাওড়া স্টেশনে
ভিড় নেই, ব'সে আছি আমরা ক'জনে।
দেরি আছে গাড়ি ছাড়িবার
প্ল্যাট্‌ফর্মে ফেরিওলা নানা মন্ত্রে করিছে চীৎকার।
একটি বেঞ্চিতে ব'সি যুবক যুবতী
যেন ছুটি কপোত কপোতী
কূজন করিছে, দেয় শিশুপুত্র মাঝে মাঝে বাধা,
পুরা শোনা যায় নাকো, শোনা যায় আধা।

ক্রমে ক্রমে ভিড় গেল বেড়ে
সীটে রেখে স্যুটকেস তখন ছুজনে গাড়ি ছেড়ে
নেমে গেল প্ল্যাট্‌ফর্মে। ঘণ্টা পড়ে, ফুরায় না কথা।
ছুজনের মুখে ম্লান ছায়া ফেলে বিচ্ছেদের ব্যথা।
প'ড়ে গেল শেষ ঘণ্টা। বম্বে মেল ছাড়িল হুঙ্কারি,
ছুজনের চোখে দেখি দরদর বারি।
প্যাণ্টের পকেট হতে ক'রে যুবা রুমাল বাহির
গাড়ীতে উঠিল মুছি নয়নের নীর,
চুমা দিয়ে শিশুর মার্ফতে।
যুবতী সংবরি শোক কষ্টে কোনমতে
শিশুটিরে কোলে ক'রে রহিল দাঁড়ায়ে।
রুমাল উড়াল যুবা মুখটি বাড়ায়ে।
প্রকৃতিস্থ হয়ে যুবা বসিল যখন,
দীর্ঘশ্বাসে ম্লান মুখ, আরক্ত নয়ন।
কৌতূহলে জিজ্ঞাসিনু, 'আপনি কি যাবেন বিলাত ?'

মোর পানে করি যুবা খর দৃষ্টিপাত
কহিল, 'বি-লা-ত? সে কি? যাব ধানবাদ।'
শুধাইনু, 'দীর্ঘকাল সেখানে কি থাকিবার সাধ?'
সে কহিল, 'খুব জোর দিন পাঁচ-ছয়।'

ভাবিলাম—এ কি কাণ্ড! এরি তরে এত অভিনয়!
কেমনে জানিব বলো,—এই বুঝি এ কালের প্রথা?
সারা পথ বলিনিক আর কোন কথা।

কে যেন কহিল মোর কানে,
ওহে বৃদ্ধ কবি, তুমি আছ কোন্‌খানে?
মধুর যৌবন তব বহুদিন গত,
এবে পূর্ব জনমের মত।
জান নাকি উহাদের পঞ্চদিন পঞ্চযুগসম,
তিলেক বিচ্ছেদ তাও দুর্বিষহতম?
নবোঢ় যৌবন দিন আপনার স্মরো একবার,
হবেনাক যথাযথ জবাবের অভাব ইহার।
যা হ'ত শয়নকক্ষে একদিন গোপনে প্রভাতে,
তাই হয় প্ল্যাট্‌ফর্মে দিবালোকে সবার সাক্ষাতে॥

কর্মযোগ

অদ্ভুত পূজা তব হেরিনু হেথায়,
ফুল চন্দন ধূপ দেখা নাহি যায়।
লাগেনাক রূপা-সোনা চলে তবু উপাসনা,
চাষীরা লাঙ্গল ঠেলে পূজিছে তোমায় ?

চামড়া সেলাই ক'রে পূজে কি চামার ?
লোহা বাজাইয়া বুঝি পূজিছে কামার ?
দিনরাত ঘুরে টাকু, তাঁতে তাঁতী ছুড়ে মাকু,
এ কেমন পূজা চলে বুঝা বড় দায়।

কুমোর গড়িছে ঘট, মানে বুঝি তার।
হাঁড়ী গড়া সে কেমন ধারা পূজিবার ?
বোনে ডোম বুড়াবুড়ী কুলো ডালা ঝোড়া ঝুড়ি
তারাও কি আরাধনা করিছে তোমার ?

যত সব নীচ জাত চাঁড়াল চোয়াড়,
পেটের ভাতের শুধু করিছে যোগাড়।
নাইক ভজন গীত মন্দির পুরোহিত
হীন শূদ্রের কোথা পূজা অধিকার ?

শুনি নাকি এ পূজাই ভালো লাগে তব,
যাই হোক এ পূজাই খুবই অভিনব।
বাজেনাক ঢাক ঢোল, কাঁসি শাঁখ বাঁশী খোল,
তোমার কথার পর কি কথা বা ক'ব ?

অনাবৃষ্টির বঙ্গভূমি

তুমি কি আমার অন্নপূর্ণা শ্যামলা মাতৃভূমি?
কোথা তব মাগো শ্যাম সম্পদ কি রূপ ধরেছ তুমি?
ধূ ধূ করে মাঠ মরুভূর প্রায় মরীচিকা নাচে খালি,
হু হু ক'রে বয় তপ্ত মলয় উড়াইয়া ধূলি বালি॥

পথের দুপাশে দূর্বাটি নাই, গোষ্ঠ জীবনহীন,
তড়াগে নাইক পদ্মকুমুদ, জলাশয়ে নাই মীন।
মহিষ পিয়িছে কর্দমজল, মেষ চাটিতেছে পাঁক,
অশথের তলে গাভীগুলি শুয়ে শুনিছে কালের ডাক॥

নালার কাদায় শূকর লুটায়, কাক নির্বাক চালে,
তৃষায় আতুর বিড়াল কুকুর ধুঁকিতেছে ঢেঁকিশালে।
চারাগাছ যত মুড়ায়ে খেয়েছে ক্ষুধিত ছাগলগুলি,
উপাড়ি খেয়েছে গলঘেসেগুলো মুথা মূল সহ তুলি॥

রয় না তিলেক পাতাটি খসিয়া পড়িলে বটের তলে,
ধুঁকিতেছে তরু নয়ন মুদিয়া লতার রজ্জু গলে।
ঝলসিয়া পড়ে তুলসীকুঞ্জ, ধুতুরাও মুরছায়।
শুষ্ক লতায় শূন্য মাচান খাঁ খাঁ করে আঙিনায়॥

শুকানো পুকুরে মাছরাঙা ডাকে, ঘুঘু ডাকে ভাঙ্গা ছাদে।
খাঁচায় খাঁচায় ময়না ফুকারে আকাশে চাতক কাঁদে।
কাঠঠোকরারে বকিয়া উঠিছে থেকে থেকে টাকসোনা,
ফুটো চালে করে আহারের লোভে গিরগিটি আনাগোনা॥

প্রাণহীন হ'য়ে পাখীর শাবক তরুমূলে গড়াগড়ি,
অহি-নকুলের কলহ বাধিছে মৃত দেহটির 'পরি।
কাৎরানি উঠে তালবাগড়ায়, নল-খাগড়ার বনে,
নারিকেলগুটি বোঁটা হতে টুটি খসে পড়ে খনে খনে।
বাসা বাঁধিবারে পায় না কপোত তৃণখড় একগাছি,
নাই প্রজাপতি মৌমাছি অলি, ভনভনে ঘেয়ো মাছি॥

নীরস মাটিতে ফাটল ধরেছে পথে পথে মাঠে মাঠে,
সন্তান লাগি তোমার জননী আজি কি হৃদয় ফাটে?
তাই কি মা তুমি যোগিনী সেজেছ শ্মশান করি এ দেশ,
শ্যামল কাঁচুলী ছাড়িয়া এবার পরেছ গেরুয়া বেশ?

কণ্ঠে পরেছ নীরস রুক্ষ রুদ্রাক্ষের মালা,
নয়ন পলকে ঝলকে ঝলকে ক্ষরিছে রুদ্র জ্বালা।
তোমার শীর্ণ অঙ্গ আজিকে চিতার ভস্ম মাখা,
ললাটে লোহিত-চন্দনে হেরি ললাটিকা আজ আঁকা॥

চাঁচর চিকুর হয়েছে আজিকে কপিশপিঙ্গ জটা,
তব নির্মম ত্রিশূল জ্বলিছে উগারি বহ্নিছটা।
কালীঢালা কৃশ সন্তানগুলি অস্থিচর্মসার,
প্রেতরূপে আজ অট্টহাস্যে ঘেরিয়াছে চারিধার॥

তুমি কি আমার অন্নপূর্ণা শ্যামলা মাতৃভূমি?
তোমাকে আজি যে চিনিতে পারি না; কি বেশ ধরেছ তুমি?
বিশ্বে অন্ন বণ্টন করি নিঃস্ব হয়েছ ব'লে
পরিহরি শেষে হিরণ ভূষণ শ্মশানবাসিনী হ'লে?

অসামান্য

ঐ যে বিমান নোংরা করে শুচি আকাশ-পথ!
চমক লাগায় দানবপুরীর ঐ যে ইমারত!
মাঠের বুকে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটছে মালের ট্রেন।
ভারী ভারী জগদ্দলে ঊর্ধ্বে তোলে ক্রেন!
ঐ যে সেতু নদীর এপার-ওপার বেঁধে খাড়া,
ঐ যে ব্যারেজ ঘুরায় তাহার ধারা,
বিস্ফারিত চোখে—
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখে সকল লোকে।
ক্ষণকালের এ সব আকর্ষণ,
মূলে যতই থাক আয়োজন, ফুরায় প্রয়োজন
সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম দেখায় জাগায় তা বিস্ময়,
অপূর্বতা হরে তাদের নিত্য পরিচয়॥

ঐ যে চাষী চলছে বলদ লাঙল নিয়ে মাঠে,
ঐ যে বধূ ভরছে কলস ঘাটে,
ঐ যে ধেনুর অঙ্গে জাগে তৃপ্তি-শিহরণ,
জলার ধারে সারি-বাঁধা হাঁসের বিচরণ,
ঐ যে লতা ফুলের মালা জড়ায় শিশুগাছে,
কোলে তাহার পুচ্ছ নেড়ে টুনটুনিটি নাচে।
পাখী তাহার ছানার মুখে দিচ্ছে আহার পুরে,
পল্লবেরা গাইছে গীতি ঐকতানিক সুরে,—
নয় এরা সব বিরাট বিশাল, জাগায় না বিস্ময়,
এদের মাঝে অনন্তকাল জীবন-ধারা বয়।
কেউ কি কভু তাকায় তাদের পানে?
তাদের মাঝে কিসের লীলা চলছে তা কি জানে?

শিল্পী, রসিক কবি,

কিসে তোমায় মুগ্ধ করে সবি ?

কে তোমার ঐ চোখে করে কুহক সঞ্চার,

করো যাতে অসামান্য নিত্যে আবিষ্কার !

যন্ত্র নহে, জীবনই দেয় অসীমা-সন্ধান

অফুরন্ত তাই ত তাহার দান।

বর্ণরেখা বাণী-ধ্বনির বন্ধনে সে ধন

ক'রে রাখ তুমিই চিরন্তন ॥

আমরা তখন তাদের মাঝেই পাই

এমন যাহা যন্ত্রাদি বা গ্রন্থাদিতে নাই।

নিত্য নব নবায়মান তাহার মধুরিমা,

উপভোগে পাই না তাহার সীমা।

নগণ্য কি তুচ্ছ তারে আর ভাবি না মনে,

যেন ফিরে পাই সে হারাধনে।

নগণ্য যে, চেয়ে দেখি অগণ্য রূপ তার,

দেখা তারে ফুরায় নাক আর।

সকল বস্তু স্পর্শে কর কস্তুরী-সুরভি,

শিল্পী তুমি আবিষ্কারক, দ্রষ্টা, তুমি কবি ॥

উষ্ট্র-সূক্ত

বৈদিক ঋষি দেবতাগণেরে দেখে নাই ধরাধামে।
তবুও তাহারা সূক্তমন্ত্র রচিল তাঁদের নামে।
ইতিহাস বলে, ঋষিদের তুমি আদি সহচর ছিলে,
বারবারই ঐ যাযাবরদের মরুপার করে দিলে।
তুমি পশু তবু দেবতার চেয়ে বড়
সূক্ত শ্রবণে দীর্ঘ তোমার শ্রবণই যোগ্যতর।
সূক্ত রচিব হে পশু-তাপস দুর্গম-পথগামী
তব উদ্দেশে, যদিও শ্যামলা বঙ্গের কবি আমি॥

তোমার পৃষ্ঠে চড়ি নাই কভু, চড়াও সহজ নয়,
যদি চড়িতাম, হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িতাম নিশ্চয়।
তুমি টানিয়াছ যান,
সেই যানে চড়ি' কাটোয়া হইতে গিয়াছি বর্ধমান।
ছাত্রজীবনে তুমি একাধিক বার
মরুর বাড়া সে কর্জনা মাঠ করিয়া দিয়াছ পার।
মরুদেশে তুমি কাঁটা ঘাস খাও, এই দেশে নিমপাতা,
কারো খাদ্যের ভাগীদার নও, দাবি করনাক ভাতা॥

এ সব তুচ্ছ কথা,
তোমাকে লইয়া চলিবে না রসিকতা।
বারি-সিন্ধুর চেয়ে দুস্তর মরুময় পাবাবার
নিরুপায় নরে দেহতরী 'পরে করিতেছ পারাপার
বালুদরিয়ার নেয়ে।
পঞ্চতপারা কৃচ্ছ সাধন করে না তোমার চেয়ে।
অগ্নি জ্বলিছে পায়ের তলায় অসহ্য বালুকায়,
অতএব তোমা ষট্‌তপা বলা যায়॥

তপ করে যেবা করে না সে সেবা, দুই-ই তুমি একা করো।
অতএব তুমি সব তাপসের বড়।
মরু সৃজিলেন যিনি, তাঁর দেখ আছে কিছু বিবেচনা,
তোমারে সৃজিয়া দিলেন আর্ত মরুভূমে সান্ত্বনা ॥

নমামি তোমায় মরুমাতৃক দেশের পরিত্রাতা।
একাধারে তুমি মিত্র, সেবক, ভ্রাতা।
গুণ-পরিচয় দিই যদি যথাযথ,
সূক্ত আমার উষ্ট্র-পুরাণে হয়ে যাবে পরিণত।
সুতরাং আমি চরম কথাটি বলি'
শূন্য করিব আমার তপ্ত বালুকার অঞ্জলি ॥

একটি চিত্র স্মরি',
দুপুর বেলার মরুপরিবেশ মনে মনে লই গড়ি'।
কোনখানে নেই একটি ফোঁটাও ছায়া,
তাপসের তপ ভঙ্গ করিতে নাচে মরীচিকা-মায়া,
তোমার তনুটি দহে খর ভানু-করে।
স্থাণু হয়ে তুমি আছ দাঁড়াইয়া প্রাণঘাতী প্রান্তরে।
চারিটি চরণ বালুতে প্রোথিত, নয়ন মুদায় ঝড়,
জঠরে পীড়িছে ক্ষুধার বৈশ্বানর।
তৃষ্ণায় তব কণ্ঠ রুধিয়া আসে,
তোমার দেহের দীর্ঘ ছায়াটি পতিত তোমার পাশে।
আরোহী তোমার সেই দুর্লভ ছায়া করি' আশ্রয়
দণ্ড দুয়েক অঙ্গ জুড়ায়ে লয়।
এই চিত্রটি ভাবি
আর মনে হয়, আরোহী সে ভাবে ছায়াতেও তার দাবি !
প্রবলের দুনিয়ায়
তোমাতে এবং নিরীহ মানুষে তফাৎ নাইক হায় ॥

যাক্—কি কথায় কি কথা পড়ল এসে,
উষ্ট্র-ভক্তি বুঝি বা মানব-মমতায় যায় ভেসে।
ভয় হয়, তুমি সিম্বল হয়ে পড়,
তোমার কথাই আমার লক্ষ্য, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ॥

জঙ্গমরূপে সেবা কর তুমি মান না পাত্র-ভেদ,
স্থাবর রূপেও সেবাধর্মের হয়নাক বিচ্ছেদ।
সেবাধর্মের এই যে নিদর্শন,
নহে কি বিশ্বে অনুপম অতুলন ?

গিরি, অরণ্য, চন্দ্র, তপন, নদী
সূক্তই লভে যদি,
ব্রহ্ম যাহাতে জ্বলজিয়স্ত সে কেন পড়িবে বাদ ?
জীবের মধ্যে শিবের বসতি ভুলে যাওয়া অপরাধ ॥

সকলের মাঝে ব্রহ্ম বিরাজে, তোমার মাঝারে বুঝি
সেবকাদর্শ রূপে সেবমান, তাহারেই আমি পূজি।
সেবাধর্মের তুমি আদর্শ, তোমারে নমস্কার।
মরু না থাকিলে এই আদর্শ কোথায় মিলিত আর ?
যত দোষ থাক, তোমার খাতিরে তাহারেও আমি ক্ষমি।
হে পশু-তাপস, তোমার সঙ্গে মরুরেও আমি নমি ॥

সমবণ্টন

যা আছে আমার তাই থাকে থাক বেশি কিছু আমি চাহি না,
কেউ না ছাড়ায়ে যেন যায় মোরে পেয়ে বেশি ভাতা, মাহিনা।
খাটো ক'রে দাও বেশি যার আছে তার তা ছাঁটাই করিয়া,
কারো ঘরে দাও লাগায়ে আগুন, কারো বৌ যাক মরিয়া।
কানা ক'রে দাও কারো দেড় চোখ, কারো ভেঙে দাও ঠ্যাংটা,
কারো ব্যবসায় জ্বালো লাল বাতি, কারো ফেল হোক ব্যাঙ্কটা॥

বুদ্ধির বলে যেবা বড় হয়, দাও যদি তারে বাঁচিতে,
মাথাটি তাহার খারাপ করিয়া পাঠাইয়া দাও রাঁচিতে।
কারো বেড়ে যাক রক্তের চাপ, কারো খুব কমে অথবা,
কারো ছেলে ফেল করুক ফি-বার, কারো মেয়ে হোক বিধবা।
কারো কালো কালো পাঁচ মেয়ে হোক, গৃহিণী মুখরা প্রখরা।
কারো ভাইগুলো মামলা করুক লয়ে বিষয়ের বখরা॥

ধনই শুধু নয় চরম কাম্য অনেক রয়েছে ভোগ্য,
মানুষের হাতে সবি নয় প্রভু সমবণ্টন-যোগ্য।
তাইতো তোমারে মানিতে হইল, পেশ করি এই আর্জি,
তোমারেই তাই দিতে হ'ল শেষে হক-বাঁটোয়ারা চার্জই।
আমার বেলায় কমতি হইলে দিও যেন কিছু বাড়ায়ে।
'হরে দরে সেই হাঁটুজল' হোক, কেউ পেয়ে কেউ হারায়ে॥

উদর-মন্দির

ঠাকুর আছেন দেহেই সবাকার,
এই কথাটাই বলে গেছেন সকল অবতার।
কোথায় আছেন এই দেহটার মাঝে
বলেননি কেউ তা যে।
পেটের কথাই ভাবছে জগৎ তাইত মনে হয়,
পেটেই জগন্নাথের দেবালয়।
পেটেই তাঁহার যজ্ঞঅনল জ্বলছে অনিবারই,
দেখতে না পাই বুঝতে তা-ত পারি।
আহুতি তায় যোগানো বার বার
নয় কি পূজা তাঁর ?
ভালো ক'রে দেখ্‌লে ভেবে মনে
হয় ধারণা দেবতা নেই শ্রীমন্দিরের কোণে।
দেবতা রয় পেটে,
তাইতো দেহের সকল যন্ত্র মরছে খেটেখেটে।
যা যা নিজে ভালবাসি দেবতাকে দিই তাই
তাঁর প্রসাদী করতে সে সব খাই
পুরুৎ মুখ-উপাধ্যায়ের দন্তে রসনাতে
দিয়ে দাও সব পৌঁছে যাবে ঠিক সে ঠিকানাতে।
সকল জীবই করছে তো এই পূজা।
সর্বজীবে ক্ষুধারূপে রাজেন দশভুজা॥

ভোগান্তিকা

জীবনের ভোজ হয়ে গেছে অবসান,
শেষ হয়ে গেছে ভূরিভোজ্যের পালা।
এবে নিঃঝুম পাকযন্ত্রটি পেটে
প্রায় নির্ধূম এখন সে পাকশালা।
হরলিকস্ খই বেলপোড়া কাঁচকলা
পথ্য এখন ডাক্তারী নির্দেশ।
শর্করাহীন খাদ্য, পলতাপাতা,
তার সাথে আছে ত্রিফলার সমাবেশ।
কাগজী লেবুর নিঙ্ড়ানো রস দিয়ে
হয় ঘোল-ভাত, নয় শুধু ঝোলভাত।
লোলুপ রসনা স্বভাবত নিস্পৃহ,
চর্ব্য না পেয়ে নিষ্ক্রিয় বাঁধা দাঁত।
ঢালাও মিঠাই পোলাও পিঠার পরে
অনিবার্য যে সাগু বার্লিই শুধু।
চেরাপুঞ্জিটা একদিকে যদি রহে
আর দিকে গোবি সাহারাই করে ধু ধু।
এঁটোপাতা আর ভুক্তাবশেষ নিয়ে
কাক-কুকুরেরা উৎসবে মেতে যায়—
জানালার নীচে শড়কের একধারে
দেখি নরকের পূর্বাভাসটি তায়।
মানুষ হলেও যাদের করেছি ঘৃণা
জীর্ণাবশেষে তারা দেয় সদ্‌গতি।
জীবনের ভোজ শেষ এবে শুধু দেখি
ভুক্ত এবং ভোক্তার পরিণতি ॥

বৈয়াধিক সভ্যতা

অহিংসক পশু যত করি বধ জীবন ধারণ
একদা করিত যত হিংস্র জীবগণ।
বনরাজ্য তাহাদেরি, ব্যাধ তুমি হলে অংশীদার,
স্বভাবত শুরু হল চির বৈরিতার।
তাহারাও বধ্য হল, জয়ী হলে আয়ুধের গুণে
তুমি যে প্রবলতর অসি চর্ম বর্ম ধনু তূণে।
পশুর সম্বল শৃঙ্গ নখর-দশন।
শাণিত, সক্রিয় দূরে, বিষলিপ্ত তব প্রহরণ,
অশ্ব তব বশ্য হলো ক্ষিপ্রগতি তোমার বাহন,
ব্যর্থ হলো পশুদের পলায়ন আত্মসংগোপন।
আয়ুধ-বাহন গুণে তোমার প্রতাপ,
তারেই তো বলা হয় সভ্যতার পথে উচ্চ ধাপ॥

মানুষ নিরীহ জীব পশুরো অধিক,
তবু তারা শত্রু তব—খাদ্যের শরিক।
প্রয়োজন তাদেরও উচ্ছেদ,
বাঁচিবার তরে আছে বুদ্ধিবল, তাহাদেরও জেদ।
মধ্যে ছিল বারি ব্যবধান
দুরিতে তা, তরিতে তা গড়িলে বিচিত্র জলযান।
রহি তুমি এক কূলে সমুদ্রবেলায়
অনায়াসে অন্য কূল শাসিলে হেলায়।
তোমার প্রতাপ হলো ধাপে ধাপে ক্রমে অভ্রভেদী
অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত হল তব বেদী।
সেথা হতে সর্বজীব করিছ শাসন
দিনে দিনে সাংঘাতিক হলো আরো তব প্রহরণ।

সর্বধ্বংসী আয়ুধের ভয়ে দিশেহারা
বধ্য যারা ছিল আজ বাধ্য হল তারা।
জগতের সর্বখাদ্য আয়ত্ত তোমার,
উদ্বৃত্ত যা কিছু তার লইয়াছ বণ্টনের ভার।
আয়ুধিক ক্রম-বিবর্তন
বিশ্বগ্রাসী সভ্যতার, তাহাইত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
চণ্ডীমার বরপ্রাপ্ত তুমি কালকেতু-বংশধর
শাপভ্রষ্ট। বন কাটি গড়েছ নগর।
তব ব্যাধজীবনের ধাপে ধাপে অনুস্মৃতি ছাড়া,
কোথায় খুঁজিতে হবে সভ্যতার ইতিহাস-ধারা?

শঙ্কিতা

মৃতবৎসা হে জননি, রুগ্ন জীর্ণ সন্তানে বেষ্টিতা,
কোন্‌টি কখন মরে, সেই ভয়ে সতত চকিতা,
তব দুরদৃষ্ট, দৈন্য, দুর্বলতা, অজ্ঞতা তোমার
মুগ্ধ বাৎসল্যই শুধু বাড়ায়েছে ও মাতৃহিয়ার।
সন্তানের শীর্ণ স্বাস্থ্য, হ্রস্ব আয়ু, পাপ-তাপভার
তব মাতৃহৃদি মাঝে ধরিয়াছে ধর্মের আকার!
দুরুদুরু হৃদয়ের শঙ্কামূঢ় আর্ত আকিঞ্চন
চরাচরে ভূত প্রেত দেবতার করেছে সৃজন।
মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাবিবি, শনি, সত্যপীর,
সকলি তাহারি সৃষ্টি। তব মাতৃবক্ষের রুধির
গড়িয়াছে দেয়াসীন, পাণ্ডা, ওঝা, পূজারী, গণক,
ফকির, মোহান্ত, গুরু, দেশভরা কত না বঞ্চক;
মানত, মাদুলী, ব্রত, গ্রহশান্তি, পঞ্জিকাশাসন,
মূঢ় মাতৃ-হৃদয়ের ব্যস্ত ত্রস্ত যত আয়োজন।

সন্তানের অকল্যাণ ভয়ে ভয়ে শুধু নির্বিচারে
চরাচরে সর্বত্রই প্রণিপাত যত অজানারে।
এক ধর্ম আছে তব, কৃতাঞ্জলি হয়ে শুধু কাঁদা
দেবতার দ্বারে নিজ হস্তপদ রাখিয়াছ বাঁধা।
দেবতার ভরসায় রহিলেত হায় এত কাল
তাতে তব দীনমূঢ় সন্তানের ফিরেছে কপাল?
আর কেন? সত্যই কি দেবতারা এতই নির্দয়?
সত্যই শরণার্থীরে দেবতারা দেন না আশ্রয়?
সত্য দেবতারে তুমি এতদিন পূজনি জীবনে,
ভীতিমূঢ় কামনার সৃষ্ট যত ছায়ামূর্তিগণে
দেবতা বলিয়া তুমি পূজিয়াছ। আত্মশক্তি মাঝে
দেখ নাই সনাতন সত্যব্রহ্ম নারায়ণ রাজে।
কবচ মাতুলী ডোর ছিন্ন ক'রে দৃপ্ত অভিমানে
পূজারীরে উপেক্ষিয়া চল বৈদ্যনাথের বিধানে।
আবার সন্তান তব আয়ু পুষ্টি স্বাস্থ্যবল লভি
বিনা দৈব অনুগ্রহে বিশ্বমাঝে হইবে গৌরবী।
গুটাও ধর্মের পাশ সন্তানেরা হউক নির্ভয়,
দেবভরসার নামে নিষ্ক্রিয়তা ক'রো না আশ্রয়।
দেবতা, নরের মত স্তাবকের নহে বশীভূত,
কল্যাণের রূপে আসে তেজস্বীর কর্মে অনাহূত।
শক্তিরে পূজেছ তুমি স্ব-শক্তিরে অস্বীকার করি
অশক্ত, অশাক্ত ঘোর—তার পূজা ল'ন না শঙ্করী।
শক্তির অর্চনা নহে ভীতি মূঢ় আত্মনিবেদন,
তাঁর পূজা তেজোদৃপ্ত দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়-বোধন।
ধর্মভীরু, ভয়ে ভয়ে ধর্মেরেই করেছ বর্জন,
আত্মশক্তি বিস্মরিয়া অভিশাপই করেছ অর্জন।

শঙ্কিতে কে দেবে আশা, সবে তার শঙ্কাই বাড়ায়,
সে শঙ্কারে মূলধন করি ধূর্তে ব্যবসা চালায়।
বীরেরই রথের বল্গা ধরেছেন নিজে নারায়ণ,
সাহসীর সাহসেই দেবতাও যোগায় ইন্ধন।
বিস্মরি কল্পনা-সৃষ্ট যত উপ-অপদেবগণ
আত্মদেহ মন্দিরের দেবতারে কর আমন্ত্রণ॥

স্বাস্থ্যশ্রী

সতেজ সরল সবল শ্যামল পল্লবঘন দেহ
শাল তরুবর হেরি মনোহর মুগ্ধ হয়েছ কেহ?
দিয়াছে স্বাস্থ্য পাহাড়ী মাটির রস-সার জলবায়ু
তাই সে অমন রূপের সঙ্গে পেয়েছে দীর্ঘ আয়ু।
তাজমহলের অপরূপ রূপ হেরি কে মুগ্ধ নয়?
নবনীকান্তি দেহটি কিন্তু তার প্রস্তরময়।
গভীরে নিহিত সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়াছে স্বাস্থ্য বল
তাই সে অমন চাঁদের আলোকে আজো করে ঝলমল
মোতির অঙ্গ দ্যুতিলাবণ্যে লীলাতরঙ্গময়,
হীরক তাহার জ্যোতির ছটায় তমোরাশি করে ক্ষয়।
কোথা পায় এরা এমন সুষমা? কঠোর অণুর দল
ঘন সংহত দিয়াছে স্বাস্থ্য তাই এরা উজ্জ্বল।
মোটরবিহারী সৈনিকে হেরি জুড়ায় নয়ন কার?
সবল অশ্বে দৃঢ়কায় বীরে দেখেছ কি একবার?
অসুরের মত স্বাস্থ্য বীরের পশুর স্বাস্থ্য সনে,
মিলি শূরশ্রী করে যা রচনা আছে তা কবির মনে।
স্বাস্থ্যের দৃঢ় বৃন্তেরি পরে রূপের কুসুম ফুটে,
নহে প্রসাধনে বসনে ভূষণে বিলাসের সম্পুটে,
স্বাস্থ্যই হ'ল দৃঢ়কঙ্কালে পিশিতচর্মে রূপ,
সৌরভ যদি লাবণ্য, তবে—স্বাস্থ্য তাহার ধূপ॥

বাদল শেষে

ভোর থেকে আজ বাদল টুটেছে আয় গো আয়।
হাসিতেছে রোদ সকল বাড়ীর চিলেকোঠায় ॥
সাঁকোর তলায় কমিয়াছে জল,
চলে ট্রাম গাড়ী, থেমেছে বাদল,
হর্ন বাজাইয়া চারিদিকে পুন মোটর ধায়।
ভোর থেকে আজ টুটেছে বাদল আয় রে আয় ॥

ভিখিরীরা পুন বাহির হয়েছে ফাটায়ে গলা,
ছাতা-হারা যত মাথায় ভরেছে ধর্মতলা।
দুইদিন পরে বসেছে বাজার,
গন্ধ উঠেছে পিঁয়াজী ভাজার,
আনাজ কিনিতে থলে হাতে ক'রে সবাই যায় ॥

ফেরিওয়ালারা ডাক দিয়ে যায় নানান স্থুরে ?
বাদল থেমেছে দেখ না বাদলা পোকারা উড়ে।
ড্রেন সাফ করে ধাঙড়ের দল,
ফুটপাথ আর নয়ক পিছল,
আজ আর ভাই আফিস কামাই শোভা না পায়

এখন হইতে সিনেমা দুয়ারে জমেছে ভিড়।
আসিছে পিয়ন হাতে যার বোঝা ভিজে চিঠির।
চলেছে গোয়ালা দুই দিন পরে
গোরু নিয়ে দুধ যোগাবার তরে,
রেলিঙে রেলিঙে দুদিনের ভিজে শাড়ী শুকায়।
আজ ভোর থেকে বাদল টুটেছে আয় রে আয় ॥

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘমুক্ত' কবিতার প্যারডি

চাষীর ঠাকুর

ভদ্রপাড়ায় ভিখ দিলে না আবার ফিরে এলে ?
বেশ করেছ ! ত্রিশূলখানা কোথায় এলে ফেলে ?
আপদ গেছে। হেথায় থাক ঘুর্‌তে কেন যাবে ?
আমরা যদি দু'মুঠো পাই তুমিও তা' পাবে ॥

হল চালায়ে খেটেই খাবে ? তবেই সর্বনাশ !
ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়েই বসো কর্‌তে দিলে চাষ।
আগ্‌লাতে ক্ষেত দিলে তামাম ফসল সাবাড় হয়।
ধানের বোঝা বইতে আধেক জটার ভিতর রয় ॥

গাই চরাতে দিলে বাছুর দুধ পিয়ে সব খায়,
সেঁচতে দিলে সেচন ফেলে নাচন তোমার পায়।
কোদাল তোমার হাতে দিতে ভর্‌সা কি হয় কারো ?
আগাছা সব রেখে আসল গাছের দফা সারো ॥

কাজের কথা আর তুলো না। যতই কাঙাল হই,
তোমায় দুটো অন্ন দিতে আমরা কাতর নই।
বল্‌ছি ঠাকুর বাঘের চামড়া আর হবে না পরা,
তাঁতী খুড়োয় ব'লে তোমায় বুনিয়ে দেব ধড়া ॥

মড়ার খুলি দাও ফেলে, ছিঃ ! দিচ্ছি পিতল লোটা,
ইচ্ছামত ওতেই খেয়ো সিদ্ধি হ'লে ঘোঁটা।
আমরা তোমায় ভালবাসি, কি আছে অই মুখে !
ইচ্ছা করে তোমায় ঠাকুর আঁকড়ে' ধরি বুকে ॥

বামুন পাড়ায় আর যেও না ক্ষেপায় ওরা বড়,
মোদের সাথেই তামাক টানো, গল্পগুজব কর।
বাজাও শিঙা, নৃত্য কর' মোদের আঙিনাতে,
ডম্বরু বাজায়ে মোরা নাচ্‌ব সাথে সাথে॥

ফুরায় না

সকাল থেকে ধরলে খুকি কান্না—ফুরায় না তা ফুরায় না।
জামাই এলে পিসী করেন রান্না—ফুরায় না তা ফুরায় না।
ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন কথকে—ফুরায় না তা ফুরায় না।
গান ধরেছে ধোবার গাধার মত কে—ফুরায় না তা ফুরায় না।
মুক্তি বাবু সভায় করেন বক্তৃতা—ফুরায় না তা ফুরায় না।
নরেন ভায়ার গল্প লেখার শক্তি, তা—ফুরায় না তা ফুরায় না।
কানের কাছে কাঁসর-বাজা আরতি—ফুরায় না তা ফুরায় না।
শ্বশুরবাড়ীর গল্প করে ভারতী—ফুরায় না তা ফুরায় না।
ডাল ডাঙ্গা ক্রোশ রাঢ়ের মাঠের রাস্তা—ফুরায় না তা ফুরায় না।
সাত নকলে হচ্ছে আসল খাস্তা—ফুরায় না তা ফুরায় না।
বে-রসিকের আনাগোনা বাড়ীতে— ফুরায় না তা ফুরায় না।
মধুসূদন দাদার দধি হাঁড়িতে—ফুরায় না তা ফুরায় না।
লাউড স্পীকার হাঁকছে সারা শহরে—ফুরায় না তা ফুরায় না।
কবিতার বই পাঁচশো, পঁচিশ বছরে—ফুরায় না তা ফুরায় না॥

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

আষাঢ়ে আদি বাসরে যবে উদিল মেঘ গগনে,
কি স্মৃতি কবি জাগিল মনে সহসা শুভ লগনে।
অকথিত সে কী গূঢ় কথা বলিলে তারে জানায়ে ব্যথা?
যক্ষ উপলক্ষ শুধু তোমার প্রেম-স্বপনে।

হে কবি, তুমি কল্পলোকে পাঠালে কোন বারতা,
দূতটি তব প্রতি জনমে স্মরণে আনে সে কথা।
অসীমে প্রতিলিপিটি তার মর্মবাণী সে বারতার
পাঠাই মোরা প্রতি বরষে লভে তা নব-নবতা।

মেঘমসীতে লিখিল তব চপলাঘন লেখনী
স্মৃতিফলকে প্রতিপলকে গুমরে আজো সে ধ্বনি।
প্রেমতৃষারে চাতকীরূপ দিয়াছ মেঘে হে কবিভূপ,
ত্রিলোক লাগি লিখেছ তুমি একের লাগি লেখনি।

হে কবি, তুমি জানি না কোন অলকাপানে চাহিয়া
শোকেরে শ্লোকে মেদুর করি ভূলোকে গেলে গাহিয়া।
উজ্জয়িনী রাজসভার পূজ্য যিনি কি ব্যথা তাঁর?
খুঁজেছ কোন দ্যুলোকে কূল মেঘের তরী বাহিয়া?

হে কবি, অভিশাপের কথা ব্যথিত চিতে স্মরি যে,
ইহজীবন-প্রবাসে কহ কাহারে দূত বরি হে?
অলকাস্মৃতি ভূলোক-তীরে উদাসী করে এ প্রবাসীরে
স্বধামে যাব কবে যে ফিরে, অকূলে কোথা তরী সে॥

গাধা

উষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভাই ছাগলের দাদা তুমি গাধা,
অশ্বের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি কে তোমার বুঝিবে মর্যাদা ?
শীতলা-বাহন ছিলে, ছিল তব মান,
সে মান হরিয়া নিল ভ্যাকসিনেশান।
বিবিরা বাবুরা শেষে তব মান ইজ্জত বাঁচায়।
রাশি রাশি ধুতি শাড়ী ঘন ঘন তাহারা কাচায়।
ধোবার বাবার সাধ্য নয়—
সে গন্ধমাদন ঘাড়ে বয়।
সর্বংসহ ধুরন্ধর তোমার শরণ—
নিল শেষে রজকনন্দন।
হলে তুমি 'রাজকীয়' জীব—
অনেক টাকার বেশ তব অঙ্গে। কে বলে গরীব ?
বিলাসিনী বিলাসীর পরম বান্ধব হ'ল ধোবা,
তাহার বান্ধব তুমি, হে নিরীহ বোবা।
নিঃশব্দে বহিছ ভার তাই তোমা বোবা বলিলাম,
তোবা, তোবা! কে না জানে তব কণ্ঠস্বরের সুনাম ?
রেডিওর যোগ্য তব উচ্চ কণ্ঠরব
তোমার সঙ্গীত যেবা বুঝেনাক সেই তো গর্দভ।
বক্তৃতা করিলে তুমি মায়িকের নেই প্রয়োজন,
অমায়িক জীব তুমি, দীর্ঘপুচ্ছ সুদীর্ঘশ্রবণ।
কোটপ্যান্ট পরি' যবে বসো গিয়ে আফিসে চেয়ারে,
তখন গর্দভ ছাড়া কে চিনিতে পারে ?

পল্লীর বেদনা

নীরব হয়েছে গ্রাম, অশথ-পাতার গায়
জ্যোছনা করিছে ঝিকমিক,
বাঁশবনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, বাতাবি ফুলের বাস
মাঝে মাঝে ভুলে যায় দিক্।
ছেঁড়া মাত্রের পরে ঘুমাইছে অকাতরে
মাতৃহারা ছেলেমেয়েগুলি,
মাঝে মাঝে স্বপ্ন-ঘোরে তাহাদের শীর্ণ বুক
দীর্ঘশ্বাসে উঠে ফুলি ফুলি।
দাওয়ায় বসিয়া পাঁচু ভাবে গালে রাখি' হাত
চোখে জল ঝরে দরদর,
সারা দিন খেটে খুটে নিরিবিলি এই তার
কাঁদিবার শুধু অবসর।
ভাবে পাঁচু মনে মনে ক'রে ত গোরুর সেবা
ক্ষেতে মাঠে সব কাজ সারি',
এই ত বাটনা বেটে শাক পাত নিয়ে কুটে
দুই বেলা রাঁধতেও পারি।
নাওয়ায়ে খাওয়ায়ে নিতি এদের পাড়াই ঘুম,
তামাক নিজেই নিই সেজে।
গাঁয়ের পুকুর হ'তে আনতেও পারি জল,
থালা-বাটি নিজে নিই মেজে।
পেটে ছেলে পিঠে ছেলে রান্নাঘরে ঢেঁকিশালে
খেটে যেত সেত দিন-ভোর,
সবল দেহটা নিয়ে দেখে ভাবতাম ব'সে,
সে-কাজ আমার নয়,—ওর।

একেলা সবিত পারি।   করিতাম রাগারাগি,
বুঝিনিক কেন তার জ্বালা?
যা এ-মুখে এল তাই   বলেছিনু এক দিন
ভেঙ্গে গেলে পিতলের থালা।
খেটে খেটে হায়রান   হলো কি তাহার জান?
চ'লে গেল তাই ক'রে রাগ?
কোন দিন মুখ ফুটে   বলেনি ত, 'নাও তুমি
একটুকু খাটুনির ভাগ।'
হাতে হাত রেখে মোর   ব'লে গেল,—'নাও এই
ছেলেপুলে, রইল সংসার,
চ'লে যাই পিছে চাই   ভেবে বড় ব্যথা পাই,
একলা কেমনে ব'বে ভার।'
আজ যদি ফিরে আসে   বলি তবে—'দেখ ব'সে
একলাই সব আমি পারি,
খোকাধনে কোলে ক'রে   তুমি শুধু দেখে যাও,
ছেড়ে দাও ডালা-কুলো-হাঁড়ি।
ও খাটায় এ দেহের   কিছুই হ'বে না ওগো,
আমারে মরণও করে ভয়,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ,   তুমি শুধু বেঁচে থাক,
ঘরখানি করে আলোময়।'

ভাঙাঘাট

কবে কোন পুণ্যবতী বেঁধেছিল গঙ্গায় এ ঘাট
শতাধিক বর্ষ আগে, এখন ধরেছে তাতে ফাট।
সে ফাটলে গুল্মলতা, আ-গাছারা, খাঁজে খাঁজে তার
ঘনঘাস মাথা তোলে। ভেঙে গেছে এর ডান ধার।
দু পাশে অশ্বত্থবট শিকড় চালায়ে গঙ্গাজল
পিইতেছে, শেওলায় ধাপগুলো শ্যামল পিছল॥

হয়েছে জলের কল, নলকূপ তীরাশ্রিত গ্রামে,
পানীয় জলের জন্য কেউ আর এ ঘাটে না নামে।
গঙ্গা এবে নদীমাত্র। তবু আজো বলি' গঙ্গামায়ী
কেউ কেউ ভক্তি করে, হেথা তারা আজো নিত্যস্নায়ী।
কেউ করে শিবপূজা, কেউ জপ করে হেথা বসি।
কেউ স্তবগান করে—'মুক্তিদাত্রী জননী ত্বমসি।'
স্নান, দান, ধ্যান করে আজো কোন কোন পুণ্যলোভী,
রেখেছে বাঁচিয়ে এরে তাই ভেবে হয়ত জাহ্নবী।
তরুলতা তৃণগুল্ম শত শত গঙ্গার সন্তান
নয়ক সম্মত তাতে, করে তারা তাই অভিযান
মাতৃভূমি উদ্ধারিতে, চলে তাই নিঃশব্দ সংগ্রাম
ইষ্টক প্রস্তর সহ শতবর্ষ ধরি অবিশ্রাম।
এহ বাহ্য। মানুষের বহু আগে আদি অধিকারী
পৃথিবীর,পরাভূত হয়ে এবে কৃপার ভিখারী ;
অন্তরে অনল পুষি আছে মৌন মূক প্রতীক্ষায়
মানুষের অন্তর্দ্রোহ-দ্বন্দ্বে কবে পাইয়া সহায়,

একদিন মাতৃভূমি এ পৃথিবী করিবে উদ্ধার,
এই ভাঙা ঘাটে বসি পূর্বাভাস পাই যেন তার।
ফাটলে শিয়ালকাঁটা আলকুশী দেখি বর্ধমান
নরজগতের ফাটে অরণ্যের বুঝি অভিযান ॥

মাল্য দান

বেলাফুলে মালা গাঁথি
দুলাও আমার বুকে তুমি প্রতি রাতি।
ভুলাও আমার খ্যাতিহীনতার ব্যথা—
বুঝি নাকি সেই কথা ?
সে মালা পরাতে নিশীথশয়ন 'পরে
কণ্ঠে আমার, কুণ্ঠায় তব হাত কাঁপে দ্বিধাভরে।
মনে তব দ্বিধা, দশের সভায় যশের মাল্য পেলে
তোমার পরশ-রসের মাল্য দিই যদি কভু ফেলে ॥

মা ভৈঃ প্রেয়সী, যশের মাল্য পাই যদি আমি তবে
তোমারে পরাব, তোমারি মাল্য আমার কণ্ঠে রবে।
যশের মাল্য তোমারি পরশে হবে প্রিয়ে সৌরভী,
কাকেরে তুমিই পিক বানায়েছ, আমারে করেছ কবি।
ভুলে গেলে সুন্দরি,
তোমারি প্রেমের নান্দী গাহিতে কবিতায় হাতে খড়ি

পরিত্রাতা

বার কত সঙ্কটে মোরে অঙ্কে টানিয়া ধরিলে, প্রভু,
বার মুখে বিষের পাত্র আড়াল হইতে হরিলে, প্রভু।
বার কত অকূল পাথারে, ভেলা হয়ে তুমি বাঁচালে আমারে,
মতীর এপার-ও-পারে মায়া-সেতুখানি গড়িলে প্রভু॥

বার তব চক্রে এ শিরে বজ্র বারণ করেছ তুমি,
গুলি পক্ষে কত বিষফণা আপন বক্ষে ধরেছ তুমি।
গক্ষেমের' ভার বহি শিরে ভরেছ রিক্ত ভাণ্ডারটিরে,
তৃষ্ণায় যবে প্রাণ যায় ভৃঙ্গার মোর ভরিলে প্রভু॥

নর হরি' দাহিকাশক্তি দাবানলে মোরে রেখেছ ঢেকে,
হবৃকের হরি' জিঘাংসা বাঁচালে তাদের কবল থেকে।
্য-পীড়নে প্রহ্লাদসম কতবার হ'লো উদ্ধার মম,
দাসেরে' গঙ্গার তীরে তরীতে যেমন তরিলে, প্রভু॥

ক্রের তল হতে রথি, কতবার তুলে নিয়েছ রথে,
বনায় নিরুৎকণ্ঠ চলি তাই আজ যাত্রাপথে।
রিতে তুমি এত দয়া করো, ছুটে এসে, রোগে বুকে চেপে ধরো,
নিশ্চয়, ওগো দয়াময় দিবে বরাভয় স্মরিলে কভু॥

ভ কৃপায় বেড়েছে সাহস, জীবন আহবে ডরি না কিছু,
' রণব্যূহে বিপদ সমূহে চলিব আগায়ে, র'বনা পিছু।
বচে রাখিয়াছ ঘিরে নয়ন আড়ালে সমরে শিবিরে
ন জীবনে অমৃত ভুবনে বাঁচিব কৃপায়, মরিলে প্রভু॥

শিবরুদ্র

মিথ্যা মোহে তোমায় ডরি, মিথ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি,
কর-করোটি অমৃতে তব পূর্ণ,
মরণে তুমি করেছ জয় শরণে তব কিসের ভয়?
শঙ্কর,—এ শঙ্কা কর চূর্ণ।

ঈশান তব বিষাণ-রবে প্লাবন আসে ভীষণ তবে
বিশ্ব নব তাহাতে লভে সৃষ্টি,
মাভৈঃ বাণী গর্জ্জি কহ শুনিতে শুধু শঙ্কাবহ,
অশনি সনে জীবনই কর বৃষ্টি।

তৃতীয় আঁখে জ্বালার ছটা বিথারে জলদর্চ্চি-ঘটা,
গঙ্গা বাঁধা পিঙ্গ জটাপুঞ্জে,
ইন্দু তব ললাটে জ্বলে জনম দেয় প্রসূনফলে
ওষধি-মধু-ভেষজে গিরিকুঞ্জে।

অট্টরবে শঙ্কা রটে, তবুও তা'ত হাস্য বটে
অভ্রভরা—শুভ্র যেন কম্বু,
ভুজগ শত অঙ্গে ধরি' ঘুরিছ প্রেত সঙ্গে করি',
বৎসলতা লুকাবে কোথা শম্ভু?

পিনাক তব জ্বলিছে করে, ভক্ত তাহে মিথ্যা ডরে,
ক্ষণিক তব ছলনাভরে রুষ্টি,
শুভের লাগি ধ্বংস কর' ধ্রুবের লাগি সর্ব হর',
তুমি যে শিব সহজে তব তুষ্টি।

অধ্রুব যা তাহারি তরে রুদ্রশূল তোমার করে
কাঁপুক ডরে ত্রিপুর, হেম-লঙ্কা,
তোমার যেবা শরণ লয় তার কি রহে মরণভয় ?
চরণে নত মোদের কিসে শঙ্কা ?

করুণা তব লভিল অহি, ধন্য বিষ কণ্ঠে রহি,
পাবে না কৃপা অমৃতস্য পুত্র ?
মৃতেরো মহাশঙ্খগুলি গাঁথিয়া গলে লইলে তুলি',
জীবনে ঠাঁই দেবে না তার সূত্র ?

প্রমথ-প্রেত পিশাচগণ তোমার এত আপন জন,
পাবে না ঠাঁই মানুষ তব সঙ্গে ?
বিষ-ধুতুরা চরণে তব লভিল চিরশরণ, প্রভো,
নেবে না তুমি মোদের হৃৎপদ্মে ?

মরণ লভি বনের দ্বীপী বহিয়া জয়-কীর্তি-লিপি
কৃত্তি-পটে শোভিছে তব অঙ্গে।
দগ্ধ হ'য়ে ভস্ম হ'ব, তবুত তব অঙ্গে র'ব,
ডরি না তাই তোমার রোষ-রঙ্গে।

যা-কিছু ভবে ত্যাজ্য হেয় তোমার ভূষা ভোজ্য পেয়,
নিরাশ নই যদিও হীন তুচ্ছ।
আমাতে তব অংশ যাহা পাবে না প্রভু ধ্বংস তাহা,
হাড়ের চেয়ে লভিবে ঠাঁই উচ্চ।

পুনর্ভব উষার লাগি রয়েছি তব আশায় জাগি,
ঘুচাও মম মোহের তমোরাত্রি।
ক্ষুদ্র আমি রুদ্রে র'ব চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হ'ব,
—বিশ্ব হ'তে বিশ্বনাথে যাত্রী ॥

অন্তঃপুরের শাস্ত্র

মূর্তিমতী বিধিলিঙ্‌ তুমি মোর প্রিয়া,
বিপদ ঘটিল মোর শাস্ত্র পড়ি, তোমারে লইয়া
অবিরত জারি করো তোমার বিধান,
যুক্তিতে খুঁজি না পাই তাদের নিদান ॥

খাওয়া-পরা চলা বসা সবেতেই বিধি নব নব,
আমাদের শাস্ত্রে নাই, আছে শাস্ত্রে তব।
অলিখিত সেই শাস্ত্র কত যে বিরাট,
ভাবিয়া কুঞ্চিত হয় আমার ললাট ॥

শত শত বর্ষ হতে অন্তঃপুরে চলে যেই প্রথা,
সে প্রথার সংহিতায় তুমি পারংগতা।
বেপরোয়া আমি যুক্তিবাদী,
এই সব—কুসংস্কার, অপচার ইত্যাদি ইত্যাদি
বুঝাই সবারে দেশে গদ্যে পদ্যে, কিন্তু নত শিরে
তুমি যাহা বলো তাই পালি ধীরে ধীরে,
কষ্টে হাস্য করি সংবরণ,
রাখিতে গৃহের শান্তি, প্রেমের শাসন ॥

দীর্ঘকাল বেঁচে আছি তব আজ্ঞা মানি',
কেমনে তোমারে দূষি? হয়নিত জীবনের হানি।
তুমি বলো বেঁচে আছি তব বিধিপালনের ফলে,
কপালে সিন্দুর আছে, আমি বলি কপালেরই বলে ॥

ইলোরা

নির্জীব পাহাড়,
কি সম্পদ তব বক্ষে অনুভূতি হয় কি তাহার?
না-না মোরে করিও মার্জনা।
জীবন্ত করেছে তোমা ভারতের অমৃত সাধনা।
বিদর্ভ, পঞ্চাল, কুরু, উত্তর কোশল,—
একে একে সবি চূর্ণ করিয়াছে কালের মুষল।
শ্রাবস্তী, মথুরা, কাশী, দ্বারাবতী, ধারা, উজ্জয়িনী
করেছে বিধ্বস্ত নিঃস্ব যুগে যুগে লুণ্ঠক-বাহিনী॥

শত শত জয়-স্তম্ভ-চূড়া
রুদ্রের গদার ঘায়ে হয়ে গেছে গুঁড়া;
দশশত বৎসরের ভারতের কৃষ্টির গৌরব
গর্বোদ্ধত বর্বরের সর্ব উপদ্রব
হতে রক্ষা করিয়াছে তোমার পঞ্জর।
ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে ধ্বংসোন্মত্ত দস্যুর খঞ্জর।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈনদের আধ্যাত্মিক সাধনা সঞ্চয়
তব বক্ষে লভিয়াছে সন্ধি সমন্বয়।
শতশত শিল্পী গুণী কবি
রাখিল শিলায় ক্ষোদি ধ্যানলব্ধ হৃদয়ের ছবি।
তুমি জড় গিরি নও, তুমি নিজে গিরীশ শঙ্কর
শিলাব্রহ্ম মৃত্যুঞ্জয় রসগঙ্গাধর।
কৈলাসে তুমি না রও, তব বক্ষমাঝে
সে কৈলাস নব রূপে রাজে॥

শ্রীমন্দিরে

মন্দিরের শিল্পকলা ঘুরে ঘুরে চারিদিকে করি' নিরীক্ষণ,
পশিলাম শ্রীমন্দিরে, শ্রান্ত দেহে লয়ে মোর অবিশ্বাসী মন।
পুণ্যলোভী নরনারী দলে দলে সারি সারি করিয়াছে ভিড়।
তাহাদের পানে হানি কৃপাদৃষ্টি দাঁড়ালাম উচ্চ করি শির।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে খোল করতাল, সবে কৃতাঞ্জ
আরতির পঞ্চশিখা বিগ্রহের মুখখানি তুলিছে উজলি।
জগমোহনের তলে মধুর কীর্তন চলে, বাজিছে খঞ্জনী,
পূজারীরা দ্বারে বসি স্তবমন্ত্র পাঠ করে, উঠে জয়ধ্বনি।
জন্মজন্মান্তর পানে সহসা খুলিয়া গেল মানস-নয়ন,
মনে হলো দূরে কাছে যাহারা দাঁড়ায়ে আছে সবাই আপ
কোটি কোটি মানবের শুচি শুভ্র হৃদয়ের যত ভক্তিধারা,
ও বিগ্রহে কেন্দ্রীভূত, এই পরিবেষ মাঝে হইয়াছে হারা।
কোন দেব দেবী কভু রচিয়া তুলেনি এরে মহাতীর্থভূমি,
মানুষ রচেছে হেথা মহাতীর্থ, যুগে যুগে এর ধূলি চুমি
কোটি কোটি নর নারী যে বিগ্রহে করিয়াছে ভক্তি
কোথা আর ভগবানে এ বিশ্বে মিলিবে যদি সেথা নাহি র
অ য়জনের দলে দাঁড়ায়ে মন্দিরতলে হ'ল মোর মনে ;
কতকাল পরে যেন ফিরিয়া আসিনু আজি আপন-ভবনে।
মন থেকে গেল ভাসি আবর্জনা রাশি রাশি বিদেশী শিক্ষা
স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, ভয়াবহ পরধর্মে দিলাম ধিক্কার।
আমার উদ্ধত শির সবার শিরের সাথে নমিল ভূতলে ;
বহুদিনকার জমা মালিন্য চাহিল ক্ষমা তপ্ত অশ্রুজলে ॥

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় তুলসী-কুঞ্জে কি দিয়া তুষিব তোমার হিয়া ?
কোথা বীর-তরু তমাল নমেরু দেবদারু চারু নীপ ?
পলাশ-শ্রীর ললাটের 'পরে কোথা সে চাঁদের টিপ ?
শিরীষ-বালার অলক তুলায়ে পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া হেথায় মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায় না তার বেণী,
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত তুঙ্গ গিরির শ্রেণী ?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরে না গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতা-হৃদয় বিদারি এখানে ভরেনাক কেহ ঝারি।
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় বঙ্গ-অঙ্গনে তব কি দিয়া তুষিব হিয়া ?

ওগো পাহাড়িয়া বালা,
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কূটমল্লিকা-মালা।
প্রকৃতি হেথায় সুকৃতির রূপে বেঁধেছে কুটীরখানি,
আলিপনাআঁকা ছায়ামণ্ডপে এস গিরিবনরাণী।
ফুলবল্লরী-ভূষা পরিহরি ভবন-ভূষণ পর';
টান' শির 'পরে লাজ-গুণ্ঠন, শঙ্খবলয় ধর'।
আঁক' সীমন্তে সিন্দূর-রেখা, বাঁধ' কুন্তলরাশি,
হোক্ অচপল চরণযুগল, সংযত হোক্ হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা গিরিকুঞ্জের পাখী,
হরিণ-নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শত তরুণীর আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
হরিত পর্ণপুটে আনো গিরি-প্রকৃতি-হৃদয়-মধু ॥

কবি গোবিন্দদাসের মহাপ্রয়াণে

কাঙাল দেশের কাঙাল কবি যাচ্ছ আজি নেই যে ধামে
ধনীর পীড়ন, ধনের প্রয়োজন,
আজকে তোমার শুভক্ষণে চোখের জলে শোকের নামে
করব না পথ পিছল অকারণ।
সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল আজকে শ্মশান-বৈশ্বানরে
হর্ষে নাচে তোমার চিতার শিখা,
অমর হ'য়ে রইল শুধু কাব্য তোমার বাণীর করে,
দেশের ভালে কলঙ্কেরি টিকা ॥

দেশে সোনার মিনার উঠে, বাগ্‌দেবতার বালাখানা
তোষাখানার বিশাল আয়োজন,
জ্ঞান-সাধনার নামে দেশে জুটে বিলাসবস্তু নানা,—
সোনার অজিন, সোনার কুশাসন,
পরিষদের সভায় রাজা মহারাজার তাজের ছটা
গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি,
সম্মিলনে সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ-ঘটা,
পায় না খেতে দেশের আসল কবি ॥

বল্‌ছি বটে, সত্যি তোমার পেটের জ্বালাই বড় কথা?
তেজের জ্বালায় জ্বল্‌ত তোমার পেট।
সয়ে গেছ সেই জ্বালাতেই পাঁজরভাঙা হাজার ব্যথা
তবু তুমি হও নি কভু হেঁট।

মাগ'নি ভিখ দেউলিপথে ঝুলি কাঁধে বাউল সাজে
লেখনি নাম চিরদাসের খতে,
বাণীরে বানরী করি নাচাও নি লোকসভামাঝে
নাট্যশালার নেপথ্যেরও পথে।
চেষ্টা ক'রে হওনি কবি, কবি হয়েই জন্ম নিলে
প্রাচীন শ্যামল বাংলা মাটি চিরে,
তোমার কবি-প্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরী নহে শিল্পশালার ভিড়ে॥

পীড়ন-জ্বালায় দর্পফণা তুলেছিলে—সর্পকবি,
কাব্য-গীতির মলয়গিরির ভূমে,
কাঠুরিয়ার নিঠুর কঠোর কুঠারখানার পরশ লভি
ছড়ালে বিষ চন্দনেরও ক্রমে।
বাণী তোমার বজ্রবাণী, অগ্নিময়ী তোমার ঘৃণা,
শৃঙ্গী ঋষির শাপের মত গতি,
লেখনীরে করলে অসি, মুষল হলো তোমার বীণা,
ছিন্নমস্তা তোমার সরস্বতী॥

তোমার 'পরে অত্যাচারের চিত্র যখন নেত্রে ভাসে
করালী-রূপ ধরে আমার বাণী,
রুদ্র রূঢ় অমার্জিত তোমার ভাষণ কণ্ঠে আসে
ভদ্রকালীর শাসন নাহি মানি'॥

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ কুসুম-শরের হউক জয়,
তারা—করেছে প্রিয়ার দেহে নবরূপস্থষ্টি।
আলগুঞ্জিত চূতমঞ্জরী কণ্ঠে বিঁধিয়া ব্যর্থ নয়
সে যে—প্রিয়ার বাণীতে মধু-ধারা করে বৃষ্টি।

প্রিয়ার নয়ন লভি অপাঙ্গে তোমার ধনুর নীলোৎপল
হলো—আরো মদায়ত মানসহরণ-দক্ষ,
অধরে বিঁধিল চন্দ্রমল্লী হাস্যে ঝরিছে অনর্গল,
বুঝি—ভাঙিয়া দন্তে এক শর হলো লক্ষ।

অরবিন্দটি বিঁধিয়া বদনে তুইভাগে হলো ভগ্ন
দেখ—ভাগাভাগি ফুটি রহিয়াছে তুটি গণ্ডে,
অশোক-শায়ক চরণে বিঁধিয়া চির অনুরাগে লগ্ন
তথা—লাক্ষা হয়েছে ভেঙে গিয়ে শতখণ্ডে।

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ কুসুম শরের হউক জয়,
হোক্—ভরপূর পুন তোমার ও-তূণভাণ্ড,
মৃগীর মতন নয়ন বলিয়া মৃগী ভেবে তুমি হে রসময়,
তারে—মৃগয়া করিতে হের কি করেছ কাণ্ড!

বাউল পাখী

কুলায়ে যে শুনছ কলধ্বনি
তা'ত পাখীর ভোরের জাগরণী।
সোহাগ করে শাবকদেরে তায়
ওকে পাখীর গান বলা না যায়।

মুকুলিত রসাল-শাখায় থেকে
ভোর থেকে সে ক্লান্ত ডেকে ডেকে,
ভুল ক'রে তায় আমরা বলি গান
ও তো পাখীর প্রিয়ারে আহ্বান।

খাঁচার পাখী ডাকছে অনিবার,
ক্ষুধায় কিনা কে খোঁজ রাখে তার?
সে ডাকে তো জুড়ায়নাক কান,
আর্ত্তনাদেই আমরা বলি গান।

শরৎ প্রাতে নীলাম্বরের তলে
কলকণ্ঠে ডাক দিয়ে সে চলে।
দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সুর
তাইত পাখীর সঙ্গীতি মধুর।

খাঁচায় পাখী পরের তক্‌মাধারী,
তরুর শাখায় প্রেমিক বা সংসারী।
নীল আকাশে পথের বাউল বুঝি,
গান ছাড়া তার নেইক কিছুই পুঁজি॥

বৃথাকাজে

পাখীরা সব চঞ্চুপুটে আহার নিয়ে ফিরছে নীড়ে,
পাটনী শেষ খেয়ার শেষে নৌকা ভিড়ায় নদীর তীরে।
তপন তাহার দিনের খেয়ার তরী ডুবায় কোন অতলে।
হাটুরেরা মাঠের পথে ঘাটের পানে ছুটেই চলে।
দিনের পূজন সমাপিয়া দেউলে শাঁখ ঘণ্টা বাজে।
আমার, দিনটা ফুরায় হায় অকাজে॥

সুগন্ধধন বিলিয়ে দিয়ে ফুলগুলি সব পড়ছে ঢুলে।
গৃহের কর্ম শেষে বধূ প্রদীপ জ্বালে তুলসীমূলে।
শ্রমিকরা কারখানা থেকে ফিরছে ডেরায় মলিন গায়ে।
ফিরছে চাষী লাঙল কাঁধে, গাভীরা সব শ্রান্ত পায়ে।
ভিখারীরা ঝুলির চাউল দেখছে মেপে কতটা যে।
আমার, দিনটা ফুরায় হায় অকাজে॥

ধরার কর্মক্ষেত্র থেকে হয়ে গেছে আমার ছুটি,
সারাটা দিন কি যে করি কেবল বসি কেবল উঠি।
কাজ যে বাকি মস্ত বড় সেই কথাটাই ভুলে থাকি,
যেতে হবে অনেকদূরে আয়োজন তার সবই বাকি।
চমকে উঠে করছি স্মরণ কাণ্ডারীরে এখন সাঁঝে।
আমার, দিন ফুরালো বৃথা কাজে॥

শরতের সান্ত্বনা

বসন্তের সম্পদ অতুল
পুষ্পের ঐশ্বর্য তার বনে বনে অজস্র প্রতুল।
মুকুলিত চূত বৃক্ষে তৃপ্ত কণ্ঠে গায় কত পাখী
মলয়সমীর বয় পুষ্পরেণু মাখি।
বসন্তেরে কে না ভালবাসে?
চিত্ত হয় উদ্বেলিত প্রেমের উল্লাসে।
তোমার রচনা নয় কুসুমাঢ্য বসন্তের মত।
না-ই হ'ল, কবি কেন তায় লজ্জানত?

গ্রীষ্মের ভাণ্ডার ভরা ফলের বৈভবে,
উদ্যানভূমিতে তার সর্বজীব মাতে মহোৎসবে।
বেলি চামেলির গন্ধে পবন মদির,
স্নানে পানে তুষে সবে জলধারা তড়াগ নদীর।
তরুর ছায়ায় স্বপ্ন ঘনাইয়া আসে।
নিদাঘেরে কে না ভালবাসে?
তোমার রচনা নয় ফলাঢ্য সে নিদাঘসমান।
না-ই হ'ল, কেন কবি মুখ তায় ম্লান?

বর্ষায় ধরণী পায় নবীন জীবন,
শীতল শীকরসিক্ত ধূলিশূন্য বহে সমীরণ।
গিরির ঐশ্বর্য বহি দু'কূল ছাপায়ে নদী ধায়,
গগনের ঘনঘটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সম্পদ বিলায়।

বরষারে ভালো কে না বাসে ?
কেতকীর গন্ধ পায় নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
তোমার রচনা নয় বরষার প্রাচুর্যে উচ্ছল,
তাতে কেন কবি তব নয়ন সজল ?

শরতেরও আছে শোভা, তারো আছে দান,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল রবিকরে চন্দ্রিকায় ধরা করে স্নান।
নদীনীর হয় স্বচ্ছ, ব্যোমে চলে হাসিকান্না খেলা,
শেফালি, কুমুদ, কাশ, কমলেরে কে করিবে হেলা ?
নাই তার ঘটাছটা আভরণ, বিলাস মণ্ডলী,
নিঃস্ব নয় তবু সেত শান্তশুচি অনুদ্ধত বলি।
শরতেরে ভালবাসে তবু কেহ কেহ,
কেন কবি তাহাতে সন্দেহ ?
বাঙ্ময় শরৎ কবি তোমার রচনা,
বৃথা তবে তোমার শোচনা॥

বিদ্যাসাগর

কত রূপে হেরি তোমা বহুরূপী হে মহাসাগর,
—দুঃখের আঁধার রাতে দীপ্তচূড় তরঙ্গে ভাস্বর।
পূর্ণিমার চন্দ্রিকায় করুণাক্ত আনন্দে উজ্জ্বল,
সংগ্রামে ঝঞ্ঝার সাথে উদ্বেল উচ্ছল;
বিগলিত মর্মের নীলিমা
মিশিয়া ব্যোমের অঙ্গে খুঁজিয়াছে অনন্তের সীমা।
তোমার ঘটনাঘন জীবনের কথা
স্মরিয়া স্তম্ভিত কভু, কখনও-বা পাইয়াছি ব্যথা।

সকলি ভুলিয়া গেছি, স্মরি যবে জীবন তোমার,
একটি নগণ্য তুচ্ছ চিত্র মনে জাগে বার বার।
দরিদ্র সংসারে তৈল, বাতি কোথা পাবে?
গৃহে তাই আলোর অভাবে
পথের আলোর পাশে পুঁথিখানি হাতে
পড়িছ তদ্গত চিত্তে দাঁড়াইয়া একা ফুটপাথে।
জনকোলাহলময় পাশে রাজপথ
নিনাদি চলিয়া যায় কত অশ্ব রথ।
রজনী ঘনায়
কার্ত্তিকের মুঠা মুঠা শামা পোকা ঝরে তব গায়,
উড়িছে শলভকুল মাথায় উপরে,
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য তুমি পুঁথির অক্ষরে।
কত লোক যায় আসে, চাহিল কি কেহ অপলকে?
চিনিল কি মহামাণবকে?
দেখিল কি সর্বংসহ হিমদৈন্য মাঝে
'স্ফুলিঙ্গাবস্থায় বহ্নি এধাপেক্ষ' হইয়া বিরাজে?

চতুর্দশপদী

আমি

(বীরবলের অনুসরণে)

ফার্স্ট ক্ল্যাস পেয়ে পাস করিনিক এম-এ,
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাই নি চেয়ার।
বলিতে পারি নি—'কিছু করি না কেয়ার,'
বক্তৃতা করি নি মঞ্চে সর্ব-অঙ্গে ঘেমে।
শেক হ্যাণ্ড করেনিক সাহেব বা মেমে,
জুটেনিক বড় বড় দোস্ত বা ইয়ার,
গ'ড়ে উঠেনিক দেশে স্তাবক-স্কীয়ার,
পড়িনিক গুণবতী মহিলার প্রেমে।
নমস্যগণেরে ঠেসে দিইনিক গালি,
বিপন্ন করি নি কোন গ্রন্থ-প্রকাশকে,
ছুঁড়ি নি কাহারো গায়ে পাঁক কিংবা কালি!
ঠেকিয়া শিখি নি কিছু, ঠকায়েছে ঠকে।
ছাপোষা মানুষ, মাথা করে রই হেঁট,
কুড়ানো তিলের তালে ভরে রয় পেট॥

পুরস্কার

যে পথে চলেছি তা'ত মহাযাত্রা-পথ,
পিচঢালা নয় এযে পাঁকে ভরা মেটে।
লাঠিভর দিয়ে চলি উঠে পড়ে হেঁটে।
এই পথে কোনদিন চলেনাক রথ,
এ পথে পাথেয় দেয় গীতা ভাগবত,
মিলে শুনি কাণ্ডারীর শ্রীচরণ চেটে,
সে পাথেয় নেই মোর গাঁঠে কিংবা পেটে।

আর্জব যে, হাতে আর নেই ভবিষ্যৎ।
আয় নেই, এপথেও রয়েছে খরচ,
শূন্য হলে চলেনাক রুধির কড়ছ।
টাকা চাই এ পথের কমাইতে ক্লেশ
অর্থাৎ ঔষধপথ্য করিতে যোগাড়,
উস্কাতে জীবন-দীপে শলিতার শেষ,
মন্দ কি যদি বা পাই কিছু পুরস্কার॥

বেজি

ফুলায়ে লোমশ লেজ দুলাইছ, বেজি,
গারুড়ী, গরুড়ে স্মরি তোমারে প্রণাম।
মনসারে মান নাক' এত তুমি তেজী,
তোমার নয়ন দু'টি অমৃতের ধাম।
ঘুরিতেছ শ্যেনদৃষ্টি, শাখায় শাখায়
নির্ভীক চরণে যেন নিঃশব্দ প্রহরী।
সর্পেরা কোটরে ভয়ে কুণ্ডলী পাকায়।
বিষে বিশেষজ্ঞ তুমি যেন ধন্বন্তরি।
যাহারা গড়িছে দেশে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
ইঁদুরে ভরিবে তা যে তা কি তারা বোঝে?
দুধকলা দিয়ে চাই পোষণ তোমার
আসিবে যে পীত সর্প ইঁদুরের খোঁজে!
সর্বাগ্রে চাই যে বেজি, তোমার আদর,
মর্যাদা বুঝিত তব চাঁদ সদাগর॥

ভূদেব

বিজাতীয় ভাববন্যা এলো দেশে উদ্বেল প্লাবনে
আঘাতিয়া বাঙ্গলায় যুগজীর্ণ জাতীয় জীবনে,

অকস্মাৎ ঘূর্ণাবর্তে ধ্বসিতে লাগিল শ্লথমূল
সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সংসারের কূল।
স্রোতে দিল গা ঢালিয়া ক্রমে সবে হারায়ে বিশ্বাস
আপন জাতীয় ধর্মে। একা তুমি করিলে প্রয়াস
রোধিতে সে ভাববন্যা, আপনার সর্বশক্তি দিয়া।
সে পৌরুষ তেজস্বিতা বঙ্গভূমে কে যাবে ভুলিয়া
আজিকার এ দুর্দিনে? মর্মে মর্মে বুঝেনি কে দেশে
জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যদি মোহস্রোতে যায় চলে ভেসে
মনুষ্যত্ব যায় সাথে? জিনি সর্ব মায়া-প্রলোভন
আত্ম-স্বত্ব-বুদ্ধি তুমি বাঁচাইলে হে বীর ব্রাহ্মণ।
কর্মী ছিলে, গুরু ছিলে, ছিলে প্রাজ্ঞ ভাবুক রসিক
আজ স্মৃতি-লোকে তুমি হে ভূদেব, দেবেরো অধিক॥

তৃষা

তরুর তৃষা মরুর বুকেও রসের সৃজন করে,
মরুর তৃষা জাগায় স্নেহ পাষাণ-পয়োধরে।
ফুলের বুকে গলায় মধু অলির তৃষা-ক্ষুধা,
বঁধুর তৃষা জাগায় বধূর অধরপুটে সুধা।
ব্যোমের নয়ন সজল করে তৃষিত বৈশাখ,
তৃষার বেগে গলায় মেঘে ফটিক-জলের ডাক।
শিশুর তৃষা বৎসলতার উৎস আনে টানি,
পাখীর তৃষা সরস করে ফলের হৃদয়খানি।
রসের তৃষায় যশের তৃষায় গান র'চে যায় কবি,
রূপের তৃষায় রঙীন নেশায় শিল্পী আঁকে ছবি।
সুখের তৃষা ভরায় ধরা কর্ম-কোলাহলে,
মোচন-তৃষা ধর্মে জাগায় ভক্তলোচন জলে।

ব্রহ্মতৃষায় জ্ঞান-যোগীরা লীলায় ভাবে মায়া,
লীলার তৃষায় ব্রহ্ম স্বয়ং ধরেন মানব-কায়া ॥

অনুষ্টুপ্

শুভক্ষণে জন্ম নিলে বাল্মীকির কণ্ঠে অনুষ্টুপ্
ভারতী বীণায় তায় পাইলেন তপোলব্ধ সুর !
সে সুর খনিত্র হয়ে বিরচিল লক্ষ রসকূপ,
কণ্ঠের পারুষ্য যাহা হিল্লোলিয়া করি দিল দূর।
লৌকিক যা কিছু তার দিলে তুমি অলৌকিক রূপ,
শুষ্ক তত্ত্ব তথ্যে সত্যে করিলে সরস সুমধুর,
ভাণ্ডারে বিন্যস্ত হ'ল জ্ঞাতব্যের রাশীভূত স্তূপ।
নিয়ে গেলে দেবলোকে সমবেত প্রার্থনা বহুর।
ঋষির তপস্যা হ'ল তব অঙ্গে কোটি কোটি ধূপ,
এ ভারত আমোদিত পরিমলে তোমার তনুর।
তোমার প্রসাদ তরে জ্ঞানী গুণী সবাই লোলুপ।
তোমায় শাসনে বন্দী বাণীধারা সকল মনুর।
ভারত-গৌরব তব যুগে যুগে নব অবদান
সর্ববিদ্যা, রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা, ভারত পুরাণ ॥

মেঘ

সন্তপ্ত-শরণ মেঘ, বন্ধু তুমি, দ্বিধা নাহি তায় ;
একই দশা দুজনের বিরহার্ত বর্ষার বাত্যায়।
তুমিও গাহিছ বন্ধু মোরই মত বিরহের গান ;
থেকে থেকে চপলায় চমকিয়া উঠে তব প্রাণ।
গুমরি গুমরি বক্ষে গুরুব্যথা তোমারো বিহরে,
বজ্রনাদে মোরি মত তোমারো-ত হৃদয় বিদরে।

আমারি মতন তব দু'নয়নে ঘনায় আঁধার,
কালিমায় ডুবে যায় কর্মহারা নিখিল সংসার।
কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি মোরই মত ঘুমাইলে হায়,
সুখস্বপ্ন হের বন্ধু ইন্দ্রধনু বর্ণের লীলায়
মুখ-চন্দ্রে বক্ষে ধরি যামিনীতে বিনিদ্রনয়ন,
চন্দ্রিকায় রচ' তুমি কল্পনার মিলন-হ্লাদন।
দূরে রহি মোরই মত বিরহিণী তোমার শিখিনী,
মিলনের উৎকণ্ঠায় কেকাকণ্ঠে কাঁদে একাকিনী॥

উর্বশী

হে চিরতরুণী শ্যামা বিশ্বমনোমোহিনী সুন্দরী,
অয়ি উর্বী,—অয়ি গুর্বী, কবি তোমা বলেছে উর্বশী
ব্যোমলোক-সভাতলে ঘূর্ণ-নৃত্যে তন্ময়ী অপ্সরী—
বনশ্রী-কুন্তলা গিরি-পয়োধরা ইন্দ্রের প্রেয়সী।
মিত্রাবরুণেরে তুমি যজ্ঞস্থলে মোহিলে চকিতে,
দোঁহার আসঙ্গ লভি কবে তুমি হইলে উর্বরা,
আদি মহামানবের জন্ম হ'ল তোমার কুক্ষিতে
অগস্ত্য-বশিষ্ঠরূপে, সেই হ'তে হ'লে বসুন্ধরা।
বর্বরের উপদ্রবে কবে তুমি কাঁদিলে কাতরে,
উদ্ধারিল আর্যবীর, বীরভোগ্যা তুমি সেই হ'তে।
কত বীর বীরধর্ম পাসরিল তব মোহ-ঘোরে,
কত তপস্বীর তপ ভেসে গেল তব মায়া-স্রোতে।
কত কেশী হ'ল হত—এল গেল কত পুরূরবা,
শাশ্বতশ্রী তুমি আছ চিরশ্যামা চিরমহোৎসবা॥

তৃষিত

একটি যুগের তব আয়োজন প্রিয়া
অনেক যুগের মোর চিত্ত চাতকতা।
দুটিমাত্র শ্রুতি তব একখানি হিয়া
জানাতে যে চাই বহু জনমের ব্যথা।
অতিথি চকোরশত এ হৃদি গগনে
তুমি শশিকলা তার কতটুকু সুধা ?
একটি থালায় অন্ন তোমার ভবনে
মোর মেরুমরু-অভিযাত্রিকের ক্ষুধা।
একটি সরোজ শোভে তব কালিদহে
শতলক্ষ অলি মোর অক্ষি-তারকায়।
বহু নিদাঘের জ্বালা মোর দেহ সহে
দুটি রাঙা করতলে তাহা কি জুড়ায় ?
তব প্রেম-সিন্ধু হেরি ব্যাপি দশ দিশা
মিটিবে কি আমার যে অগস্ত্যের তৃষা ॥

সমাপ্তি

সমাপ্ত হইল কর্ম। বহুদিন ধরি যার লাগি
করেছি প্রয়াস বহু—যার তরে বহু রাত্রি জাগি
করিয়াছি ঘর্মপাত। পূর্ণ হলো আজি সে সাধনা।
তবু কেন হৃদয়ের গূঢ় কক্ষে উথলে বেদনা
অজ্ঞেয় রহস্যময় ? কর্মশেষে শ্রমিকের মত
হ'লাম কি নিরালম্ব, কর্মান্তর অভাবে বিব্রত
নিরুপায় ? না না এ-যে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-যাতনা,
বহুদিনকার বন্ধু তারি লাগি নিভৃত শোচনা।
সে ছিল আমার সাথী বরষায়, বসন্তে, নিদাঘে,
স্তব্ধ শান্ত মধ্যরাত্রে কোলাহলতপ্ত দিবাভাগে,

উজ্জ্বল প্রভাতে আর ক্লান্ত ম্লান ধূসর সন্ধ্যায়,
সুখে দুঃখে, রোগে ভোগে, অশ্রুহাস্যে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
তাহারে বিদায় দিয়া আরম্ভের সমাপ্তির ছলে,
বন্ধু-বিচ্ছেদের ব্যথা পাই আজ গূঢ় মর্মতলে ॥

কবির মুক্তি

মুক্তারে করিয়া মুক্ত শুক্তি যথা চিরমুক্তি লভে,
তরুলতিকার মুক্তি যথা ফলে কুসুমে পল্লবে,
সন্তানে প্রসবি যথা স্তন্যদানে মুক্তি লভে মাতা,
মিটায়ে সবার দাবি মুক্তহস্তে মুক্ত যথা দাতা।
কর্মবীর মুক্ত যথা উদ্‌যাপিয়া আপনার ব্রত,
সর্বস্ব সমুদ্রে সঁপি নদী মুক্তি লভে অবিরত।
তেমনি নিঃশেষে সঁপি তব শতজন্মের প্রাক্তন
সমগ্র জীবনব্যাপী মহাতপ-সাধনার ধন,
যাহা কিছু আর্ষ, আপ্ত, যত দিব্য ভাব অনুভূতি,
গূঢ় চিন্তা, স্মৃতি-প্রীতি, সত্য, স্বপ্ন, প্রাণের আকূতি,
সকলি নিঃশেষে সঁপি, ব্রহ্মে সঁপি কর্মফলভার,
মুক্ত তুমি ভক্ত কবি। বৃথা ভাবি ফিরিবে আবার।
তব সাধনার ধন বিরাজিছে তব সৃষ্টিময়
শত শত শতাব্দীতে নাই তার লুপ্তি, ক্ষতি, ক্ষয় ॥

ইন্দ্রগোপ

আষাঢ়ে সহসা লভি ইন্দ্রের অঞ্জলি
তোমরা বাহিরে এলে সবে দলে দলে,
কোথা ছিলে এ পৃথ্বীর মৃত্তিকার তলে,
করিল মেঘের মন্দ্র বুঝি কুতূহলী!

জীবন্ত হইয়া যেন পদ্মরাগাবলী
আশ্রয় লইলে লতাবধূর অঞ্চলে,
কুণ্ডল হইলে তার পাকায়ে কুণ্ডলী।
প্রবালের মালা হলে শিলীন্ধ্রের গলে।
কীটেরা তোমার নাম দিল মখমলী,
সারা কীটভূমি এলো তোমার দখলে।
কেঁচোরা লুকায় ত্বরা ভয়ে কাদাজলে
রাজবেশে এলে যবে দূর্বাদল দলি,
কেন্নুই কে বলে? ছিঃ ছিঃ পাক তা বিলোপ,
কবির কাব্যেতে তুমি হলে ইন্দ্রগোপ॥

শামাপোকা

কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যা, চলেছি শহুরে পথ বেয়ে
পথের দুধারে যত লাইটপোষ্টের পানে চেয়ে
দেখলাম শামা পোকা লাখে লাখে হাজারে হাজারে
ম'রে ম'রে ঝ'রে পড়ে পথ 'পরে ঘিরে আলোটারে।
ভাবলাম এই সব পোকাগুলো নিতান্তই বোকা,
তার পরই মনে হলো মোরাও তো বড় বড় পোকা।
সূর্যটা প্রকাণ্ড আলো শূন্যে ঝোলে, তার চারিধারে
অবিরত ঘুরছি তো আমরাও হাজারে হাজারে।
বড় পোকা ছোট পোকা একই দশা দুয়েরই সমান
অনিবার্য নিয়তির রাজ্যে হায় একই বিধান।
পোকা বোকা বটে, নেই মানুষের বুদ্ধির অভাব,
বিদ্যা জ্ঞান অভিজ্ঞতা বুদ্ধি থেকে হইল কি লাভ?
চন্দ্রলোকে রয়ে যদি দেখে কোন বিরাট পুরুষ,
দেখবে কেমনে মরে লাখে লাখে ঘুরন্ত মানুষ॥

সঙ্গীতা

কণ্ঠের অচ্ছোদহ্রদে সোপানে সোপানে,
কনক-কঙ্কণ ক্বণি' কে অই কিন্নরী,
উঠে তীরে ঢালি জল কলকল তানে
নামে ফিরে ভরিবারে সোনার গাগরী।
একি খেলা সারাবেলা মিছে উঠা নামা,
বুদ্ধিজীবী দেখে বলে 'এ নারী পাগল'।
বিষয়ী, ভৃত্যেরে কহে 'থামা ওরে থামা'।
ভাবেন সমাজপতি,—'কুলটার ছল'।
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী—ফণা তুলে চায়,
তার শিরে ছায়া রচি নাচিছে ময়ূর,—
মরাল মৃণাল ত্যজি দিখিদিকে ধায়,
তটে তটে বাজে জলতরঙ্গ মধুর।
লাক্ষারাগে ফুটে লক্ষ প্রেমের নলিন,
আনন্দ-মূর্চ্ছনে লুটে কবি-মনোমীন॥

মণিকার

ক্ষুদ্র হাতুড়িটি হাতে শুধু রাত্রিদিন
দীপ জ্বালি, অন্ধকোণে বসি মণিকার!
অক্লান্ত, তন্ময়, মুগ্ধ, বিরামবিহীন
সন্তর্পণে কি গড়িছ? হেমচন্দ্রহার?-
ওগো শিল্পি! কল্পিতার প্রতি অনুরাগ,
আকৃতি, মাধুরী-সুধা স্বর্ণ কুঁড়ে কুঁড়ে
সঞ্চারিছ। না বর্জিয়া ক্ষুদ্রতম ভাগ,
ভরি গূঢ় মর্ম্ম-ধ্বনি ঘুঙুরে ঘুঙুরে,
একি শুধু তুচ্ছ তব দগ্ধোদর লাগি?
একি শুধু কলে ছাপা মুদ্রামুষ্টি তরে?

লভনি কি তৃপ্তি-সুখ ওগো অনুরাগি,
রসের নির্ঝরে—মর্ম্মকুহরে কুহরে ?
ওগো শিল্পি, রসঘন কল্প-হর্ষ-ধারা,—
সাধনায় করেনি কি তোমা আত্মহারা ?

মুক্তি

এস সখি, মুক্তি-লোকে রুদ্ধ গৃহমাঝে
বাহিরে খুলিয়া যত সংসার-জিঞ্জির,
হেথা এস মুক্ত শ্লথ সুষমার সাজে
বিগলিয়া কর্ম্মক্লান্ত যৌবন মদির।
এলায়ে গুণ্ঠিত কুণ্ঠা মুকুলিত লাজ,
ফুটে উঠ' অনাচ্ছদ চম্পার মতন।
রাখি উপাধানতলে সর্ব ভূষাসাজ,
পর' প্রেমকল্পতরু-সঞ্জাত ভূষণ।
হেথা হৈম সিকতায় মাণিক্য-সন্ধানে
মন্দাকিনী-তটে খেলা রভসে হরষে,
কভু বা অঙ্গের ভূষা রাখিয়া সোপানে
অবিশ্রান্ত জলকেলি অচ্ছোদ-সরসে।
ইহ-স্মৃতি হারাইয়া, গৃহের নন্দনে
এস প্রিয়ে, লভ' মুক্তি নিবিড় বন্ধনে ॥

প্রতিমুক্তি

উঠ সখি জাগ' জাগ' পোহায় রজনী
মৃদঙ্গে উঠিছে দূরে কুঞ্জভঙ্গ তান।
ভোরের বৈরাগী পথে বাজায়ে খঞ্জনী
টহল গাহিয়া দিল টলাইয়া প্রাণ।

সুপ্তি-সুষমার সুখ-স্বপ্নপুরী হতে
গৃহাঙ্গনে ফিরে এস, লো আত্মবিস্মৃতা,
ভিড়াও মানস-তরী কর্মতটপথে
বিলাস-তরঙ্গ ত্যজি, অয়ি অসম্বৃতা।
আলোকে পুলকে মেলি আঁখির পলক
আলুলিত যৌবনেরে করিয়া সংহত,
মুছি তন্দ্রালস আঁখি, গুছায়ে অলক
শিথিল তনুরে কর শাসন-সংযত।
ধীরে ফেলি পাদযুগ লাজে সঙ্কুচিত,
অলিন্দ অঙ্গন পুনঃ কর পঙ্কজিত॥

মূর্তিমতী

যা কিছু সুন্দর রম্য বসুন্ধরা তলে,
ঊষাশ্রীতে সন্ধ্যারাগে ইন্দুসুষমায়,
বর্ণে গন্ধে গুঞ্জরণে পর্ণফুলফলে,
সবি যেন অধিশ্রয় লভেছে তোমায়।
যা কিছু মঙ্গল জাগে জীবের জীবনে,
স্বস্তি তুষ্টি নিষ্ঠা পুষ্টি গৃহশ্রী-সম্পদে,
শঙ্খস্বনে সতী-সেবামুখর কঙ্কণে,
পুঞ্জিত যেন ও দুটি কর-কোকনদে!
যাহা কিছু সত্য ধ্রুব নিত্য সনাতন,
জ্ঞানে ধ্যানে আপ্ত বাক্যে ঋষির ভাষায়
হেরে যাহা সমাহিত মানস নয়ন,
বিম্বিত সকলি তব প্রেম-পিপাসায়।
মূর্তি ধরে' এসেছ কি পরম প্রসাদ
সত্যশিব সুন্দরের শুভ আশীর্বাদ?

বরণ

আশৈশব সুন্দরের বন্দনার তরে
বিন্দু বিন্দু উপচার করি আহরণ,
সাজায়ে রাখিনু মর্মবেদীটির পরে,
সুন্দরে বরণ লাগি রচিনু তোরণ।
সুন্দরের পাটে এলে কল্যাণীর রূপে,
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু পুণ্যশঙ্খ করে,
চন্দনচর্চিত পুষ্পে, দীপে গন্ধধূপে
কল্পারম্ভ হলো সেই মঙ্গলবাসরে।
সমাহৃত অর্ঘ্যপুঞ্জ, দেবতা কোথায়?
এলে তুমি সুন্দরের প্রতিনিধি সম,
নিশ্চিন্ত হ'লাম, সবি সঁপিয়া তোমায়।
সার্থক হইল সর্ব আয়োজন মম।
কোথা তাই পূর্বরাগ? মূর্তা মন্ত্রবাণী,
একই দিনে হলে ইহপরত্রের রাণী॥

কল্পসৃষ্টি

তোমারে লভিনি যবে, পশিত শ্রবণে
যে ভূষাশিঞ্জন মঞ্জু, কূজনে গুঞ্জনে,
যে মধুর বাণী বীণা-বেণুর ঝঙ্কারে,
যে পরশ লভিতাম মলয়-সঞ্চারে,
যে নয়ন-প্রসন্নতা নির্মেঘ আকাশে,
চরণ-চারুতা যাহা সরোজ বিলাসে,
যে কৃষ্ণ-কুন্তল-কান্তি আষাঢ়-নীরদে
যে লাবণ্য-বন্ধুরতা গিরির সংসদে,
যে অধর-অরুণিমা সন্ধ্যাভ্র-স্বপনে
হেরিতাম,—নিত্যনব মানস-নয়নে,

তোমা আজি গৃহে লভি, তোমা পানে চাই
একে একে উপমানে কেবলি মিলাই!
কেমনে,—অবাক হয়ে ভাবি বসে' ঘরে
মিলে যায় কল্পসৃষ্টি অক্ষরে অক্ষরে?

প্রাক্তনী

আমি কোথা ছিনু আর তুমি কোথা ছিলে,
কেমনে ঘটিল এই অচিন্ত্য মিলন।
বিশ্বজনারণ্যমাঝে কেমনে চিনিলে?
মিলাইয়া দিল কোন্ দৈব আকর্ষণ?
শুধু তাই নয় সখি, প্রথম মিলনে
সারা সে যৌবনজোড়া সঞ্চিত প্রণয়
সকলি লইলে হরি' মুহূর্ত্তের ক্ষণে,
বিনা সে উদ্যোগ-পর্ব একেবারে জয়।
তাই মনে হয় সখি তাই মনে হয়,
উৎসবের মধুময় শুভঙ্কর ক্ষণে,
রম্য সমারোহ হেরি গৃহাঙ্গনময়
শুনিয়া মধুর বংশী সবি এলো মনে,
'জন্মান্তরসৌহৃদের' স্মৃতি এলো ফিরে,
পূর্বমিলনের প্রেম যেন ধীরে ধীরে॥

পুনরুদিতা

প্রাক্তন-জনমবিদ্যা তুমি মোর প্রিয়া,
জীবাত্মার গূঢ়তলে আছিলে নিহিত,
সহসা সে শুভক্ষণে হৃদয় মথিয়া
অন্তরের অন্তরীক্ষে হইলে উদিত।

প্রেমকাম-সুরাসুরে মথিল যখন
আমার জীবনসিন্ধু, উদিলে ইন্দিরা,
সঙ্গে ইন্দু পারিজাত কৌস্তুভরতন,
পিয়ে নিল জয়ী প্রেম অমৃতমদিরা।
সহসা জাগিলে তুমি প্রভাপুঞ্জোপম,
জ্যোতিষ্মতী লতা অঙ্গে তমিস্রাপরশে।
গঙ্গাবক্ষে শতশত মরালের সম
শারদ সংকেতমাত্রে জাগিলে হরষে,
প্রাক্তন-জনমবিদ্যা তুমি মোর প্রিয়া,
ব্যক্ত হ'লে প্রকৃতির ইঙ্গিত লভিয়া॥

তিলোত্তমা

তোমারে গড়েছি আমি বিন্দু বিন্দু করি'
মাধুর্য সুষমা সবি করি আহরণ,
তিলে তিলে তিলোত্তমা হে মোর সুন্দরি,
আমারি বাসনালক্তে অরুণ চরণ।
আকৈশোর লো কিশোরী অর্চনার লাগি
কল্পকাননের পুষ্প করিনু চয়ন,
কামনার ধূপ জ্বালি' রহিলাম জাগি,
সকল রূঢ়তা ঘষি রচিনু চন্দন।
সমারোহ-মুখরিত সেইদিন সাঁজে
হলো বুঝি শুভক্ষণে সে অধিবাসনে
প্রাণের প্রতিষ্ঠা তব প্রতিমার মাঝে;
কল্পারম্ভে কল্পলক্ষ্মী নামিলে ভবনে।
তোমার বেদীর পাশে সেই হতে আমি
অর্ঘ্যহস্তে ত্রস্ত নত আছি দিবাযামী॥

রূপান্তরিত

আমারে গড়েছ তুমি নূতন করিয়া,
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা।
এ হৃদি অরণ্যমাঝে হে তাপসী প্রিয়া
ঝঙ্কৃত করিলে তুমি অমৃত বারতা।
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি
তোমার আড়ালে হেরি আরো দুটি পাণি,
তব প্রেমানন্দ মাঝে হলো অনুভূতি,
কোন্ চিদানন্দ, যার সত্তা নাহি জানি।
অতীতের 'আমি' পানে চেয়ে দেখি যত,
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়,
নূতন ঊষায় ধরা যেন বা জাগ্রত,
হইল নিজের প্রতি শ্রদ্ধার উদয়।
হৃদ্‌গত করিয়া প্রিয়ে সৃজিয়াছ মোরে
তব ভাবধারা দিয়ে চিত্ত দিলে ভরে'॥

অসামান্যা

যে চোখে তোমারে দেখে সর্বসাধারণ
সেই চোখে তোমা যদি আমি হেরিতাম,
তবে কি অঞ্চলে তব জীবন যৌবন
নিরুদ্বেগে নির্বিচারে দিতে পারিতাম?
তুমি যে আমার চোখে কি মহারতন
মুকুরে হেরিয়া অঙ্গ নারিবে বুঝিতে,
দিতে যদি পারিতাম আমার নয়ন
আমার 'তোমাকে' তবে হ'ত না খুঁজিতে
আমার অন্তরচক্ষু দৈহিক নয়নে
লুপ্ত করিয়াছে, রবি চন্দ্রেরে যেমন।

অন্তর হেরে যে তার অন্তরের ধনে ;
এ যেন ঋষির মহামন্ত্রের দর্শন।
আমার 'তুমিটি,' সে-যে সবার 'তোমাকে,'
সূক্ষ্ম যবনিকা দিয়ে অন্তরালে ঢাকে ॥

মন্দির

হে দেবতা, খুলে দাও মন্দিরের দ্বার,
মন্দিরে সুন্দর করি করিছ বঞ্চনা,
মন্দিরে করেছি তাই জীবনের সার,
কত দিন র'বে তথা লুকায়ে আপনা ?
তোমার মন্দির যদি এতই সুন্দর,
কি সুন্দর হবে তুমি বল' হে মোহন ?
পাষাণে মজিল যদি আমার অন্তর,
তোমা পেলে কোন্ রসে মগ্ন হবে মন ?
মন্দিরে আঁকড়ি যবে ধরি আত্মহারা,
পথভ্রান্ত সৌন্দর্যের লালসালীলায়,
নিবিড় আবেশ মাঝে পাই তব সাড়া;
হে আনন্দরসময়, শিলায় শিলায়।
প্রিয়া সহ প্রেমলীলা ওগো প্রাণনাথ,
তব রুদ্ধদ্বারে শুধু নিত্য করাঘাত ॥

প্রত্যাশিত

দুর্লভ বলিয়া চিত্ত হয়োনা হতাশ,
অধ্রুবের জয়চিহ্ন যেন না ভুলায়,
ধরণী করিবে তার রথচক্রগ্রাস
আপাত বিজয়-কেতু লুটিবে ধূলায়।

এ পৃথ্বী বিপুলা আর কাল-ও নিরবধি
হের জাগে পুরোভাগে জন্মজন্মান্তর।
এ জীবনে ভ্রম তব নাহি ঘুচে যদি
আগামী জীবনে তবু হবে অগ্রসর।
নীড় হতে নীড়ান্তরে ঘুরি পক্ষিগণ
হারাবে আশ্রয় যবে কালঝঞ্ঝাবায়,
অনাদি শাশ্বত সেই বিমুক্ত গগন
তখন করিবে সার নির্মল উষায়।
আপাতসুখের মোহে যায় যেবা দূরে,
অমৃতলোকের লোভে আসে সে-যে ঘুরে॥

পরিণতি

বসন্তে অশোককুঞ্জে মিলন তরুণ,
জীবনে হোলীর দিন, সকলি অরুণ।
গ্রীষ্ম এলো, ঝঞ্ঝাহত ত্রস্ত বেশবাস,
ঢেকে দিল মোরে তব স্রস্ত কেশপাশ।
বাসনার বহ্নিতাপে স্বিন্ন দেহমন,
আলসে লুলিত খিন্ন ও কুঞ্জ-ভবন।
সহসা প্রেমের উষ্মা হলো বাষ্পঘন,
মঞ্জীর-শিঞ্জন হলো কঙ্কণের ক্বণ।
জীবন-প্রাবৃটে সখি কত ছল ভান,
অকারণ বরিষণ কত অভিমান।
সে সব গিয়াছে দূরে আজি তোমা, সখি,
ভবন-জ্যোৎস্নার রূপে শরতে নিরখি।
তুলসী-মাধবী-কুঞ্জ অলিন্দ অঙ্গনে
আলোকিত ক'রে আছ, অয়ি স্মিতাননে॥

চিরসঙ্গিনী

কতবার স্বয়ংবর-সভা উপেক্ষিয়া,
এ নগণ্য কণ্ঠে তব দিলে বরমালা।
ঘুরিয়াছ বনে বনে আমারে খুঁজিয়া,
কতবার সাজায়েছ বরণের ডালা।
কত বার রাখিয়াছ সতীতেজোগুণে
শমনের দণ্ড হ'তে আমার জীবন।
কতবার সাজায়েছ তরবার-তূণে,
রথ-রশ্মি কতবার করেছ ধারণ।
নতুবা সহজ সবি হইল কেমনে?
কিছুই তোমার যেন নহেক নূতন।
কোথা পেলে? কই? কিছু শেখনি জীবনে
সবি চির পরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন।
কোন আদিকাল হতে আছ মোর সাথে,
জন্ম হতে জন্মান্তরে মানস-সত্তাতে॥

রূপময়ী

তুমি মোর আঁখিতারা, তুমি মোর আলো,
তুমি মোর ক্লিষ্ট-ক্লান্তদৃষ্টি-সঞ্জীবন।
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা ভেদি নেহারি যখন।
আপনারে দেখাইলে মহাবিদ্যা-সাজে,
বিশ্বময় যত স্বপ্ন মূর্তি ধরি নাচে।
সব মায়া ভাব রস রূপ হয়ে রাজে,
সব মন্ত্রগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-দীপ-খদ্যোতিকা,
মাণিক্য-ওষধি-রশ্মি গড়েছে তোমায়।

শত জনমের মোর স্বপ্ন-নীহারিকা
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায়।
মুদ্গরের মোহ তুমি বেদান্তের মায়া,
মোর নেত্রে একমাত্র সত্যময়ী কায়া॥

দেহাম্বিতা

বলেছেন ভর্তৃহরি নারীর যৌবন
অস্থি মাংস মজ্জামেদ-ক্লেদের মিলন।
এ সবের অন্তরালে কিছু নাহি হায়!
মিথ্যা কথা! অন্তরাত্মা নাহি দেয় সায়
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে?
সুন্দরে মিলে না বলি 'বুকে বুক দিয়া
লাখ লাখ যুগ ধরি, জুড়ায় না হিয়া'।
অরূপে মিলেনা বলি 'নাই তিরপিতি
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নিতি'।
বাঁশরী বাজায়ে কানু কোথায় লুকায়,
আমরা ঢুঁড়িয়া ফিরি ঝোপে ঝাড়ে তায়
মানি না কণ্টক ক্লেদ অমেধ্য পম্বল,
শ্যামের সন্ধান সবি করেছে নির্মল॥

দূতী

বাঁশরী শুনেছি, তায় দেখিনিক চোখে,
তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী,
এ লোক হইতে নিয়ে যাও অন্যলোকে
ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আহুতি।

তোমারে সকলি সঁপি নিরুদ্বেগ আমি,
জনমিল পূর্বরাগ তোমারি কৃপায়,
মম নিবেদিত অর্ঘ্য তুমি দিবা-যামী
বহিছ গোপন পথে সে প্রভুর পায়।
তুমি যদি মোর প্রেম না কর' বহন,
একেবারে তাঁর কাছে দাঁড়াব কেমনে?
লজ্জায় কুণ্ঠায় প্রেম হইবে স্বপন,
অভিসার-পন্থা যদি না দেখাও বনে।
তোমারে বিরাগী কবি বলে ঘৃণ্য? হায়!
দেব-দেউলের সিঁড়ি ভাঙিবারে চায়?

আর্যাবর্ত

'নিম্নে' অই মহাসিন্ধু সর্বরত্ন-খনি,
বরুণের কোষাগার লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জ্বলে কোটি মণি।
'ঊর্ধ্বে' অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্য ব্রহ্মধারা বার মাস।
অই মন্দাকিনী শুভ ধ্রুবের জননী,
মহাযোগ-ধারা, এই ভস্ম-সঞ্জীবনী
স্বর্গে মর্ত্তে, অনিত্যে ও নিত্যসত্তা সনে,
শ্রেয়ে প্রেয়ে, গৌরী-হরে, লক্ষ্মী-নারায়ণে,
শক্তি-প্রেমে, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ-সম্মিলনী।
ইহ-পরত্রের মহা মিলন-নিলয়
এই আর্যাবর্তে সর্ব দ্বন্দ্ব-সমন্বয়!

শেষ

দিনটি হইল শেষ। রবি গেল পাটে,
পাঠশালে পাঠ শেষ ছুটি সবাকার,
মাঠে শেষ সেঁচা-কোঁড়া, বেচাকেনা হাটে,
তটে শেষ তটিনীর খেয়া-পারাপার।
ঘাটে শেষ ঘট ভরা কাঁকনের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত-ভোজন,
বটবিম্বে শেষ বনবিহগের গান,
বাটে শেষ হাটুরের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ মালতীর বনে উপবনে,
মঠে শেষ আরতির নিক্কণ মধুর,
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটীর-প্রাঙ্গণে,
হাঁটা শেষ করি পান্থ করে ক্লান্তি দূর।
এই সর্ব শেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়
জীবনের শেষ, সেও উঁকি দিয়ে যায়॥

দ্বাদশী

প্রতিমা

চণ্ডীমণ্ডপের কোণে কাঠামোটি রহিয়াছে খাড়া,
বাজিলে বোধন বাঁশী প্রথম পড়িবে তায় মাটি।
দোমেটে তেমেটে হলে রঙ দিয়ে গড়া হবে সারা
তখন প্রতিমা হবে খাঁটি;
মণ্ডপ করিবে আলো, তখন তাহার পূজা হবে
বাদ্যোদ্যমে আড়ম্বরে আনন্দ-উৎসবে।
তেমনি কাঠামো এক স্থানান্তর হতে আনিলাম,
সেদিন সবার মনে কৌতূহলে নাহি ছিল সীমা,

হৃদয় মাধুরী দিয়া তারে করি নয়নাভিরাম
নানা উপাদানে আমি গড়িলাম একটি প্রতিমা,
দু'দিনের পূজা নয়। পূজা তার চলে প্রতিদিন
নীরবে তাহার পূজা কবিতায় সমারোহ-হীন ॥

চিঠি

এ শুধু তার নয়ক চিঠি—আমিত তার হৃদয় জানি,
আলোছায়ায় কালো সাদায় এ তার হিয়ার ছবিখানি।
সেই আঙুলের পরশ লভি সেই অলকের গন্ধবায়ে
প্রিয়ার আমার অনেকখানি জড়িয়ে আছে চিঠির গায়ে।
কোথায় পাব সাজানো ফুল! এ যে আমার শিউলিতলা।
এলোমেলো আল্পনা এ,—নাইক এতে শিল্পকলা।
হার ছিঁড়ে এ মুক্তাগুলো ছড়ানো যে পথের 'পরে,
হারাবে না একটিও এর পথিক-প্রাণনাথের করে।
ছিন্নমেঘের ভানুর কিরণ,—ইন্দ্রধনু বক্ষে আঁকে,
হিয়ার অমল নীলিমা তার দেখছি রেখার ফাঁকে ফাঁকে।
এ যে আমার প্রিয়ার লিপি তাহার হিয়ার রক্তে লেখা,
মসীর নিকষ-উপল 'পরে প্রেমের উজ্জল কনকরেখা ॥

অর্ঘ্য

ভূধরের অঙ্ক হ'তে তটিনী আসিয়া কলকলি'
সিন্ধুর চরণতলে ভক্তিভরে অর্পিল অঞ্জলি।
'কি এনেছ মূঢ়া বালা', উপেক্ষায় হাসি সিন্ধু বলে—
'বাড়িবে সম্পদ মোর কোশাভরা তব পাদ্য জলে?
আমি রুদ্র, আমি চণ্ড, বিশ্বগ্রাসী আমার প্রসার,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে মহাকাশ করে হাহাকার।

মোর কাছে ধরিয়াছ অর্ঘ্য পাণি-পল্লব বাড়ায়ে,
আমার অতলে তাহা চিহ্নহারা যাইবে হারায়ে।
বৃথা তুমি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলে সুন্দরি,
জল ছাড়া কি এনেছ ছলছলি দুই আঁখি ভরি?'
তটিনী বলিল, 'তুমি রত্নাকর তোমারো মাঝারে
যাহা নাই তাই দিতে আসিয়াছি হৃদয় রাজারে॥'

ধর্মঘট

ট্রাম বন্ধ, ধর্মঘটের হয়নি আজো শেষ।
বাসে লোকের বাদুড়-ঝোলা দেখতে লাগে বেশ।
ভাগ্যে মোটর কিনেছিলাম স্ত্রীয়ের উপরোধে
নইলে আমায় হাঁটতে হতো বৃষ্টি এবং রোদে।
ধর্মঘটটা চলছে চলুক আরো দুচার মাস,
আয়েস ছেড়ে অলসেরা করুক না আয়াস।
শক্তি সাহস তৎপরতা, আরাম পেয়ে পেয়ে
ঘুমিয়ে গেল, চাঙ্গা হয়ে উঠুক গুঁতো খেয়ে।
হচ্ছিল এই শহরবাসী চলচ্ছক্তিহীন,
ভুলে গেল করতে লড়াই হবে যে একদিন।
হাঁটতে শিখুক, খাটতে শিখুক, ছুটতে শিখুক জোরে,
পড়তে শিখুক, লড়তে শিখুক, মরতে শিখুক পড়ে॥

ঘুঁটে

কয়লা ইলেকট্রিক গ্যাস কেরোসীন
কিছুই ছিল না। কাঠও মেলা সুকঠিন।
ঘরে ঘরে পাকযজ্ঞে কি ছিল সমিধ্?
—করিবে তোমারি নাম প্রত্নতত্ত্ববিদ্।

গো-মাতার শ্রেষ্ঠ দান, নও তুমি হেয়।
সকল আহার্যে তুমি কর উপাদেয়।
বিনা মূলধনে কেবা হয় কুঠিয়াল?
বিনা মূলধনে তুমি গড়ো ঘুঁটিয়াল।
তাহারা গড়িয়া গেল ঘুঁটিয়া বাজার।
তোমারে বেচিয়া বাঁচে হাজার হাজার।
তোমারে পুড়িতে দেখি হাসে যে গোবর,
দুই দিন আগে পাছে সামান্য অন্তর॥

নিউটন

মাটি টানে সবারেই কথা চির পুরাতন
তাই বলে বাহাদুরি নিয়ে গেলে নিউটন।
দুই দিন আগে পিছে যেতে হবে একদিন
সবারে মাটির তলে হতে হবে সেথা লীন।
দেহে দেহে দেখিতেছি সবারই মাটির টান,
গেহে গেহে সেই টানে সবে করে আনচান।
ব্যাধি জরা আদি চিরনিদ্রা বা বিশ্রাম,
আমরা কত না দিই মাটির টানের নাম।
স্বরগ হইতে নেমে আসিবে না কারো রথ।
সবারই মাটির টানে ধূলা ভরা একই পথ।
কোন ছেলে এড়াইবে মা-টির স্নেহের টান।
নতুন কি ব'লে বাপু হলে তুমি খ্যাতিমান?

বঙ্গনারী

একদিন যারা তোমা পীড়ন করেছে অবিরাম,
দেয়নিক তুষ্টি পুষ্টি স্বাস্থ্য স্বস্তি শান্তির বিশ্রাম,
দূষিত রোগের বিষ তব দেহে করেছে সঞ্চার,
অতিপ্রসবের দায়ে তিলে তিলে করেছে সংহার।
বিদায় করেছে শেষে তব শিরে পা-র ধূলি দিয়া,
ঘরে আনিয়াছে ক্রমে দ্বিতীয়া তৃতীয়া।
প্রায়শ্চিত্ত করে আজ তাহাদের বংশধরগণ
পোষা কুকুরের মতো করি তব চরণ লেহন।
মর্ত্তের মানবী তুমি, চাও নাক দানবে অসুরে,
চাও যে পুরুষ সাথী, চাও নাক গোলাম পশুরে।
কিংবা বাঁদী রূপে পায়ে রহিতে চাহনি তুমি বাঁধা,
দেবীত্বে নেইক দাবি, চাহিয়াছ নারীর মর্যাদা॥

অশেষ

যারে ভালবাসি তার কথা কভু ফুরাতে পারে?
জীবনরসের উৎস বলিয়া জানি যে তারে।
সে যে নিতি তাজা, সে যে নিতি নব নবায়মান।
সে যে বিচিত্র, হয়কি তাহার লীলাবসান?
নূতন করিয়া তোলে তারে নিতি প্রভাত-রবি।
প্রহরে প্রহরে নূতন করিয়া তাহারে লভি।
কত না তাহার লীলা-বিভঙ্গ রচিনু গানে।
অনাবিষ্কৃত কত আছে আজো কেই বা জানে?
তাহার মাঝারে অসীমের স্বাদ আভাস পাই,
তার পরিচয় তার কথা অফুরন্ত তাই।
হে প্রভু, তোমারে মনে প্রাণে ভালবেসেছে যারা,
তোমার কথাটি তাদের জীবনে হয় কি সারা?

নিরালোক পথে

পরশমাণিক কবিকল্পনা, মিছা নয় তার আলো।
একদিন তারে লভিয়া নয়নে ধরারে বাসিনু ভালো।
বিশ্বপ্রকৃতি গৃহ সংসার সবি হ'লো মধুময়,
প্রাণভরা আশা জিনিল সহসা দ্বিধা ভয় সংশয়।
ক'দিনের সেই মাণিকের আলো, নিভে গেছে তাতো কবে,
সুন্দর শুভ মধুর কিছুই দেখিনাক আর ভবে।
তারে ফিরে পেলে বিদায়ের পথে পিছুতে পড়িত টান,
স্মরি ভবনদী ধরার মায়ায় আকুল হইত প্রাণ।
গেছে সে আলোক করি নাক শোক। ডাক আসে হবে যেতে,
বিষময় ধরা ছেড়ে যেতে ত্বরা ব্যথা হবেনাক পেতে॥

শ্রাবণ-পূর্ণিমা

শ্রাবণ পূর্ণিমা,
নিশীথ করেছে তোমা অপূর্ব রহস্যময়
দিল তোমা ধ্যানের মহিমা।
তরল তন্দ্রায় যেন তব ম্লান চন্দ্রালোকে
নীলাম্বর হেরিছে স্বপন।
লুকোচুরি খেলা করে তোমার অঞ্চলতলে
প্রকাশ-গোপন।
ধরারে বঞ্চিত করি আধঘুমে মেঘদল
করিতেছে পান
তব স্তন-বিগলিত জোছনার দান॥

ঋণশোধ

ধন্য হয়েছ করুণাময়ের লভি করুণার দান
তুমি যে ভাগ্যবান।
জেনো এরে দেবঋণ,
তোমার করুণা মাগে সম্বলহীন
তাদের সবার অভাব ঘুচিবে তোমার করুণা লাভে।
করুণা করার প্রেরণাও তারা পাবে।
এমনি করিয়া করুণার ধারা ঝরনাধারার মতো
বয়ে যাবে অবিরত।
বহু-শাখ হয়ে সেই ধারা যদি করুণা-সাগরে মেশে।
সে দেবঋণের তবে একদিন পরিশোধ হবে শেষে ॥

শ্রেয়সী

নীদ-দহে স্নাত তাহার মুদিত বদনকমল খানি,
উষা আসি নিতি দেয় ফুটাইয়া আপনার কোলে টানি ।
দুপুর আসিয়া নূপুর হরিয়া শ্লথ করে তার বেশ,
আলসে লুলিত করি দেয় তনু এলাইয়া দেয় কেশ।
গোধূলি আসিয়া রচে তার বেণী সাজায় কত না ঠামে,
নানা আভরণে কাঁচপোকা টিপে যুথীমল্লিকাদামে।
নিশীথ আসিয়া সব আবরণ সব আভরণ হরে,
কামনার কালীদহের তিমিরে তারে নিমগন করে।
এই প্রেয়সীরে শ্রেয়সীর রূপ দেয় শিশু আসি কোলে,
কালীদহ হয় অচ্ছোদ তায় রক্তকমল দোলে।

রজনীগন্ধা

ফুলের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই বিহান-বেলা,
মনে হয় যেন এটা কবিতার মোহন মেলা।

নানা শ্রেণীর ছন্দে কবিরা রচনা করে,
ভাবিলাম তাই কোন ফুল কোন শ্রেণীতে পড়ে।
রজনীগন্ধা ফুটেছে দীর্ঘ দণ্ড 'পরে
গন্ধ তাহার সবার গন্ধ বিজয় করে।
দলছাড়া যেন, ও-দলের আরে পাইনা খুঁজি,
রজনীগন্ধা চৌদ্দ চরণে সনেট বুঝি।
বারো চরণের শীর্ষে বসানো চরণ দুটি,
দুইটি সুরভি ফুল হয়ে যেন রয়েছে ফুটি॥

বিদায়

বিদায় নিয়ে যাচ্ছি প্রিয়ে প্রবাসে,
জানি না হায় ফিরব কবে স্ববাসে।
নানান কাজে থাকবে ভুলে সজনি,
কেমন করে কাটবে তোমার রজনী।
কপোত-মিথুন রইল ঘরের সাঙাতে
সাধবে কপোত মান কপোতীর ভাঙাতে।
প্রিয়ায় তবু ছেড়ে কপোত রবে না,
কপোতেরে প্রবাস যেতে হবে না।
তাদের পানে চেয়ে আমার আতুরী
বিরহে ভোগ করবে মিলন-মাধুরী॥

শক্তি-পূজা

শক্তিরে মোরা কখনো পূজি না, পূজি শুধু মোরা মাটির ঢেলা,
শক্তি-মায়েরে পুতুল বানায়ে করি তিন দিন পূজার খেলা।
কণ্ঠের জোরে চীৎকার করি' হয়নাক কেহ শক্তিমান্,
ছাগের রুধির আমরা সঁপেছি, বাঘের রুধির করিনি দান।

শক্তি-মায়ের সন্তান বলি নিজেরে যে ভবে করে প্রচার,
লজ্জা করে না সে হতভাগার উদরান্নও জুটেনা যার ?
মনে ত হয়না শক্তি-মায়ের আমরা কখনো করেছি সেবা,
যুগ যুগ হ'তে শক্তি পূজিয়া পরপদানত হয়েছে কেবা ?
ভক্তিবিহীন শক্তিপূজার কি ফল তাতেই গিয়েছে বুঝা।
শক্তির পূজা কখনো করিনি, শক্তের শুধু করেছি পূজা !

প্রেমশিল্পী

নারীদেহ মোটামুটি বিধাতারই গড়া
একমেটে খুব জোর দুইমেটে-করা।
তারপর এলে পরে বয়ঃসন্ধিকাল
দ্বিজত্ব তাহারে দেয় নূতন শিল্পীর ইন্দ্রজাল।
তেমেটে করিয়া শিল্পী তাহারে রঙান,
রঙের উপর তাতে সেই শিল্পী চড়ান রসান।
সাজান নানান সাজে প্রেম হলো তাঁর ছদ্মনাম,
পুরুষপুরের শিল্পী হৃদয়াভিরাম।
তাঁহার আসল নাম কন্দর্প, মদন,
অনঙ্গ, মনোজ, স্মর, মকরকেতন ॥

তীর্থযাত্রী

দেবমূর্তি, দেবীমূর্তি, শিলাখণ্ড কিংবা শালগ্রাম,
যেই তীর্থে রোক—আর যাই হোক নাম,
ভগবান বলি কেহ রহে যদি নিঃসন্দেহ—
তাঁরে ভক্তি অর্পণের রহে যদি দাম,
তবে অই তীর্থযাত্রী চলেছে যে দিবারাত্রি
শত যোজনের ক্লেশ সহি' অবিরাম,

চলিয়াছে কষ্টে হাঁটি খঞ্জ পদে ধরি' লাঠি
আপনার ইষ্টদেবে একবার করিতে প্রণাম।
যোগী ঋষি জ্ঞানী যত কেবা ভক্ত তার মত,
তাহারি তো অধিগম্য যদি থাকে দিব্যানন্দধাম

অতৃপ্ত

বুনো হতে চায় কুনো বন ছেড়ে, কুনো হতে চায় বুনো।
বনে গেলে কুনো হয়ে যাবে কানা,
বিধাতার কাছে চাহিবে সে ডানা,
বনে এসে শেষে কোণে ফিরিতে সে চাহিবে পুনঃ পুনঃ।
বুনো কোণে এলে মর্‌বে হাঁপিয়ে
জানালার পথে পড়বে ঝাঁপিয়ে,
আঘাত পেয়ে সে সেই লাফে শেষে হয়ে যেতে পারে খুনও।
যে যেথায় আছে সেই সেথা থাক,
ঠাঁই বদলালে ঘটবে বিপাক,
নিজ অদৃষ্টে তুষ্ট কে রয়? কারো কথা নাহি শুনো॥

ব্রহ্মে সমর্থন

সাহিত্য রচনা শুধু সখ নয়, কর্ম জানি তাও।
তোমরা এ কর্মফল হাতে হাতে পাও।
সবে মিলে কর্মফল নিজে কর ভোগ
তোমাদের এই কর্মযোগ।
আমরা এ কর্মফল করি শুধু ব্রহ্মে সমর্পণ
স্মরণ করিয়া সেই গীতার বচন।
তোমরা বলিবে ইহা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ,
জান না-ত বেদান্তের তত্ত্ব গুহ্যতম।
অনলে, অনিলে, কীটে, মূষিকে, মানবে,
ব্রহ্ম কোথা নাই এই ব্রহ্মময় ভবে?

গ্রন্থকার

বই বেচে যেবা প্রকাশ করিয়া লয় তার পুরা দাম,
তারে দেওয়া যায় গ্রন্থবণিক নাম।
বই যেবা লেখে—বই লেখা যার ব্রত,
গ্রন্থাজীব সে ভিক্ষাজীবের মত।
গ্রন্থি দিয়া যে বই বাঁধে বারবার
তাহারেই জেনো আসল গ্রন্থকার।
পাণ্ডুলিপি ত গ্রন্থ নয়ক, কাগজও গ্রন্থ নয়,
ফর্মার গাদা গুদামভরতি মালই ত তারে কয়,
গাঁথিয়া ছাঁটিয়া আসল গ্রন্থে করে যেবা পরিণত,
গ্রন্থকার তো তারে বলা সঙ্গত॥

অষ্টাপদী

সোনার ধান

স্বর্ণ মণি রত্ন ধাতু লুকানো রয় মাটির তলে
ডাকাত মানুষ লুট করে লয় অস্ত্রবলে যন্ত্রবলে।
ইচ্ছা ক'রে দেয় না মাটি, নয়ক এসব মাটির দান,
লুকানো ধন কেড়ে নিলে গুমরে কাঁদে মাটির প্রাণ।
তরুলতার ফল পাতা ফুল শস্য তৃণ কন্দ মূল
ভালবেসে দেয় সে মাটি হয় না কভু অপ্রতুল।
সন্তানেরে যোগায় এসব মাটি মায়ের নাড়ীর টান,
লুটুক সোনা দৈত্যদানা, আমরা চাহি সোনার ধান

তুলনামূলক সমালোচনা

অপেল চামেলি ফুল দুই ভালো একথাটা ঠিক ত।
মিঠা বাস চামেলির, আপেলও মিষ্ট, নয় তিক্ত।
নাসা বুঝে চামেলির, জিভ বুকে আপেলের মর্ম,
এক চেয়ে আর ভালো বলা নয় বিচারের ধর্ম।

যদি কেহ বলে তাই, সে কথা ব্যক্তিগত জানবে।
তোমারো-তো বুদ্ধি আছে সে ফতোয়া কেন তবে মান্‌বে ?
ফলে ফলে ভিন্ন স্বাদ, চলে না তাদেরো মাঝে তুলনা,
ফলে ফুলে একেবারে তুলনা অচল, তা-ও ভুল না॥

ক্ষুধার জ্বালায়

ক্ষুধার তাড়নে শ্যেন পাখী ধরে কপোতে নখের চাপে,
মা-র মমতায় চঞ্চুটি তার কাঁপে।
তবু তারে তার বধিতেই হয়, রক্ত যখন ঝরে
নয়নে তাহার হয়ত অশ্রু ক্ষরে।
ক্ষুধার জ্বালায় মানুষও তেমনি করে যেই পাপাচার,
ধৌত হয় তা অশ্রু সলিলে তার ?
হয় কি চিত্রগুপ্তের খাতে পৃথক করি তা জমা ?
শ্যেনের মতন মানুষ পায় কি ক্ষমা ?

ছায়াপথ

মনের আকাশে বিরাজ করিছে শাশ্বত ছায়াপথ,
অই পথ বাহি নামে প্রতি নিশি দেবতার মায়ারথ।
অই পথ দিয়া কবিকল্পনা ধায় অনন্তধামে,
অই পথ দিয়া বাণী-বীণা হ'তে অমৃতের ধারা নামে।
অই ছায়াপথে দেবতা-নরের মধুর মিলন ঘটে,
সে মিলনবাণী তারায় তারায় রটে গগনের পটে।
সে মিলনবাণী ধ্বনিত বিশ্বে কাব্যে, কথায়, গানে।
এই সুগোপন স্বপনবারতা কবিরাই শুধু জানে॥

আস্ফালন

বক্তৃতায় আস্ফালন করি ঘুরে যেবা যেথাসেথা,
লোকে ভাবে সেই বুঝি প্রতিনিধি, সেই বুঝি নেতা।
বিজ্ঞাপনে আস্ফালন করে যেই পত্রকপত্রিকা,
সেই হয় একচ্ছত্র, বাকি সবি ছত্রকছত্রিকা!
অবিরত কবিতায় আস্ফালন করে যেবা দেশে,
রবীন্দ্রের প্রতিযোগী মহাকবি সেই হয় শেষে।
'মৃত্যুর্হি পরিভূয়তে'—এই বাক্য করিও স্মরণ।
মান যশ প্রতিপত্তি মিলিবে না বিনা আস্ফালন॥

মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব

বহুদুঃখ দিলে তুমি অভাগারে সারাটি জীবন,
তাই তোমা মানে না সে, করে না সে তোমারে স্মরণ।
তোমারে করিয়া অস্বীকার
পশুত্ব হইতে সে যে মানবত্বে পেয়েছে উদ্ধার।
বিদ্রোহী সে দুর্বল মানব,
তবু তারে ক্ষমো যদি তবে তব বাড়িবে গৌরব।
হবে প্রভু মানবত্ব হতে তুমি দেবত্বে উন্নীত
ভগবত্তা হইবে স্বীকৃত!

বিস্মরণী

ভাগ্যে ভুলি তাই বাঁচোয়া নইলে হ'ত বিষম দায়,
পুরানো না সরলে পরে কেমনে ঠাঁই নতুন পায়?
জ'মে জ'মে স্মৃতির রাশি বন্ধ হ'লে মনের দ্বার
প্রবেশ নিষেধ হ'ত আলোর, মন যে হ'ত অন্ধকার।

ভাগ্যে ভুলি তাইত আছে আমার লঘু মন ফাঁকা,
কল্পনারা উড়ে বেড়ায় মেলে তাদের নীল পাখা।
ভাগ্যে ভুলি, দেহে মনে হাল্‌কা তাতেই হয় বোঝা,
তাইত জীবনযাত্রাপথে দ্রুত পদেই যাই সোজা॥

শিশিরাশ্রু

সারারাত ধরি ব্যথিতা প্রকৃতি কাঁদিয়া মরে
মানুষের দুখে, শিশিরে অশ্রু ভায়।
তপন আসিয়া প্রভাতে অশ্রু মোচন করে
সান্ত্বনা দিয়া ভুলায়ে রাখিতে চায়।
মানুষের ব্যথা তপন করিতে পারে না দূর
তপ্তনিশাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।
রবি চলে গেলে প্রকৃতি আবার বেদনাতুর,
কাঁদিতে বসে সে জননীর বেদনায়॥

রবির কিরণ

আমাদের এই গানের খেয়াল
লুতার সূতায় জাল বোনা।
তোমার কিরণ পড়েই তাতে
নীহারকণা হয় সোনা।
থাকবে তুমি অনন্তকাল
পড়বে তোমার ঐ করজাল,
মোদের এ জাল পড়বে ধরা
আমরা কেহই থাক্‌বো না॥

ভঙ্গুর ও নশ্বর

দুর্লভ সম্পদ দিয়া অকিঞ্চনে, করিছ হরণ
দিবাশেষে হইয়া নিষ্ঠুর।
পাছে গর্ব করে মূঢ় ভাবি তায় বৈভব আপন
তাই দানে করেছ ভঙ্গুর।
সুষমা দিয়াছ যারে হেরে তারে মেলিয়া নয়ান
কত লোক বিস্ময়ে মগন।
বিস্ময়ের অবসানে পাছে হেলা করে তব দান
তাই কর সত্বর হরণ ॥

ইতিহাস ও কাব্য

নরনারী দলে দলে আসে হেথা কাঁদে হাসে খেলে
দুদিনের লীলাশেষে চলে যায় রঙ্গমঞ্চ ফেলে।
হেরে লোক রঙ্গলীলা ঘরে ফিরে সব ভুলে যায়।
অখ্যাত লোকের কথা ইতিহাস লেখে না খাতায়,
কারো নাই মাথাব্যথা। কবি শুধু তাহাদের কথা
গল্পে গাঁথে, ছন্দে বাঁধে যুগে যুগে তাদের বারতা।
যারা অসামান্য তারা পায় শুধু ইতিহাসে ঠাঁই,
তুচ্ছ যারা ক্ষুদ্র যারা কবি কয় তাদের কথাই ॥

আমসত্ত্ব

দিন গেছে কবিতার, কেউ তা পড়ে না আর
আমিও লিখি না আর পদ্য।
নানান ধরন ধাঁচে ঢালিয়া নানান ছাঁচে
এখন লিখছি তাই গদ্য।

বহু দিন বেচিলাম, বাগানে ফুরালো আম
এখন চলে না আমে তত্ত্ব।
ফেরিওয়ালার ব্রতে নেমেছি নগরপথে,
এবে শুধু বেচি আমসত্ত্ব॥

পূজা

তোমারে হারাই পূজার আড়ম্বরে,
উপচার খুঁজে মন মোর ঘুরে' মরে।
ধূপের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পা-দুখানি,
ঘণ্টা কাঁসর ডুবায় তোমার বাণী।
মন্দিরও তব যেটুকু অর্ঘ্য পায়,
তার শতাংশ তব পদে নাহি যায়।
দিনদিন হায় করি' তোমা অবহেলা,
করিতেছি আমি শুধু পূজা-পূজা খেলা॥

বশ্যতা

যাহাদের ভোটে কারো কারো জোটে কোন প্রভুত্ব-তখ্‌ত,
তাহাদেরে রাখা শাসনে শিষ্ট সোজা নয়, বড় শক্ত।
কথায় কথায় ধর্মঘটের যে কারখানায় হুমকি,
সে কারখানায় প্রভুদের চোখে রাত্তিরে আসে ঘুম কি?
যাদের হাতের কলমের জোরে আফিস রয়েছে চলতি,
সহজ হয় কি কোন কর্তার ধরতে তাদের গলতি?
যে সংসারের পরিজনগণ একেবারে নয় বাধ্য,
সেথা স্নেহডোরে বন্দী পিতার প'ড়ে প'ড়ে মারই খাদ্য॥

হিন্দুনারী

কে বলে তোমারে বন্দী করিয়াছে অন্তঃপুরে পুরুষ সবল,
তুমি স্বেচ্ছাবন্দিনী যে এড়াইতে লোলুপের দৃষ্টির গরল।
কে বলে তোমার মুখে গুণ্ঠন টানিয়া দিল সমাজ-শাসন,
চাহ না যে তব মুখ পতি ছাড়া আর কারো ভুলায় নয়ন
লজ্জা যদি শ্রী সঞ্চারি না দিত লাবণ্য তব দ্বিগুণ করিয়া,
সজ্জা তব সঞ্চারিয়া অহমিকা দেহকান্তি লইত হরিয়া।
সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা চিরদিন যেই মহামায়া
তোমারে বেষ্টন করি নারীত্বে দেবীত্ব দিল, হেরি তাঁরি ছায়

নগরে বসন্ত

দখিনা পরশ পেয়ে মনে বুঝিলাম
এসেছে বসন্ত ফিরে সূচনা লক্ষণ খুঁজিলাম।
চেয়ে দেখি ও-পারের বাড়ীটার ছাদটির পানে
টবে ফুটিয়াছে চন্দ্রমল্লিকা ওখানে।
আগ্রা দুর্গের কক্ষে ঝরোকায় বসি
যমুনার পানে যেন চেয়ে আছে মোগল রূপসী।
বসন্ত বাতাসে উড়ে দুরন্ত অলক আঁকাবাঁকা
মুখ শুধু দেখা যায় বাকি অঙ্গ বোরখায় ঢাকা॥

সহধর্মিণী

হতে যদি প্রিয়ে তুমি দেবী, তোমার চরণযুগ সেবি
লভিয়া প্রসাদ তব বরাভয় হইতাম জয়যুক্ত,
হতে যদি প্রিয়া তুমি দাসী, উপহার নানা রাশিরাশি
অর্পণ করি হইতাম আমি সেবা-ঋণ হ'তে মুক্ত।

সংসারপথে সঙ্গিনী অঙ্গের আধা-অঙ্গিনী
দুজনে মিলিয়া করিতে হইবে দুর্গম পথে যাত্রা।
একা একা মোরা দুর্বল, অল্প মোদের সম্বল,
দোঁহার শক্তি মিলিলে জীবনে বাড়িবে তাহার মাত্রা॥

পরিণতি

পরীক্ষা-কিঙ্করী শিক্ষা, ধর্ম এবে গুরু-মঠ-গত।
নাট্য এবে সিনেমার ছায়ালোক-পাতে পরিণত।
সাহিত্য এখন শুধু যৌনরসে পরিষিক্ত কথা,
পূজা এবে বাটে মাঠে লভিয়াছে সর্বজনীনতা।
রেডিও রেকর্ডে পাবে সঙ্গীতের ভঙ্গী-পরিচয়।
ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনে চিত্রকলা লভেছে আশ্রয়।
নারীদের নরীনৃত্য সংস্কৃতির লক্ষণ চরম।
গড়ের মাঠের ভিড়ে খেলা-দেখা প্রমোদ পরম॥

দূরে ও নিকটে

গিরির গরিমা নাহি বুঝে কভু গিরিচারী বর্বর,
সমতলবাসী জ্ঞানিগণ তায় হেরে শিবশঙ্কর!
পঙ্কের ভেক মর্ম বুঝে না, পাঁকে পঙ্কজ শোভে,
দূর হ'তে অলি রচি অঞ্জলি ছুটে আসে মধুলোভে।
কবির গরিমা বুঝে না তাহার বন্ধু-স্বজনগণ,
দূর হ'তে করে রসিকেরা তারে শ্রদ্ধার নিবেদন।
ভক্তমহিমা বুঝে না কখনো বিষয়ী মানুষ যত,
স্বর্গ হইতে দেবতারা হয় শ্রদ্ধায় অবনত॥

নারীরূপ

দিগ্বিজয়ী মহাবীরে পদানত কে করিতে পারে?
নারীর রূপের কাছে জগতের সর্ব বীর হারে।
এ রহস্য জ্ঞাত তাঁরই যুগে যুগে করেছেন যিনি
রূপের আয়ুধ দিয়া অবলারে বিশ্ববিজয়িনী।
মহাবীর অর্পে প্রাণ, ব্রহ্মজ্ঞেরা পায়ে ধরে তার,
সহস্রবর্ষের তপ ভেসে যায় অত্যুগ্রতপার।
মায়া বল, ভ্রান্তি বল, ইহা হতে নাহি পরিত্রাণ,
যুগে যুগে দেশে দেশে মহাসত্য বিধির বিধান॥

অসহায়

কবি বা পণ্ডিত হও বৈজ্ঞানিক শিল্পী দার্শনিক,
রচনা বা রসনায় হতে পারো সাহসী নির্ভীক।
নিস্তার নাহিক তব সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীরের দাঁতে,
চির পরাজিত তুমি দ্বন্দ্বে বন্য বর্বরের সাথে।
জনতার ছোরা লাঠি দা-র কাছে তুমি কীটসম,
সবি ব্যর্থ তুমি যদি নাহি হও আত্মরক্ষাক্ষম।
বাঁচাতে নারেন মাতা সরস্বতী আপন সন্তানে,
আর্কিমিডিসের মর্ম উন্মত্ত বাহিনী নাহি জানে॥

অর্থই অনর্থ

অর্থ যাহার একবারে না রয়
এমন লেখা লিখতে পারি কই
অর্থলোভেও? অর্থ যাহার হয়
পাবো কোথায় এমন লেখা বই?

ফেললে বুঝে আমার লেখার মানে
ছাপলে না তাই ফিরিয়ে দিলে ভাই,
অর্থই অনর্থ যে না জানে
বুড়ো হলেও তার যে গতি নাই॥

দিনে ও রাতে

আঁখি মেলি যাহা পাই তাহা শুধু আলোকের ফাঁকি
সত্যেরে পাইতে হ'লে মুদিতে হইবে তুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢাকা পড়ে রবির কিরণে,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
মনের গভীর সত্য চেতনা রাখে যা আবরণে,
স্বপ্নের আঁধার তারে অবারিত করে এ জীবনে।
জ্ঞানে যারে নাহি পাই, যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে
দিবসে পাই না যাহা, পাই তাহা রাতের আঁধারে॥

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার !
চলে না চল-মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যামরাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়ালফুলপরাগ মাখি' আয়ত-তরলায়িত আঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণসুধাস্যন্দ কার ?
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর,
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি' তটিনী আর ছুটে না গাহি',
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর হার হারানো ছলে গোপীরা সাঁঝে যমুনাজলে
করে না দেরী আজিকে হেরি হাসিটি শ্যামচন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

ঝলসি দহে বেতসীবন হুতাশে ঝুরে হতাশ মন,
রচে না কোলে ঝুলনদোলে মিলন-প্রেমানন্দ-হার,
সখারা শোক-বিবশ বেশে মূরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথাপাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি,
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

আত্মদান

(হাফেজের অনুসরণে)

বাঁধিতে হরিণ-হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,
তোমার নয়ন-কূপে স্বপনেরা ব্যাধরূপে
নীরবে গোপনে করে বাস।
তব—চিকন চাঁচর চুলে চামেলি চমকি উঠে,
'আদীন'-প্রবালগুলি ও-অধরতটে লুটে,
সুরার সুরভি সুর শিরায় শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদুহাস।
শীতবায়ু-চঞ্চল তব পীত অঞ্চল
বিতরিছে আতরের বাস॥

প্রিয়ে—তব রূপ-রোশ্‌নিতে সবার গরব গুঁড়া,
হুরী-পরী গড়াগড়ি লুটায় হীরার চূড়া।

লাজে হেম উষা ম্লান জ্যোছনা শ্যামায়মান,
বাগেবাগে গোলাপ হুতাশ,
মিছে আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর যদি তনিমা প্রকাশ ॥

তব—গমনপথের 'পরে পাতি' দেই এই হিয়া,
ঘুমালে চরণরেণু রুমালে মুছাই প্রিয়া।
ও স্মিত কপোলকূপে পরাণ স'পিয়া দিয়া
নিবারিব মরুভূ-পিয়াস।
তব তনু-লতিকার ছোঁয়া পেলে একবার
হ'তে পারি চির ক্রীতদাস ॥

চৈতী হাওয়া

চৈতী হাওয়ার দিন যে এলো।
ফুলবাগিচায় মাতাল হয়ে বাতাস যে আজ এলোমেলো।
চপল হাওয়া আমার 'পরে ঢিটপনা যে বড়ই করে,
মাঠের পথে উঠান ছাতে বে-সামাল সে করে যে লো ॥

ঢাকতে এদিক উতুম ওদিক ঠাকুরঝি তায় দাঁড়িয়ে হাসে,
হাওয়া হলো বেহায়া আজ লাজ রাখে না এ চৈৎমাসে।
হাঁটু দুটায় দিতে ঢাকা মাথার কাপড় যায় না রাখা,
দমকা হাওয়া ঝুঁটি ধ'রে করে যে তায় এলোথেলো ॥

চপল বাতাস ফাঁক পেয়ে আজ হিয়ার মাঝেও হামলা করে,
সামলানো দায় লজ্জা-সরম উড়ায় যে সব তেপান্তরে।
মন বসে না গৃহের কাজে, মন বসে না দেহের সাজে,
ঠাকুরঝি আজ বাটনা বেটো, কুটনা কুটো, সন্ধ্যা জ্বেলো ॥

মনকে বাতাস বের ক'রে আজ যায় সে নিয়ে কোন বিদেশে,
যেথায় আছে মনের মিতা রুক্ষকেশে মলিন বেশে।
ডেকো না কেউ আজকে মোরে, বেঁধো না কেউ কাজের ডোরে।
দূত হয়ে আজ বাউল বাতাস তার বারতা কয়েছে লো ॥

তত্রমধ্যে রতিঃ

কৃত্তিপট যে এত মনোহর আগে তা' বুঝিনি সই ;
ফণী ফণিনীর ফোঁস-ফোঁসানিতে আর শঙ্কিত নই।
খুলে নে'লো জয়া গজমোতিমালা,
খুলে নে কনক-মাণিকের বালা।
সাজে না আমায় অক্ষবলয় আর ফণিমালা বই ॥

বিনোদ-কবরী বিনাস্‌নে সই, চাহি না চিকনঘটা,
তৈলবিন্দু দিস্‌না এ শিরে, রুখু চুলে হোক জটা।
আলতাকাজল রুচেনাক আর,
চাহি না উশীর-চন্দনসার।
দে'লো দে' মাথায়ে শ্মশানভস্ম মুঠো মুঠো এনে ঐ ॥

ধুতুরাফুলের অবতংসটি রচে দে' আমার কানে,
মণ্ডিত কর কটিতট, মহাশঙ্খ-মেখলাদানে।
বৃষভ-ককুদে উপাধান করি'
যাপিব লো সখি সুখ-শর্বরী,
করোটিমুণ্ডে প্রেততাণ্ডবে আর চণ্ডিমা কই ?

প্রভুর ভূষণে ভীষণ বলিয়া সবে করে পরিহার,
কিবা আছে শিব-সীমন্তিনীর তা' হতে কান্ত আর ?

প্রেম করিয়াছে বড় সুমধুর
সব রুক্ষতা পরাণ বঁধুর,
প্রিয়ের যা' প্রিয় শিরে ধরি তাই আজিকে ধন্য হই ॥

রেবাতটের স্মৃতি

মন পড়ে আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেথা তব দেখা পেতাম চকিত কৈশোর-কুতূহলে।
হেথায় পৌর সৌধ-সদনে তোমার নিবিড় বাহুর বাঁধনে,
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি' আঁখিজলে ॥

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুরু-দুরু বুক,
এলা-গন্ধিত নিভৃত আঁধারে চকিত মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জ্বলে, তোমার বিলাস-জতুগৃহ তায় গলে ॥

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই ক্ষতপদে আসাযাওয়া,
বন-মরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ আঁখিজলে লোনা চুম্বনরস,
এমনি কতই মনে আসে নবমালতীর পরিমলে ॥

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতাগুলি!
হয়ত তাহারা নব অনুরাগে আমাদেরে গেছে ভুলি।
জানে না হেথায় সোনার পিঁজরে বনের পাখীরা ছটফট করে,
পল্লবছায় গোপন-কুলায় স্মরিতেছে পলে পলে ॥

বর্ষবরণ

নবীন বরষ তোমায় বরণ করছি ছায়ার আঙিনায়।
সোনার আসন কোথায় পাব? বসো সোনার সোঁদালছায়।
হাতটি বাড়াও অর্ঘ্য নিতে চাঁপা ফুলের অঞ্জলিতে,
ঠাণ্ডা কূপের পাদ্যসলিল ঢাল্‌ব তোমার ধূলা পায়॥

ধর্‌ব অশোক-ফুলের ছাতা, অশথ গাছের কোমল পাতা
চয়ন ক'রে শয়ন তোমার পাতব গাঙের কিনারায়।
বটের ফলে গেঁথে মালা, পরাব' সব বালকবালা,
শিমুল তুলায় মুখ মুছাব মুখটি যদি ঘেমে যায়॥

শাঁখে তোমার বার্তা রটে, ঘরে ঘরে পূর্ণ ঘটে
আমের শাখা পাচ্ছে শোভা তোমার শুভ কামনায়!
হও যদি খা তৃষায় আতুর, ডাবের জলে কর্‌ব তা' দূর,
ক্ষুধা পেলে ঘুচাব' তা পাকা ফলের পশরায়॥

কালবোশেখীর ঘূর্ণিবাতে নৃত্য পেলে নাচব সাথে,
শুক্‌না পাতায় উড়িয়ে দেব' পুরাতনে শেষ বিদায়॥

শক্তি-ভিক্ষা

জয় জয় পরমেশ,
যেন—ও-নাম স্মরণে না থাকে এ মনে ধূলিমালিন্য লেশ।
তোমা পানে সদা সুপথে চলিতে শক্তি দাও,
সতত সত্য ভাবিতে বলিতে শক্তি দাও,
মিথ্যারে সদা চরণে দলিতে শক্তি দাও
মন হ'তে প্রভু ঘুচাও দ্বন্দ্ব-দ্বেষ॥

কুদিনে-সুদিনে তোমারে পূজিতে শক্তি দাও,
চরম ইষ্ট খুঁজিতে বুঝিতে শক্তি দাও,
জীবন-সমরে সাহসে যুঝিতে শক্তি দাও,
চীরবেশই মোর হয় যেন বীর-বেশ।
তব দান বলি দুঃখ সহিতে শক্তি দাও,
সকল ভ্রান্তিকলুষ দহিতে শক্তি দাও,
দেশে দেশে তব পতাকা বহিতে শক্তি দাও,
সব দেশই যেন হয় মোর নিজ দেশ।
পরের দুঃখে ব্যথায় কাঁদিতে শক্তি দাও,
সবারে মৈত্রী-বাঁধনে বাঁধিতে শক্তি দাও,
আমরণ তব ব্রতটি সাধিতে শক্তি দাও,
তোমা হ'তে শুরু তোমাতেই হোক শেষ।

তোমার সন্ধান

কেউ-বা দেখি গুরুর কাছে, তোমার তত্ত্ব বুঝতে চায়।
কেউ-বা নানান শাস্ত্র ঘেঁটে তোমার স্বরূপ খুঁজতে চায়।
কেউ-বা খুঁজে মঠ দেউলে, তীর্থপথে কেউ-বা বুলে,
সোনা ফেলি হায় আঁচলে গিরা তারা বাঁধছে হায়॥
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার গ্রহচন্দ্রতারা,
তোমার ভূধর, তোমার সাগর, তোমার কানন, নদীর ধারা,
তোমার বিহগভৃঙ্গ নিতি গাইছে তব প্রণবগীতি,
একি শুধু কথার রীতি কবির অলস কল্পনায়?
প্রতিক্ষণই দেখছি প্রভু আছ তুমি ভুবন ছেয়ে।
দেখি নিশায় কোটি তারায় আমার পানে রইছ চেয়ে।
সংজ্ঞা যদি না হয় তবু নারি তোমায় চিন্‌তে প্রভু,
শাস্ত্র গুরু দেব্‌তা কারো সাধ্য ত' নাই, সাধব কায়?

বসন

বসন তার সোহাগ লুটে, বসনের আদর ভারি,
হৃদয়ের তন্তু দিয়ে রচিব তাহার শাড়ী।
সে শাড়ী লুটবে পায়ে, জড়ায়ে রইবে গায়ে,
রাখিবে ঘোমটা ছায়ে শ্রীমুখচন্দ্র তারি।
গরবে রইবে কেঁপে, সরমে রইবে নুয়ে।
সোহাগে থাকবে লেপে, বিনয়ে লুটবে ভুঁয়ে॥

ঘেরি তার অঙ্গতটী বেড়ি তার মঞ্জু কটি
তারি দিগ্‌বিজয় রটি উড়িবে আঁচল ছাড়ি।
সিনানে আঁকড়ে ধরে কাঁদিবে তাহায় কহি
'ছেড়না কেমন করে বিরহের জ্বালা সহি'।
নমিবে কণ্ঠে টানি সে শাড়ীর আঁচলখানি
দেউলে আমার রানী চোখে প্রেম অশ্রুবারি॥

ছাত্রসঙ্গীত

মোরা—গাহি সত্যের জয়,
সদা—বরিব সত্যে, স্মরিব সত্যে, দূরিব মিথ্যা ভয়॥
সহি—সকল দুঃখতাপ, মোরা—ঘুচাব ভ্রান্তিপাপ,
মোরা—বরিয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ।
মোরা—শির পাতি' ল'ব সকল দণ্ড অপরাধ যদি হয়॥

মোরা—রাখিতে ন্যায়ের মান, হেসে—সকলি করিব দান,
মোরা—ভোগবিলাসের শফরীলীলায় হ'ব না মুহ্যমান।
হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময়॥
হ'ব—জীবন-সমরে শূর, হীন—জড়তা করিব দূর,
মোরা—হেরি' মিথ্যার আপাত-বিজয় হ'ব না শঙ্কাতুর।
মোরা—রুদ্রের শূলে ভয় করিব না, কেড়ে ল'ব বরাভয়॥

দিন ফুরানোর গান

'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে'।
এই কথা যে বল্‌লে গুরু, ফল্‌ল ঠিকই তা যে।
কোন্ সাঁজে মোর দিন ফুরাবে ভাবি,
মোর জীবনের 'পরে আছে কোন সে সাঁঝের দাবি॥

চৈৎ-ফাগুনের সন্ধ্যা সেকি বকুলগন্ধে ভরা
বিদায়-ব্যথাহরা ?
সে কি শীতের সন্ধ্যাবধূ কুহেলিগুণ্ঠিতা
তুলসীতলার দীপটি হাতে সরমে কুণ্ঠিতা ?
সাঁঝ শরতের সে হবে কি ধুত্‌রা মালা বুকে,
শশিকলায় মণ্ডিত ভাল, মাভৈঃ বাণী মুখে ?
দিন কি আমার ফুরাবে সেই সাঁঝে
তোমার মতন 'গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে' ?
করতে বরণ পার্‌ব হেসে কেমন ক'রে তায় ?
সব শিখালে, শিখালে না তাই গুরুজী হায় ॥

বেণুর ব্যথা

উতল হাওয়ায় বেণুর বনে শুন্‌ছ তুমি কোন্ বাণী ?
ও নয় তাহার প্রাণের গীতি, ও যে তাহার কাতরানি।
বেণুর তনুর রন্ধ্রে গোপন সুপ্ত যে গীত হেরে স্বপন
কে তারে হায় জাগিয়ে দেবে কে আনিবে তায় টানি ?

কয় বেণুবন হাজার গানে বক্ষে বহি খেদ করি।
কে তাদেরে বাহির করে আমার হৃদয় ভেদ করি'।
কোথায় কবি-রাখালেরা, কোথায় সুরের শিল্পী সেরা,
পরাণ আমার গুমরে মরে ঠিকঠিকানা না জানি॥

মায়ের কোলে

দিন ফুরালে শিশু যেমন যায় ফিরে তার মায়ের কোলে,
তেম্‌নি ক'রে খেলা ফেলে তোর কাছে মা যাব চ'লে।
হাত দু'খানায় ধূলি মাখা অঙ্গে খেলার চিহ্ন-আঁকা,
ময়লা ধূলি দিবি মুছে স্নেহাঞ্চলে ড'লে ড'লে॥

শাসন-বাণী শোনার আগেই ঠোঁট ফুলিয়ে ফেল্‌ব কেঁদে,
কঠোর শাসন ভাষণ ভুলে বাহুর ডোরে ফেল্‌বি বেঁধে।
খেল্‌না বাঁশী থাকবে পড়ে নামবে স্বপন নয়ন ভ'রে,
খেলার কথা, সকল ব্যথা, ভুলব মা তোর কোলের দোলে॥

খেলাশেষে

দিনের বেলায় পথের ধুলায় খেলায় খেলায় রইনু মাতি,
তোমায় মাগো ভুলিয়ে দিল খেলনা, পুতুল, সঙ্গী-সাথী।
তাই বলে কি কখনো মায় ভুলে থাকে আপন বাছায়,
হাজার কাজের মাঝেও আছ এদিক পানে কানটি পাতি॥

মাকে ভুলে গাছের তলে ছেলে আপন খেলায় মাতে,
সকল খেলায় মনটি মায়ের রয় যে ছেলের সাথে সাথে।
দিন ফুরালে ফিরলে ঘরে দেখব দ্বারের সোপান 'পরে
পথপানে মা চেয়ে আছ হাতে লয়ে সাঁঝের বাতি॥

মানসসরের মরালী

জাগো আমার মানস-সরের মরালী,—বোধন গাহিয়া।
শতেক আঁখির পাপড়ি মেলে মৃণালী,—রয় যে চাহিয়া।
কোন অতলের চিন্তামণির সন্ধানে,
কোন পাতালে রইলে তুমি কোনখানে,
নাগভুবনের নিখিল বিভব চঞ্চুতে—আনবে বাহিয়া?

কণ্ঠ ভ'রে কল্পলোকের অমিয়া,—দুগ্ধ-ধবলে,
নাগবালাদের মাথার মণি হরিয়া—আনছ সবলে?
তরঙ্গিয়া হ্রদের হৃদয় সুন্দরি,
রজত পাখা ঝটপটিয়ে সন্তরি
বাইরে এসো রসকূপের অন্তরে সুধায় নাহিয়া॥

বীণার ছুটি

বীণাখা'নি বাজবে না আর গানের পালা সায়।
রেখে দিলাম আমার বীণা বীণাপাণির পায়।
যতেক গীতি এ জীবনে গেয়ে গেছি আপন মনে
কেউ শুনেছে কেউ শোনেনি,—কীই বা আসে যায়॥

প্রতিটি গান পাপড়ি হয়ে গেল চরণপদ্মে রয়ে
কালের হাওয়া কেমন ক'রে শুকিয়ে দেবে তায়?
সহস্রদল পদ্ম মরি, মায়ের পায়ে উঠ্‌ল গড়ি,
আর বীণাতে কি কাজ আমার সেও তো ছুটি চায়॥

দীর্ঘশ্বাসে

বাঁশী আমার বোবা হয়ে রইল পড়ে ভূঁয়ে।
বাজল না আর মুখর সুরে মুখ-বায়ুর ফুঁয়ে।
একদা যা মন ভুলালো বহুজনের লাগলো ভালো,
বৃথাই তারে আদর করি শুষ্ক অধর ছুঁয়ে॥

দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজানু এবার,
নতুন সুরে উঠ্‌ল বেজে, লাগ্‌ল চমৎকার।
এ সুর আমি শোনাব কায়? এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়,
তুমি ছাড়া এর শ্রোতা নাথ মিলবে কোথা আর?

আমি

সাঁঝের বেলায় তারার মালায় চম্‌কে আমিই উঠি,
প্রভাত বেলায় বন বাগানে কুসুম হয়ে ফুটি।
কলস্বনে চলে নদী সাগর পানে নিরবধি,
তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে আমিই তাতে ছুটি॥

এই ভুবনের ছায়া পড়ে মনের দরপণে
আমার লীলাই হেরি তাতে বেড়ি এ ভুবনে।
মেঘের বুকে বিদ্যুতে ধাই, গুরুগুরু গান গেয়ে যাই।
উষার সাথে কিরণ হিরণ ছড়াই মুঠি মুঠি॥

বন্দে অনিন্দ্যাঙ্গি বসন্তরাণী।
এস— পুষ্পাসবারক্তিম নেত্রপর্ণে,
রক্তপ্রবালোজ্জ্বল রম্য বর্ণে।
জাতী-পরাগান্ধ ভৃঙ্গাঙ্গনা-বৃন্দ-সংঘুষ্যমানা তব দিব্য বাণী॥

এস— সৌগন্ধ্য-মত্তাম্র-লবঙ্গ-কুঞ্জে
মন্দার-চম্পা-নবমল্লী-পুঞ্জে,
সংবর্ধনা-দক্ষ বৈতালিক প্লক্ষ-বৃক্ষে পতত্রী শত ঐকতানী॥

এস— সুস্নিগ্ধ নেত্রে কবিকণ্ঠ-ছন্দে,
লাবণ্যবল্লী-ভুজপাশ-বন্ধে,
সঙ্গে তপোভঙ্গ-বন্ধু প্রিয়ানঙ্গ, লোলাক্ষিভঙ্গে ছলি' বিশ্বপ্রাণী॥

ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দে সঙ্গীত

পঙ্ক থেকে পঙ্কজে

আমি পড়ে আছি পাঁকে।
জলের উপরে পঙ্কজ ভাসে অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বধূসহ মধুপানে নিমগন,
মাঝেমাঝে তারা করে গুঞ্জন,
শুনিতে যে আমি পাই অনুখণ তারা যে আমাকে ডাকে॥

কোন পথ দিয়ে পরিমল গিয়ে জমে কমলের কোষে?
কোন পথ দিয়ে মধু উছলিয়ে মধুপবৃন্দে তোষে?
সূক্ষ্ম মৃণাল-সূত্র ধরিয়া
আরোহি কমলে কেমন করিয়া,
সে পথের দিশা কে দেবে বলিয়া শুধাইব হায় কাকে?

প্রীতির টান

দিন ফুরিয়ে গেছে যাদের তাদেরই গাই গান,
হৃদয় আমার গলায় না এই বিরস বর্ত্তমান।
মোর—বাল্যলীলার রসেভরা
ছিল যাহা মানসহরা
তাইত মধুর আজ যদিও সুদূর ব্যবধান॥

পাবনাক আর ফিরে তায় তাই যে কাঁদায় মোরে,
টান পড়ে যে থেকে থেকে অদৃশ্য এক ডোরে।
সামনে আমার যা বিরাজে
তার চেয়ে যে সত্য তা যে—
আমার স্মৃতি স্বপনে যার অটল অধিষ্ঠান॥

পুনর্জন্মে

ম'রে আবার জন্ম নিয়ে এই গাঁয়েতে এলে
চমকে কি কেউ চাইবে ফিরে আমায় চিনে ফেলে ?
চিনবে কি মোর আপন জনে ? চিনলে খুশী হবে মনে
যেমন খুশী হয় সকলে হারানো ধন পেলে ?

মানুষ না হয় চিনবে নাক, ঘাড়ে যাহার জট
পিতামহের পিতামহ ঐ যে বুড়ো বট,
চিনবে না হায় সেও আমারে ? গাজনতলাও একেবারে
চিনবে নাকি আমায় দেখে খেলতে সেথা গেলে ?

পথটি বনের চিনবে নাকি পায়ের পরশ পেয়ে,
চিনবে নাকি গাঁয়ের নদী আসব যখন নেয়ে।
বনের কুসুম বনের পাখী তারাও আমায় চিনবে নাকি ?
উঠবে নাকি হেসে দীঘি কমল আঁখি মেলে ?

ছত্র বিয়োগে

বর্ষাসাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার 'পরে বাদল ঝরে তার বেশি মোর চোখেই পড়ে
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই ?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিলে বাঁকড়ো, বরমপুর, হাজারিবাগে।
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে চুমি'
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুটে জাগে॥

থাকতে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জামার দাগটি বাঁটের মলিন হয়ে আছে।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে নিতাম সাথে বগল দেবে,
বসলে রেখে দিতাম কোলে হারাও ভেবে পাছে॥

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি।
হাত চলে না পিঠে যেথায় চুলকে দিতে তুমিই সেথায়।
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচিল 'পরে চড়ি॥

রৌদ্রে পুড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁচিয়ে দিলে মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী পথের সাথী ছাতা।
সেদিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্‌লা কুকুর আসলো তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে হ'লে আমার ত্রাতা॥

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইক তেমন আঙ্গুলে বল, কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি পথের ধারে॥

খোকার ছিলে ঘোড়া, খোকা ছুটতো তোমায় চড়ে।
খেলাপাতি পাত্‌ত খুকী তোমারে ঘর ক'রে।
লুকিয়ে নভেল টেবিল তলে যে সব ছাত্র কৌতূহলে
পড়ত, তুমি ছত্র তাদের পড়তে পিঠে জোরে॥

হয়ত নতুন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায়রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে জান্‌ছ না তো, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে॥

হয়ত নেহাৎ দায়েই পড়ে গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোয়নাক ধরা পড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়ত মাকড়শাদের জালে বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশুলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে॥

নতুন মালিক হয়ত দালাল, নয়ত ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটি দিন মরছ ভিজে, পুড়ে।
কেমন আছ নতুন হাতে ? সইবেত ভাই তোমার ধাতে ?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরাণ আমার ঝুরে॥

বঞ্চিত

কেন—বঞ্চিত হ'ব ভোজনে ?
মোরা—কত আশা ক'রে নিজ বাসা ছেড়ে
খেতে—এসেছি এখানে ক'জনে।
ওগো—তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ তোমার বাড়ীতে
ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?
হয়ে—ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে—দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?
তবে—তাড়াতাড়ি 'পাত কর' ব'লে ডাক'
তব আত্মীয় স্বজনে॥

মোরা—শুনেছি তোমার বাড়ী,
চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু
এনে দেয় হাঁড়ী হাঁড়ী।
তুমি—পাবনা হইতে দধি ভাঁড় ভাঁড়
গয়া হতে প্যাড়া এনেছ দেদার,
একি—সবি মিছে কথা ? দিও নাক ব্যথা
মোরা—খাবনাত বেশী ওজনে॥*

---

* রজনীকান্তের একটি গানের প্যারডি

ঘৃতং পিবেৎ

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', ঋণ করেও ঘি খাওয়া চাই,
চার্বাকের ঐ চর্বিতন্ত্র লিখে গেছে ঠিক কথাটাই।
এ ঋণ কিছু শুধ্‌তে না হয়, ঘৃতে যে হয় বল উপচয়,
(তাই) ঘৃতভুকে চাইতে টাকা পাওনাদারের সাধ্য কি ভাই?

ঋণ কেন কই?—ঘৃতননী চুরি করাও চলতে পারে,
সাক্ষ্য ইহার মানতে পারি বৃন্দাবনের পুরাণকারে।
না হরিলে মাখন সরে হ'তেন জোয়ান কেমন করে'
(আর) ঘায়েল করতেন কংসাসুরে কেমন ক'রে ব্রজের কানাই?

ধন দিলে না

যদি— ধন দিলে না গাঁঠে,
কেন— সারা শহর ভরে দিলে এত দোকানপাটে?
কেন— মিঠাই মনোহরা এত—ফলে বাজার ভরা?
কেন— বড় বড় রোহিত মৎস্য মেছুনীরা কাটে?

যদি—ধন দিলে না গাঁঠে,
কেন— সিনেমা-ঘর গড়লে এত হেথায় হাটে বাটে।
কেন— বসনভূষণ খাসা এত—শো-কেসে রয় ঠাসা?
কেন— এতো মোটর পথে এবং খেলা মেলার মাঠে? *

---

* রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্যারডি

কেরানীর রাণী

যখন সঘন গৃহিণী গরজে বরিষে বকুনি-ধারা,
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া।
রক্তিমাধরে অধীর রাগে তাঁহার আনন খানি
সতত কুঠার-পাণি সে-যে গো আমার নিঠুরা রাণী ॥

জ্যোৎস্না-নিশীথে তাহার সকাশে পরাণ বেহাগ গাহে,
ত্রস্তে স্মরি যে শ্রীহরি, ঘরনী যেম্নি গহনা চাহে।
তখন তাহার চরণে বিরাজে আমার চতুর পাণি,
আমার কুটির রাণী সে-যে-গো আমার হৃদয় রাণী ॥

আপিসে হোটেলে বাজারে গঞ্জে সকালে বিকালে সাঁঝে,
তাহার ভ্রূকুটি কাঁপায় হৃদয়ে, আরতো সকলি বাজে।
সাহেবেরো তাড়া চেয়ে হায় তারে বড়ই কঠোর জানি'
আমার কাঠের ঘানি সে-যে-গো আমি তা' একাই টানি ॥

বহুদিন পরে করেছি আবার এবার ছুটির দাবি,
দেখিব হরষে বধূরে সাদরে হইয়া অধীর ভাবি।
শুনিব কলহ রাসভ-কণ্ঠে শাসনপ্রখর বাণী।
আমার ছুটির রাণী সে-যে-গো মূর্তা বিদায়-বাণী ॥

* দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের প্যারডি

অন্যমনস্ক

শ্রীমান মনোমোহন বাবু থাকেন সদাই অন্য মনে।
খেতে চলেন গোয়াল ঘরে, শুতে চলেন ধুতরো বনে।
মশারীটায় চাদর ব'লে কাঁধে ফেলে, গেলেন চ'লে
একদা এক চাঁড়াল-বাড়ী মেয়ের পাত্র অন্বেষণে॥

উল্টে পরেন জামা-জুতো, হাতেও ভুলে পরেন মোজা,
সারা বাড়ী কলম খোঁজেন, কলম কিন্তু কানেই গোঁজা।
মুখে চুরুট নিতে ভুলে আগুন ধরান গোঁপের চুলে,
টিঞ্চারাইডিন মেখে চলেন স্নান করতে ইস্টেসনে॥

গোঁপ কামাতে কামান ভুরু, কাটেন টেরী জুতার ব্রুশে,
কলাগুলোয় ছুড়ে ফেলেন, খোসা গেলেন চুষে চুষে।
মাছের মুড়ো মনে ক'রে মুখে তোলেন বিড়াল ধ'রে,
ছড়ি ভেবে শাবল হাতে দুপুর রাতে যান ভ্রমণে॥

দুপুর বেলা ঘুমিয়ে উঠে ভাবেন বুঝি হ'ল ভোর,
নোটগুলো ডাকবাক্সে ফেলে খামটা করেন ইন্সিওর।
একদা তাঁর লাঠিটিরে খাটে রেখে শুইয়ে ধীরে,
আপনাকেই লাঠি ভেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি কোণে॥

তব্‌লা ভেবে যেদিন তিনি স্ত্রীয়ের মাথায় দিলেন চাঁটি,
সেদিন নিজের অবস্থাটা হঠাৎ বুঝে নিলেন খাঁটি।
জানিনে ঠিক, সেদিন ভ্রমে আপনাকে যথা ক্রমে
সেতার ভেবেছিলেন কিনা কর্ণ দুটির বিমর্দনে॥

কাশিমবাজারের ভাঙ্গাবাড়ী

যে বাড়ীতে মার স্নেহে কৈশোর জীবন
একদা কাটিয়াছিল সে বাড়ী দেখিতে হ'ল মন।
বহু বর্ষ পরে
গেলাম দেখিতে তারে রিক্স চড়ি বর্ষার বাদরে।
আশে পাশে যারা থাকে অবাক হইয়া তারা চায়,
তাহাদের একজনও চেনে না আমায়।
সকলে ভাবিল হাসি এ কোন পাগল,
ভাঙা বাড়ী পানে চেয়ে ফেলে আঁখিজল !

একদা রেশম কুঠি ছিল এটা—বড় বড় ঘর
ছোট ছোট ইটে গাঁথা—নাহি ছিল সদর অন্দর,—
পঞ্চাশ জনের কুঠি পঞ্চজনে রাখিয়া দখলে
ভাবিতাম নির্বাসিত হয়েছি জঙ্গলে।
একখানি ছোট ঘর ছাড়া
বাকি ঘর ভগ্নস্তূপ কিংবা ছাদহারা।
যেই ঘরে পড়িতাম করিতাম মক্সো কবিতার
সেই ঘর মোরি মতো জীর্ণ দেহে করে হাহাকার।
একটি দরজা আছে পাল্লা নাই তায়,
মার হাতে আঁকা চিহ্ন সিঁদুরের তাহার মাথায়
দেখিয়া নোয়ানু শির ! সিংহদ্বার বিশাল বিরাট
নাই আর, চিহ্ন তার বহিছে চৌকাঠ।
নাই সে কামিনীবীথি, নাই সেই লিচু গাছটিও
আমার ঢিলের ঘায়ে মিঠা ফল দিত রোচনীয়।
যেই ঘরখানি আছে পশি তার মাঝে
দেখিলাম ভিতে তার রাজে
স্বর্গত ভ্রাতার হাতে কয়লায় লেখা তার নাম।

আর দেখিলাম,
বসুধারা দাগ আঁকা আজো আছে ফাটা ভিতটার
অন্নপ্রাশনের চিহ্ন মোর মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার॥

বুজে গেছে কূপ,
সাপের খোলসে ভরা চারিদিকে শুধু ভগ্নস্তূপ
নিসিন্দা শিয়ালকাঁটা ঘেঁটু কালকিসিন্দা বিছুটি
ঘিরে আছে সে স্তূপেরে, দখল করেছে সেই কুঠি।
ও স্তূপের মাঝে
অখ্যাত সে কিশোরের জীবনের প্রত্ন-তথ্য রাজে॥

অজ্ঞাত ফুলের গন্ধ পাইলাম সেইরূপই ঘ্রাণে,
তেমনি ঘুঘুর ডাক পরিচিত লাগিল এ কাণে।
কাঠবিড়ালীরা ঘোরে শাখায় শাখায়
চকিত চঞ্চল চোখে লেজ নাড়ি তেমনি তাকায়।
সে দিনের সব গাছ লুপ্ত এক বেলগাছ ছাড়া,
শ্মশানেশ্বরের প্রিয় দেয় আজো শ্মশানে পাহারা।
ভগ্নস্তূপে ঘুরে ঘুরে খুঁড়ে কিছু মাটি
পেলাম খুঁজিয়া সেথা বাবার খড়ম একপাটি।
সে খড়ম মাথায় ধরিয়া
স্টেশনে এলাম ফিরে বাল্যতীর্থ দর্শন করিয়া॥

রসমালঞ্চের মালাকর

মহারাণী রসেশ্বরী ব'সে আছে বিরসবদন
হস্তে তার ন্যস্ত গণ্ড। পুষ্প আভরণ
সুরভি করে না তার বরতনু। নেই সে সুন্দর,
তার পুর-মালঞ্চের স্বেচ্ছাবন্দী দাস মালাকর।

বুলবুল সম যেবা ফুল-ফুল খেলা
করিত, প্রভুত্বে দৃপ্ত সর্ব কর্মে করি অবহেলা,
পারিষদ দলে যার সভামঞ্চে মিলিত না দেখা।
আসিত সে একা
সৌগন্ধ্যে মোদিত করি' সারাপথ রাণীর দুয়ারে,
মধুপ কঞ্চুকী হয়ে অন্তঃপুরে আনিত যাহারে॥

মালঞ্চে মাধবী-মঞ্চে সেইশোভা আর নেই হায়!
সে সুগন্ধ নাই কুন্দে রজনীগন্ধায়।
পলাশে বিলাস নাই, নিরুল্লাস ঝরে অযতনে,
শল্লকী পশেছে বেলা-মল্লিকার বনে।
সান্ধ্য যূথী-স্তবকের গাঁথি কেহ লীলায়িত হার,
দোলাইতে কম্বুকণ্ঠে সে রাণীর আনেনাক আর।
ফুলের কঙ্কণ গড়ি' নব ছন্দে কেহ পদ্মপাতে
পরাতে মৃণালভুজে আনে না প্রভাতে॥

কারো করে সমর্পণ করে না সে রাণী
পদ্মের কলিকা সম অর্ধাঞ্জলিখানি।
অশোকের রক্তরাগে চিত্রিত চরণে
অঙ্গুলিপ্রান্তের রেণু মুছি' কেহ লয় না চুম্বনে॥

চাহিয়াছে কত বিদ্যাধর
উদ্যানবিদ্যায় বিজ্ঞ, মালঞ্চের হতে মালাকর,
চাহিয়াছে পুরস্কার, খ্যাতি, যশোমান,
বেতন যোগ্যতা-যোগ্য, নানা ভোগ্য সেবা-প্রতিদান।
চাহিয়াছে দিবসের সারি কর্মশত
তুষিতে ভুষিতে তাঁরে অবসর মতো।

মণিমুক্তা স্বর্ণভূষা আনি রাশি রাশি
সাজাইতে সে শ্রীঅঙ্গ চাহিয়াছে কত শিল্পী আসি'।
মহারানী আজো অন্য সেবকে না চায়,
একে একে সকলেরে ম্লান হাস্যে দিয়াছে বিদায়॥

রানীর বরাঙ্গে তাই নাই আজো পুষ্পিত উল্লাস,
মনের মানুষ কই? তারে স্মরি' ত্যজে তপ্তশ্বাস।
গোধূলি ঘনায় যত সন্ধ্যার আলসে
সেই তপ্তশ্বাসে সারা মালঞ্চ ঝলসে।
পুষ্প ফুটে ঝরে আজো, তনু-স্বর্গে লভে না সদ্‌গতি,
বসন্ত বিদায় লয়, পুষ্পবনে শোকাকুলা রতি॥

দশ দিনের রানী

(লেডি জেন গ্রে)

অনেক রানীর কথা পড়িয়াছি নানা ইতিহাসে,
নিয়তির ক্রূর পরিহাসে
তোমার মতন দশা হয়নিত কাহারো করুণ!
দিয়া অসামান্য বিদ্যা, রূপ, গুণ, বয়স তরুণ,
ষোল বসন্তের মাল্য গাঁথিল বিধাতা কার তরে?
ঝুলাইতে দিনদশ সিংহাসন-কীলকের 'পরে?
শূল হ'ল তব বক্ষে কাহাদের মারাত্মক ভুল!
কি লাভ করিল তারা যারা তোমা বানায়ে পুতুল
খেলিল ক্ষমতালোভে রানী-রানী খেলা,
রক্তসিন্ধু তরিল কি তব দেহে বানাইয়া ভেলা?
রাজ্ঞীর গৌরব-যোগ্যা ছিল না তোমার চেয়ে কেহ,
কে করিবে ইহাতে সন্দেহ?

তুমি রূপকথার অপ্সরী
বিদ্যাধরী অথবা কিন্নরী
অভিশপ্তা ? রাজহস্তী শুণ্ডে তুলি নিজ পৃষ্ঠোপরি
বসাইবে স্বর্ণ সিংহাসনে,
স্বপ্নলোকবিহারিণি, কোন দিন ভাবনি তা মনে ॥

শান্তিময় গৃহাশ্রমে পতিপ্রাণা আদর্শ ললনা-
রূপে তুমি বাল্যাবধি করেছিলে নিজেরে রচনা।
তুমি ছিলে ঋজুচিত্তা বালিকা তখন,
উচ্চাকাঙ্ক্ষী যত গুরুজন
দেবীত্বের স্বর্গ হ'তে তোমা টেনে আনি'
নাগলোকে ফণাসনে বানাইল তোমা মহারানী ॥

সমুদ্রের পরপারে আরেক রানীর কথা স্মরি,
যার শিরশ্ছেদ হেরি সারা বিশ্ব উঠিল শিহরি।
প্রতিদিন প্রজারক্তে করিয়া সিনান
করিত যে প্রসাধন, তার অনিবার্য অবসান
ব্যথিত করে না চিত্ত। সেই রক্তে হইয়া রঞ্জিত
উদিল আরেক সূর্য নবযুগ করিয়া ব্যঞ্জিত ॥

রূপবতী বিদ্যাবতী আরেক রানীরে পড়ে মনে,
তারো শির ছিন্ন হ'ল আর এক রানীর শাসনে।
বহু গুণই ছিল একাধারে,
অজস্র গুণের পোত মগ্ন যার দোষের পাথারে।
নিজ পতি-ঘাতকেরে করি নির্বাচন
তৃতীয় পতিত্বে তারে দর্পভরে করিল বরণ।
তার এই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবারই কথা!

তার তরে কে পেয়েছে ব্যথা ?
প্রাপ্য তার ছিল খড়্গাঘাত,
করেনি প্রকাশ্যে কেহ তার পরিণামে অশ্রুপাত ॥

মহাপ্রাণ বিশপের জ্ঞান উপদেশ
সার্থক করিলে তুমি, ভাবো নাই এ জীবনই শেষ।
নিজের জীবনাদর্শ ধর্ম্মমত করনি বর্জন
বাঁচাইতে অমূল্য জীবন।
করেছিলে মৃত্যুভীতি জয়,
একমাত্র ছিল চিত্তে পতিসহ বিচ্ছেদের ভয়।
সে ভয় রহেনি শেষে, বড় দয়া কুইন মেরির,
একই খড়্গে ছিন্ন হ'ল একই দণ্ডে তুজনের শির ॥

হে ষোড়শি, যে জল্লাদ তব কণ্ঠে হানিল কুঠার
তুর্ভাগ্য সে কত বড় ! বিনা দোষে কেন দণ্ড তার ?
বক্ষ তার কাঁপে নি কি ? চক্ষু তার হয়নি সজল ?
এক কোপে হ'ল সারা ? হস্ত তার হয়নি তুর্বল ?
জল্লাদ যদিও হায় অন্নদায়ে, তবু সে মানুষ
জানিত সে তব চিত্ত পদ্ম-সম শুচি নিষ্কলুষ ॥

হে বিত্নষি মহীয়সি, আমি তোমা জানি
বাসন্ত স্বপ্নের স্বর্গে চিরন্তনী রানী,
মেরি বা এলিজাবেথ বসে যে আসনে
সে আসন নয় তব। তাই ভাবি মনে,—
ইতিহাসে তাহাদের অনিত্য জীবন,
সাহিত্যে তোমার স্থান নিত্য চিরন্তন।
মিরান্দা কি জুলিয়েট, ওফেলিয়া তুমি মূর্তিমতী ?

সে-সবার মাঝে তুমি বিরাজিছ সতি।
সবারে ভুলিয়া গেছি, পারি নাই তোমারে ভুলিতে।
শিল্পী হ'লে আঁকিতাম তব চিত্র রক্তের তুলিতে॥

সংসারিকা

চলিয়াছি ট্রামে
জোড়া সীট বেঞ্চি মোর বামে।
যুবকযুবতী তায় বসি পাশাপাশি
কত গল্প করে হাসি' হাসি'।
দুটি শিশু তাহাদের কোলে
পথের দুপাশ দেখে, আধআধ বোলে
মাঝে মাঝে কলরব তোলে।
দেখে মোর নয়ন জুড়ালো
এ দৃশ্য লাগিল বড় ভালো।
ভাবিনু চলিছে সাথে মোর পাশে একটি সংসার
পূরা এক সুখী পরিবার॥

এ যুগের তরুণতরুণী
তাদের সংসার নীড় এমনিত দেখি আর শুনি।
পিতা নেই, মাতা নেই, নেই ছোট ভ্রাতা বা ভগিনী।
দু-একটি শিশুসহ বধূই গৃহিণী
জীবন-সঙ্গিনী।
সংসার বলি না এরে, সংসারিকা বলি,
একটি তাহাই পাশে রহি যায় চলি॥

আধঘণ্টা কেটে গেল, এস্প্ল্যানেডে চ'ড়ে
নেমে গেল তারা দ্রুত গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে।

সীটখানি দেখি বামপাশে
চমকি উঠিনু আমি নিজ দীর্ঘশ্বাসে।
ভাবিনু কলের ট্রামে যা ঘটিছে নিতি
কালের ট্রামেও তাই—একই তো প্রকৃতি।

বলছি এ শহরের কথা,
পল্লী নিয়ে আমাদের নেই মাথা-ব্যথা।
সাতপুরুষের হেথা কেউ নয় চির প্রতিবাসী।
অচেনারা আসি
পাশের দুইটি ছোট ঘরে,
পথের ওপারে কিংবা কিছুকাল বসবাস করে,
উপর তলায় কিংবা নীচের তলাতে।
এমনি করিয়া ছোট সংসারিকা পাতে॥

শুনি তাহাদের হাসি, কলকথা, শিশুর কাকলী,
কিছুদিন পরে যায় চলি।
একটি মোটর আর একখানি লরি
সমস্ত সংসারখানি নিয়ে যায় ভরি,
চলে যায় করি নমস্কার।
দীর্ঘশ্বাস পড়ে বারবার
কাল ও কলের ট্রামে একই বিধান চোখে পড়ে।
তফাৎ যা কিছু শুধু দণ্ডে ও বছরে॥

ষট্‌পদী

(১)

তার তুল্য বন্ধু নেই যার সঙ্গে নেই পরিচয়,
করে না সে হিংসা মোর, করিতে হয় না তারে ভয়।
কিছুই করে না দাবি, পদে পদে ধরেনাক দোষ,
চায়নাক তোষামোদ, করে না সে অভিমান রোষ।
জানে না লজ্জার কথা, গৃহ-ছিদ্র করে না প্রচার,
করে না বিপন্ন কিংবা অপ্রতিভ, চায় না সে ধার॥

(২)

আঁখি মেলি যাহা পাই তাহা শুধু আলোকের ফাঁকি।
সত্যেরে পাইতে হ'লে মুদিতে হইবে দুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে তপন কিরণে,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
জ্ঞানে যারে পাইনাক যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে,
দিবসে পাই না যারে, পাই তারে রাতের আঁধারে॥

(৩)

কালতটিনীর বুকে বুদ্‌বুদ্ জাগি ক্ষণ পরে পায় বিলয়,
তাহাদের এই বিম্বজীবন একটি পলের বেশি ত নয়।
দ্বর সহেনাক, এক আরে তবু আঘাত হানে।
যেই অবসানে নেই দেরি তারে আগায়ে আনে।
বিম্বিত যাতে রবির কিরণ তাহারো গর্ব অল্প নয়।
ভাবে সে বিম্ব কনকডিম্ব হইয়াছে যেন জ্যোতির্ম্ময়॥

(৪)

সাহিত্য ব্যথার সৃষ্টি, করে চিত্তে আকুল উদাস
আচ্ছন্ন করে তা মেঘে সুনির্মল চিত্তের আকাশ।
ব্যথা যাতে বেড়ে যায় দুঃখী জন কি করিবে তায়?
সাহিত্য সুখীরই জন্য, এর মাঝে বৈচিত্র্য সে পায়।
সুখের প্রাচুর্য যার সেই কিছু করিয়া বর্জন
সাহিত্যে করিতে পারে বেদনার মাধুর্য অর্জন॥

(৫)

নাহি যেথা জাগরণ, স্বপ্নভূমি সেই অলকায়
যক্ষই ফিরিয়া যেতে চায়।
মোরা চাই সত্য-স্বপ্ন, রৌদ্রচ্ছায়া—আঁধার-আলোক,
এই মর্ত্যভূমি যার মুখে হাসি, অশ্রুভরা চোখ।
দুর্বহ দুঃসহ তবু বাঁচাইতে চাই হেথা প্রাণ,
স্বর্গ হতে মর্ত্য গরীয়ান॥

(৬)

অমৃত তোমারে দিতে চেয়েছিনু তুমি ফিরাইলে মুখ,
লাঞ্ছিত হ'ল সঞ্চিত আশা, বঞ্চিত হ'ল বুক।
আজি অসময়ে আসিয়াছ তুমি, পাতিয়াছ অঞ্জলি
থাকিলে দিতাম, নাই অভিমান তুমি ফিরায়েছ বলি'।
আজ যাহা আছে তাহা তো তোমায় দিবার যোগ্য নয়।
জান না বন্ধু বিকৃত হইলে অমৃতও বিষ হয়?

(৭)

মেঘে ঈর্ষা করি গিরি ঊর্ধ্বপানে চায়
ইচ্ছা করে মেঘরূপে ক্ষোভটি মিটায়।
চলিতে না পারে গিরি, জলদ চঞ্চল,
সে ক্ষোভ মিটে না তার ঢালে আঁখিজল।

মেঘেরে ডাকিয়া কয়,—"কেন করতালি,
আমিও তোমারি মত দেখ জল ঢালি ॥"

(৮)

প্রচণ্ড উত্তমে শেষে ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়।
প্রয়াসে নিঃশেষ শক্তি, অবসাদে স্বাদু তা না লাগে
ফলের সম্ভোগে আর আগ্রহ উৎসাহ নাহি রয়,
সর্ব রস শান্ত রসে, সর্ব বর্ণ গেরুয়ায় জাগে।
জীবনে সকল জয় গৃহে নয়, শিবিরে, শ্মশানে,
মহাপ্রস্থানের পথে শেষ জয় গৃহ হতে টানে ॥

(৯)

এ মৃন্ময় পাত্রখানি অমৃতে রাখিলে প্রভু ভরি',
দিলে তাহা বিশ্বজনে বিলাবার ভার।
অমৃত চায় না তারা, সুরা চায় তাহা পরিহরি',
সঁপিলাম তাহা তাই চরণে তোমার।
সে অমৃত তব দান, কর পান তুমি নিঃশেষিয়া
যাক এ মৃন্ময় পাত্র মাটিতে মিশিয়া ॥

(১০)

ছিল যারা কঠোর নিষ্ঠুর
ছিল যারা রুক্ষ রূঢ় ক্রূর,
পদ্মপাণি বুলাইয়া হিংসা দ্বেষ ভুলাইয়া
হে খ্রীষ্ট, তাদের চিত্তে করি দিলে সর্ব গ্লানি দূর।
দিলে ক্ষমা মৈত্রী প্রেম শিখাইলে বিশ্বক্ষেম,
তাই মোরা পাইলাম দেশে দেশে সাহিত্য মধুর ॥

(১১)

মাছে কাঁটা বিঁধে বলি নিরামিষাহারী,
ক্ষুরে গলা ভয়ে বলি রাখিয়াছে দাড়ি।
বাঁচাতে ধোবার ব্যয় গেরুয়া বসন,
পাছে ছেলে হয় ভয়ে অনূঢ় জীবন।
খাটিয়া খাওয়ার ভয়ে মঠে গিয়া বাস,
ইহাকেই বলা চলে হিসেবী সন্ন্যাস॥

(১২)

গড়িল যাহারা শৌর্যে ইন্দ্রপ্রস্থ দহিয়া খাণ্ডব,
দ্বিতীয় যুদ্ধের দ্যূতে পরাজিত তাহারা পাণ্ডব।
দ্রৌপদীর লজ্জাবেশ হরিতেছে যত দুঃশাসন
পঞ্চ পাণ্ডবের সাথে ভীষ্ম দ্রোণ মুদিত নয়ন।
দ্রৌপদী চীৎকারি ডাকে—কোথা কৃষ্ণ বিপদের মিতা।
এ দ্রৌপদী যুদ্ধোত্তর ইউরোপে লাঞ্ছিতা কবিতা?

(১৩)

অলঙ্কার শ্রী সঞ্চারে নারী অঙ্গতটে।
সকল নারীর অঙ্গে শোভা তা না পায়।
অহঙ্কারও কারো কারো শোভা পায় বটে,
সবার আচারে বাক্যে তাহা না মানায়।
অদৃষ্টের দান যার শুধুই সম্বল,
নম্র হয়ে থাকা তার শোভন মঙ্গল॥

(১৪)

ভাগ্য নয়, অসামান্য নিষ্ঠা বা যোগ্যতা
যারে খুব বড় ক'রে তোলে এ সমাজে,
শোচনীয় দুর্দিনের দুঃস্থতার কথা
রোচনীয় করি বলা তাহারেই সাজে।
ভস্মাচ্ছন্ন ছিল তার শক্তি বড় কত
জানাইতে অত্যুক্তিও নয় অসঙ্গত॥

(১৫)

থাক্‌তে প্রচুর হায় রে বখিল গরিব তুনিয়ায়,

জড়োসড়ো দৈন্য আশঙ্কাতে।

কিন্তু তারে হিসাব দাখিল করতে যে হয় হায়

পরলোকে দাতা ধনীর সাথে।

কৃপণ কৃপা করে না তাই পায় না কৃপাকণা।

ইহলোক আর পরলোক তার ত্বইই বিড়ম্বনা॥

(১৬)

নদীজলে মিশি নাই আত্মরক্ষা আশে,

তরঙ্গের অঙ্গীভূত হয়ে নৃত্য করিনি উল্লাসে।

ক্ষুদ্র বারিবিন্দু আমি রবিরে ধ্যেয়াই,

নিজের হৃদয়ে তাঁর প্রতিবিম্ব পাই।

তুদণ্ডে শুকায়ে লবে দিবসের আলো;

জনতায় ডুবে-মরা চেয়ে মোর এ মরণ ভালো॥

(১৭)

সত্যইত এ জীবন পিঞ্জরের পাখী,

নিত্য নব খাদ্য দিয়ে তারে যত্নে রাখি।

তবু সেত হয়নাক মোদের আপন

পিঞ্জরে বসি সে হায় কি দেখে স্বপন?

গহন বনেই তার মন পড়ে রয়,

এ বন মরণ ছাড়া আর কিছু নয়॥

(১৮)

নদী বলে, "অমরতা পেতে যদি চাও

বারিবিন্দু, আপনারে আমাতে মিশাও।"

বারিবিন্দু বলে—"আমি তৃণপুষ্পে লভেছি সৌরভ

তুদণ্ডের মুক্তা আমি—তাই মোর পরম গৌরব।

চাহিনাক অমরতা মিশি তব জলে
সূর্যকরে চড়ি যাব গগনমণ্ডলে ॥''

(১৯)

অভ্র-খণ্ড ভেসে আসে কত শুভ্র দিনের শূন্যাকাশে
কত না রঙের চিত্র রচিয়া মিলায়ে যায়।
তেমনি কত না স্মৃতির খণ্ড শূন্য চিত্তে ভাসিয়া আসে,
চিত্রলীলায় নিমেষে মিলায় গহন ছায়।
ছন্দে তাদেরে রূপবন্ধনে বাঁধিতে চাই,
লেখনী আনিতে তখনি তাহারে খুঁজে না পাই ॥

(২০)

তুমি যবে কাছে ছিলে দেশকালবোধ মম পেয়েছিল লয়।
যেন সে গভীর সুপ্তি অবিদিত-গত-যাম সুখস্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে নদী, গিরি, পুর, গ্রাম, প্রান্তরের সহ
'দেশ' পুন দিল দেখা দূর ব্যবধান রূপে প্রসারি বিরহ।
কাল সে সহস্র পল অলস অবশ শ্লথ প্রহরের সনে
বুকে চাপে অনুদিন চিনিলাম কালে পুন দুঃসহ যাপনে ॥

চৌপদী

(১)

মহামানবেরা চপলার মত নয়ন ধাঁধিয়া চলিয়া যায়,
রেখে যায় শুধু গুরু গম্ভীর বাণী।
নিদ্রামগ্ন দিগ্‌দিগন্ত যুগযুগান্ত জাগিয়া তায়
পরম তৃষায় ঊর্ধ্বে বাড়ায় পাণি ॥

(২)

একটি কণাও শিশিরের বারি ব্যর্থ নয়,
তারা—কিছু না পারুক ফুটায় কুন্দ কলি।
তুচ্ছ হউক তৃণপুষ্পও ব্যর্থ নয়,
ভরে—যতটা শক্তি সৃষ্টির অঞ্জলি ॥

(৩)

ধার্মিক নয় সেই সকলের চেয়ে
ধর্ম ধর্ম চীৎকার করে যেবা,
মন্দিরচূড়ে বসি ডাকে সারাদিন
পুণ্য পক্ষী কাকেরে বলেছে কেবা?

(৪)

পৃথিবীর অশ্রুকণা রূপ ধরে মাণিক্য রতনে,
অন্তর্গূঢ় দুঃখ তার রূপ ধরে তাম্র লৌহ হেমে,
আনন্দ তাহার জাগে ফল-পুষ্প-তৃণশস্য-ধনে,
সমস্ত শ্যামাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত করুণা ও প্রেমে ॥

(৫)

বনে ফুটে ফুল আপনিই ঝরে এই তার শেষ গতি,
এ নয় মৃত্যু ইহাই তাহার জীবনের পরিণতি।

ছিঁড়িয়া সবলে দেব-মানবের ভোগে যদি দাও স্থান,
তাহাই মৃত্যু, তাহাই হত্যা, তাই তার বলিদান ॥

(৬)

মাধুরী হইয়া যাহা জাগে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে,
আবেশ হইয়া তাহা চায় রূপ কবিদের চিতে।
আবেগ হইয়া তাই রূপ পায় বর্ণে ছন্দে গানে।
আনন্দ হইয়া তাই উচ্ছলিত নিখিলের প্রাণে ॥

(৭)

হয়েছে দেশের লোক বড় অর্থলোভী
অর্থ দাবি করে, ভুলে আমরা যে কবি।
আমাদের কবিতায় অর্থ তারা খোঁজে,
কাব্য এটা, ব্যাঙ্ক নয়, এ কথা না বোঝে॥

(৮)

মেঝেয় মাতুর পাতি কাটায়েছি সারা রাতি
ঘুমে সুখস্বপ্নজাল বুনে।
আজি গদিআঁটা খাটে অনিদ্রায় রাত কাটে
মিথ্যা দুষি মশকে মৎকুণে॥

(৯)

প্রবলের হাতে লোকে সহি নিত্য অবজ্ঞা-পীড়ন,
দুর্বলে দলিয়া করে প্রতিশোধ-সাধের পূরণ।
দুনিয়ার প্রথা এই—একই কথা সমাজে সংসারে,
মাথায় যে বয় জুতা সেই দক্ষ পাদুকা প্রহারে ॥

(১০)

যৌবন লালিত্যময় মধুমাসে মালঞ্চের মত,
পালিত্য-খালিত্যে জরা শুষ্ককুঞ্জ তুহিন-বিক্ষত।
যৌবন আসঙ্গময়, সঙ্গসুখে হৃষ্ট নিশিদিন,
নিরাশ নিঃসঙ্গ জরা হৃতবল, জলহারা মীন ॥

(১১)

কৃপণের মুষ্টি হতে স্বর্ণলাভ বড়ই দুষ্কর,
তার স্বর্ণ পেতে হ'লে হ'তে হয় দস্যু বা তস্কর।
তার চেয়ে ঢের সোজা মাটি খুঁড়ে স্বর্ণের উদ্ধার,
মানুষেরই ঘর্ম লভে কর্মযাগে স্বর্ণের আকার ॥

(১২)

যতটা গর্জন তব ততটা বর্ষণ তব নয়
এ-দেবমাতৃক দেশে তবু করি তোমারে বরণ।
অনাবৃষ্টি লেগে আছে এই দেশে সকল সময়
কি উপায় আছে বলো না লইয়া তোমার শরণ ॥

(১৩)

প্রেমের দোহাই দিয়ে চলে বেশ যৌনবিলাস-লালসা,
ধর্মের নামে ভণ্ড গুরুর ভবরোগহর সালসা।
শিল্পের নামে গল্পে চলিছে কত না তুস্‌কো ফলনা,
আর্টের নামে সংসার ছাড়ে দলে দলে কুলললনা ॥

(১৪)

ঘুণ ধরেছে তোমার দেশের হাড়ে
বৃথাই নানান আভরণে রঙে সাজাও তারে।
বৃথাই চামের ঘষামাজায় লাবণ্য বর্ধন্‌,
বৃথাই শিরায় ব্লাডব্যাঙ্কের শোণিত সঞ্চালন ॥

(১৫)

নামধাতু কারে বলে ?
বানায়ে তাদের লও ধাতুরূপ যা যা দিয়ে মারা চলে।
যেমন—চাবুক, ঝাঁটা, ঠেঙা, লাথি, গুঁতো,
খোঁচা, বেত, শিঙ, জুতো ॥

(১৬)

সর্বোচ্চে উঠার পরে নামিতেই হয়,
পাখা ছাড়া আর উঠা সম্ভব তো নয়।
সর্বোচ্চ সীমায় উঠি যার তিরোধান
হয়ে যায়, এ জগতে সেই ভাগ্যবান ॥

(১৭)

দ্বন্দ্ব নেই নকুলে নকুলে,
দ্বন্দ্ব নেই অহিতে অহিতে,
চিরন্তন অহি-নকুলিকা
মানুষেই হায় এ মহীতে ॥

(১৮)

যাহা মোর ছিলনাক পাই যবে তাই
তুলি বটে হর্ষে কলরব।
হারাইয়া-যাওয়া ধন যদি ফিরে পাই
করি তবে মহা মহোৎসব ॥

(১৯)

রমণী যখন প্রেমের স্বপন হেরে
পুরুষ তখন যশের পিছনে ধায়,
পুরুষ যখন প্রেমতৃষ্ণায় ফেরে
মা হয়ে রমণী তার দিকে নাহি চায় ॥

(২০)

অতীতেরে ভুলনাক, অতীত পুষ্পেরই ফল এই বর্তমান।
প্রণমিয়া অতীতেরে আমাদের গৃহে তাই নবাগতে বরি।
নান্দীমুখে পিতৃগণে শ্রদ্ধাভরে পিণ্ডজল করিয়া প্রদান
অন্নপ্রাশনের অন্ন শুভদিনে শুভখনে শিশুমুখে ধরি ॥

(২১)

শীতের পাণ্ডুপত্রের মত তরুর গায়
জরাজর্জর জীবন আমার কম্পমান,
কিশলয়গুলি করে ঝিলিমিলি ঘেরি আমায়
নব জীবনের আশ্বাস তারা করিছে দান॥

(২২)

বর না হলেও চলতে পারে চাই শ'খানেক শাড়ী,
ঘর না হলেও চলতে পারে চাই যে মোটর গাড়ী।
মঠ না হলেও চলতে পারে চাই দাড়ি আর জটা।
ঘট না হলেও চলবে যে চাই ঢাক-ঢোলকের ঘটা।

(২৩)

দাম্ভিকের সঙ্গ সবে একে একে ছাড়ে,
দম্ভপ্রকাশের তার মিলেনাক ঠাঁই।
একজন তারে শুধু ছাড়িবারে নারে
অন্তঃপুরে তারি কাছে করে সে বড়াই॥

(২৪)

আশা এবং ভয়ের মাঝে জীবন দোলে
পেণ্ডুলামের মতো,
যতই দোলে, ঘড়ির কাঁটা মরণ পানে
আগিয়ে যায় তত॥

(২৫)

ভাবে যারা জৈব সৃষ্টি দৈবের অধীন,
জীবন দিয়াছে যেবা জীবে
জীবের মুখের অন্ন সেই যোগাইবে,
তাহাদের অন্নাভাব দূর করা বড়ই কঠিন॥

(২৬)

বসুধা-কুক্ষিতে যত শস্য ধাতু ধন
উদ্ধার করিতে হবে করি প্রাণপণ।
বেচারাম বিশ্বাসের ধন যদি পায় কেনারাম,
ধনবৃদ্ধি নয় তার নাম!

(২৭)

শূন্য পেলেই ভরি মোরা যত কল্প-সৃষ্টি দিয়া,
মৃত্যু হলেই সকল মানুষে সেইখানে দিই ঠাঁই।
অসীম শূন্য কি দিয়া ভরিব? স্বপ্নেরে সাজাইয়া
কত না স্বরগ, কত না নরক, মায়ালোক রচি তাই॥

(২৮)

দিনে আমি ফসল ফলাই, রাতে ফুটাই ফুল।
ধূলায় ভরা দিবস, রাতি সৌরভে মশগুল।
লক্ষ্মী আসেন দিনের বেলায় ঘর্ঘরিয়া রথে,
সরস্বতী রাতের বেলায় নামেন ছায়াপথে॥

(২৯)

পল্লবই বাড়িয়া যায় অবিশ্রান্ত রসের যোগানে,
কুসুম ফুটে না সেই পর্ণোৎসবে মর্মের বাগানে।
প্রাচুর্যের অবসানে পত্রসজ্জা হয় অপ্রতুল।
যে রস সঞ্চিত রয় মূলে ত্বকে, ফুটায় তা ফুল॥

(৩০)

আইড়ি ক্ষেতটি রহিম শেখের, বাগানটি রাম বসুর,
পদ্মফোটা ঐ দীঘিটির মালিক তাহার শ্বশুর।
সবে মিলি যে সুষমার সৃষ্টি করে সেটি আমার,
নয়ক তাহা অন্য কারো মানুষ কিংবা পশুর॥

(৩১)

যত ফাটল ভাঙাচুরার জীর্ণতাকে
শেওলা ছাতা বুনোলতা সবই ঢাকে।
অঙ্গহানি করে যা কাল কুশ্রীতায়
প্রকৃতি তায় করতে শোধন রঙ মাখায়॥

(৩২)

প্রকৃতির নাইক বিশ্রাম,
কালের সাথেই তার যাত্রা অবিরাম।
মানুষ সে ক্লান্ত হয়, আছে তার ক্ষুধা শ্রান্তি তৃষা,
মানুষ পিছায়ে পড়ে, শেষে আর পায়নাক দিশা॥

(৩৩)

বায়ু বয় আজি বৈশাখী ফুলে ভ'রে গেছে ঐ শাখী,
ভুলে ভরে যায় মন ঝঞ্ঝায় ভাবি প্রিয়জনে লই ডাকি।
গগনে মুখর হয় দেয়া ফুটি কিনা ফুটি কয় কেয়া,
রাহী চলে ধেয়ে মেঘ পানে চেয়ে তাড়াতাড়ি গাঙে বয় খেয়া।

(৩৪)

সাধু যেজন তোমার কৃপায় বঞ্চিত সে হয় না কভু,
তার হৃদয়ই প্রাসাদ তোমার, সেইতো তোমার প্রসাদ প্রভু।
অসাধু যে চাইনা তাহার ঘটুক আর্তি দুর্গতি শোক;
চাই, তাহারেও কর কৃপা, তোমার কৃপায় সুমতি হোক॥

(৩৫)

এ জীবনে ভোগ সুখ যত
উষ্ট্রের বাবলা ডাল চিবানোর মতো।
তালু তায় ছিঁড়ে যায়, ঠোঁট তাতে চিরে যায়,
তাতা বালু পায় পায় পুড়ায় সতত॥

(৩৬)

কবিতা শুনায়ে কবি কাতর নয়ানে,
চেয়ে রয় শ্রোতাদের নীরব বয়ানে।
হেরিয়া কবির দশা করুণাই হয়,
শ্রোতাদের হৃদি গলে, কবিতায় নয়॥

(৩৭)

জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান, স্বপ্ন, স্মৃতি করে এরা জীবন নির্মাণ।
জ্ঞানকর্মে পাই দিবালোকে বাকিগুলি যামিনীর দান।
সে জীবন পূর্ণাঙ্গই নয় নাই যাতে ধ্যান, স্বপ্ন, স্মৃতি।
পিতার শাসন আছে তায়, নাই তায় জননীর প্রীতি॥

(৩৮)

যা কিছু শ্যামল তাহা ধ্বস্ত করি করে অভিযান,
মরুভূমি হানি নিত্য বালুকার অস্ত্র খরশান।
আমার ললাট-মরু অগ্রসর হয় শিরোদেশে
তার তাপজ্বালা নিয়ে, লোকে বলে টাক পড়ে কেশে॥

(৩৯)

দুঃখীর নয়নে জল ঝরে অবিরল,
করুণা যে করে তারো চোখে আসে জল।
এই দৃশ্য হেরি যার জল আসে চোখে,
সেই কবি তারি অশ্রু মুক্তা হয় শ্লোকে॥

(৪০)

আমি তো পলাশ তরু আমারে ঘেরিয়া
যূথীলতা হয়ে তুমি রহিলে বেড়িয়া।
নির্গন্ধ আমারে তুমি অর্পিলে সুবাস,
ফুটিল যে ফুল তাহা সুগন্ধ পলাশ॥

(৪১)

বলেছিলে তুমি আনিতে গোলাপ, এনেছি রজনীগন্ধা,
তাহাই করুক নন্দিত এই সন্ধ্যা।
ক্ষমা কর দেবি তোমার আদেশ পালি নি,
মানাবে কি রাঙাগোলাপ ও-হাতে গোলাপবাগের মালিনী

(৪২)

মম পল্লীর বধূদের চোখে কাজলধোয়া যে জল
কাজলা দীঘিতে করে তাই ছলছল,
আমার কবিতা সেই দীঘি-নীরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চঞ্চল,
বিকসিত হ'ল শরৎপ্রভাতে হয়ে নীল উৎপল॥

(৪৩)

বাঘছালে বসে আছ নিশ্চিন্ত জীবন,
ভেখ তব ভিখ আনে ভুখ ক'রে দূর।
আমরা খাটিয়া খাই পুষি পরিজন;
মোরাও তপস্যা করি যদিও মজুর॥

(৪৪)

রামায়ণে কয় জন বানরের খাতিরে
আজো মোরা পূজি গোটা বানরের জাতিরে।
শিবের বাহন ষাঁড় কৈলাসশিখরে,
বেপরোয়া সব ষাঁড় হাটে তাই বিহরে॥

(৪৫)

ভালো লাগে বারিবিন্দু শোভে যবে পাখীর পালখে,
তারো চেয়ে ভালো লাগে তৃণদলে প্রভাতী আলোকে।
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু ঢলঢল মুক্তাসম ভায়,
সবচেয়ে শোভা পায় দয়ালুর আঁখির পাতায়॥

(৪৬)

দার্শনিকতো হয় না চিরসিন্ধুবাসী নাবিক,
গিরির অঙ্কে জন্মি কেহ হয় কি কভু কবি ?
হলো কিনা একাধারে কবি ও দার্শনিক,
জোড়াসাঁকোর গলির ভিতর গৃহাকাশের রবি ॥

(৪৭)

বিদ্যাবুদ্ধি সব ভুলে হও শিশুর মতো বিশ্বাসী,
হও বিভূতির অপ্রাকৃতের অলৌকিকের তল্লাসী।
লজিক ফিজিক্স ভুলে শরণ লও ম্যাজিকের ভাণ্ডারীর,
মুক্তি তো চাও, যুক্তি তোলো, উক্তি শোনো কাণ্ডারীর ॥

(৪৮)

ভবিষ্যতের আশা এবং অনাগতের ভীতি,
বর্তমানের আর্তি এবং পূর্ব পাপের স্মৃতি।
এসব মিলে মানব মনে গড়ছে ধর্মভাব,
ধর্মাচারীর লাভ না হলেও হয় সমাজের লাভ ॥

(৪৯)

এই সৃষ্টির মূলে আছে অনেক গলদ ত্রুটি,
সাহস করে বলতে পারে কবিরা মুখ ফুটি।
কারণ তারাই স্বপ্নজগৎ গড়ছে অবিরল
সেখানে নেই দুঃখ, আছে আনন্দ কেবল ॥

(৫০)

বর্তমান টলমল, অনিশ্চয় অন্ধ ভবিষ্যৎ,
অতীত অটল ধ্রুব কালবক্ষে হিমালয়বৎ।
তা' হতেই তাই নামি' যুগে যুগে কত নদ নদী,
বর্তমান সমতলে সরস রাখিছে নিরবধি ॥

মেঘ

মেঘের মতন জীবন্ত বল কে বা,
এ জড় জগতে সেই তো জীবন ঢালে।
দূর থেকে করে নিখিল জীবের সেবা,
তরুলতা তৃণগুল্ম—সবারে পালে।
সেও গান গায়, শোনে পাখী গাছে গাছে।
শোননি আকাশে গুরু গুরু গুরু তান?
সে গান শুনিয়া ময়ুর-ময়ূরী নাচে,
সে গানে মোদের উড়ু উড়ু করে প্রাণ।
সেও খেলা করে, দেখনি সাগরতীরে
ঊর্মির সাথে দিগন্তে তার খেলা?
চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি ঘুরে ফিরে
দেখনি সে খেলা শারদ সন্ধ্যাবেলা?
সেও প্রেম করে নব অনুরাগভরে,
জলকণা ছুঁড়ে চাতকীর প্রেম যাচে,
ইন্দ্রধনুতে শৃঙ্গার বেশ ধরে
ধায় অম্বরে বলাকার পাছে পাছে।
হাসা-কাঁদা তার ছড়ায় ভুবনময়,
ব্যথা পেলে করে গরজি' আর্তনাদ।
শিল্পীরে তোষে করি' কত অভিনয়,
মেঘই শুধু জানে চন্দ্রামৃতের স্বাদ।
তার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা,—
ভূলোক থেকে সে দ্যুলোকে বার্তা বয়।
বহন করে সে কবির গহন ব্যথা
কল্পলোকেও, প্রিয়া তার যেথা রয়॥

হিমালয়ের উদ্দেশে

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরলচিত, কোন্ ভাবাবেগে?
সেই আদিকাল হ'তে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেঘে মেঘ।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ, নদীর স্রোতে সদুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর আচার্যের মত।
যুগ যুগ ধরি চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা, প্রশ্ন না ফুরায়,
সিন্ধুর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে ধ্রুব সত্য তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল॥

ভারতই তোমার উমা শ্মশানবাসিনী দীনা চিরক্লেশব্রতা,
তবু সে ত হর-বধূ, চাহিয়া শম্ভুর পানে ভুলেছে সে ব্যথা।
ঋষিদের তপোলব্ধ অধ্যাত্মসাধনধন, মৈনাক তোমার,
বিজ্ঞানের বজ্র-ভয়ে রচিয়াছে সিন্ধুতলে শয্যা আপনার।
পাসরিতে এই ব্যথা পেরেছ বৎসল পিতা? ভুলিবার নহে!
এ ব্যথা কি তব মর্মে মুর্মুর-দহনসম ধিকি ধিকি দহে?
বর্ষণের পূর্বে যেন বজ্রগর্ভ গ্রীষ্মঘন তব মৌনরূপ,
প্রলয়ের অভিসন্ধি রেখেছে কি করে বন্দী তব চিত্তকূপ?
অজ্ঞাত রহস্যময় বিপ্লবের পূর্বসূচি ও মূক স্তব্ধতা,
বাহ্য সংযমের আর অন্তরের ঝটিকায় কহে গূঢ় কথা।
মদন-দাহের পূর্বে শঙ্করের চিত্তে যেন রুদ্র মৌন জাগে,
গরুড়ের শেষ তন্দ্রা যেন অণ্ডচ্ছদখানি ভাঙিবার আগে॥

তোমা অতিক্রমি ঐ অভ্রভেদী জড়বাদ উঠে তুঙ্গ হয়ে,
যোগযুক্তি পদে দলি ভোগভুক্তি বিশ্বজয়ী, আছ তাও স'য়ে?

মৈনাক-পীড়ন-ক্ষোভ মহাপ্রলয়ের রূপ করিয়া ধারণ,
কবে তা উঠিবে জেগে, করি ভীম রুদ্রবেগে বক্ষোবিদারণ?
তব ধৈর্যবন্ধ টুটি পাষাণ-পঞ্জর কোটি চূর্ণ দীর্ণ করি,
সুপ্ত মহারুদ্র কবে বাহিরে আসিবে করে 'গৌরীশৃঙ্গ' ধরি,
অনিত্যের ঘটাছটা, উপদ্রব, অধ্রুবের ব্যর্থ আয়োজন,
কবে হবে ধ্বংসশেষ? তুমি বুঝি জপিতেছ সেই শুভক্ষণ?
ঐহিক ভোগের যত সমারোহ, লোকায়ত, ইন্দ্রিয়-বিনোদ,
ধ্বংস করি কবে লবে মৈনাকের লাঞ্ছনার পূর্ণ প্রতিশোধ?

ঘটোৎসর্গ

দান যে তোমার শ্রাবণমাসের প্লাবন-গঙ্গা বারি,
কতটুকু ঘটটি আমার কতটুকুন ভরতে তাতে পারি?
যা পেয়েছি ধন্য জীবন ততটুকুই পেয়ে
ক'জনের সে ভাগ্য আমার চেয়ে।
ঠাঁই পেয়েছে সে ঘট আমার পল্লীবধূর কাঁখে।
স্বর্ণঝংকারে তারা মুখর করে তাকে ॥

গৃহীরা সব এই ঘটেতেই বধূবরণ করে,
বেদীর 'পরে রেখে এরে পিতৃগণে স্মরে।
রসালশাখার পল্লবে সে মণ্ডিত গৌরবে,
ঠাঁই পায় সব গৃহের মহোৎসবে।
পূর্ণ হয়ে তোমার পূত দানে
ঠাঁই পায় সে গৃহে গৃহে পুণ্য অনুষ্ঠানে।
তোমারি উদ্দেশে
ঘটোৎসর্গ হয় যে তাতে বৈশাখেরই শেষে ॥

বাংলার মেয়ে

বাংলা মায়ের শ্যাম্‌লা মেয়ে কাঙালিনী।
খায় মুড়িগুড়, পায় না কভু লুচিচিনি।
বড় হলে মা তারে আর কয় না খুকী,
তখন নতুন নাম-করণ হয় পোড়ারমুখী॥

ভাইবোনেদের কোলে-পিঠে পালন করে,
মায়ের চেয়ে বেশিই খাটে বাপের ঘরে।
এগারো পার হলেই সে হয় গলগ্রহ,
তার হাঁপালো গড়নটি হয় দুর্বিষহ।
নাকে নোলক দু'হাতে তার কাচের চুড়ি,
পাড়ায় লোকে বলে তারে ডব্‌কা ছুঁড়ী॥

বাংলা মায়ের শ্যাম্‌লা মেয়ে অভাগিনী।
শ্বশুরঘরে গিয়েও কৃপার ভিখারিনী।
উনুনে ফুঁ' পেড়ে পেড়ে রান্না করে,
ধোঁয়ার ছলে কান্না তারই রান্নাঘরে।
ভাসুরপো-দের মানুষ করে কোলে পিঠে,
সকাল বেলায় নিকিয়ে বেড়ায় তামাম ভিটে।
পান হতে চূণ খসলে পাড়ে ননদ গালি,
শ্বশুরঘরে সবাই ধরে কসুর খালি॥

ধানকে করে পরিণত বাড়া ভাতে।
এঁটো কাঁটা বাড়তি বাসি তার বরাতে।
ভোর হতে রাত দুপুরতক জা খাটায় তারে,
বাসন মাজে, কাপড় কাচে ডোবার পাড়ে।

কাজ করে যে ভুল ত্রুটি তার হয়েই থাকে।
কেউ বোঝে না, কেউ করে না ক্ষমা তাকে।
তার সেচনেই লাউ কুমড়ায় মাচান ভরে।
গোরুর সেবা সেই করে, দুধ খায় অপরে॥

ষষ্ঠীমায়ের কৃপায় ক্রমে বাড়ে জ্বালাই
কোলে পেটে পিঠে সদাই আপদ বালাই।
সব কটা যে রয় না বেঁচে, রক্ষা তবু।
কাঁদতে সময় অবসরও পায়না কভু।
বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে অভাগিনী
কাঙালঘরে যৌবনে হয় অনাথিনী।
কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গেলে ভাইএর দ্বারে,
ভাইএর বৌএর ঝাঁটার বাড়ি তাড়ায় তারে।
সেখানে ঠাঁই মেলে না তাই ফিরেই আসে,
অন্ন দুটি ভিক্ষা মাগে জা-এর পাশে॥

বাংলা মায়ের শ্যাম্‌লা মেয়ে অভাগিনী,
গৃহাঙ্গনের তুলসীবনের তপস্বিনী।
আছে বা তার মত কে আর সেবাব্রতা,
হাসিমুখে কয়নাক কেউ মিষ্টিকথা।
রোগে পড়েও নেইক এদের অন্য গতি,
তাড়াতাড়ি মরাই এদের অব্যাহতি।
এদের কথাই খুল্লনা মা-র খেদের ছলে
গাঁয়ের কবি গেলেন লিখে আঁখির জলে।
আজো তারা তিনশ' পঁচিশ বছর পরে
ছাগল চরায় পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে॥

কচুরিপানা

জলের আগাছা পুকুরের জঞ্জাল,
লোকালয়-মাঝে কে তোরে আনিল বল !
তোরে চায় ঐ মাঠের ধারের খাল,
তোর যথাঠাঁয়ে সেইখানে ফিরে চল ॥

সেখানে চাষীরা চষিছে ধানের ভুঁই,
বেগুনিয়া ফুলে তাদের ভুলাবি তুই—
গাঁয়ের পথিক সেই ফুল দেখে থামি
পলক না ফেলি চেয়ে রবে কয় পল ॥

হেথা বলে সবে তুই যে বৈরী ঘোর,
জলের যা কিছু সম্বল হ'রে নিস্।
লুকায়ে রাখিস্ মশাদের কোলে তোর,
লোকালয়ে তুই ছড়াস্ ব্যাধির বিষ ॥

যে খালের জলে খরায় শস্য রুই
ভানুর শোষণে সে জলে বাঁচাবি তুই—
সেই খালই তোর যথা ঠাঁই সেথা চল !
জলপিপি চখা বকেরে আসন দিস্ ॥

কৃত্তিবাস

বাংলার বাল্মীকি-কবি দেবীর আদেশ লভি'
শুভক্ষণে কবে নাহি জানি,
সীতার নয়নজলে বসিয়া অশোকতলে
লিখেছিলে তব গ্রন্থখানি।
তালপত্রে সেই লেখা সে তো অশ্রুজলরেখা
অনল-অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে,
পাষাণ-হৃদয়ও তায় গলে॥

বৈদেহীর আঁখিনীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর
ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,
তাঁদের পায়ের কাছে নতশিরে আজ্ঞা যাচে
শত শত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাও নিয়ে যোঝাযুঝি
ভায়ে ভায়ে, তুচ্ছ তা'ত নয়;
পাদুকা-পূজার গান গলায় তাদের প্রাণ
ছন্দে সব দ্বন্দ্ব করে জয়॥

বিমাতা তোমার গানে কুণ্ঠিতারে কণ্ঠে টানে,
শ্বশ্রূ ভুলে বধূর পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা তুচ্ছ গণে নিজ ব্যথা
গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
পশারী পশরা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে
শুনে যদি রামায়ণপাঠ,

গুহকের ভাগ্য স্মরে দুই চোখে ধারা ঝরে
ভুলে যায় বেচাকেনা হাট ॥

বঞ্চক 'মুরারি শীল' ছাড়ে না যে একতিল,
মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে ;
দিন কাটে পাপ করি ; সাঁঝে রামায়ণ পড়ি'
রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কী যে সত্য গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ুদত্ত'
মিথ্যা সাক্ষ্য উচ্চারিতে ডরে।
যক্ষপ্রেত তব গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে,
বক্ষে টানে প্রভুও কিঙ্করে ॥

দিনে হাটে হট্টগোল অট্টহাস্য ডামাডোল,
সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
তেজপাতা চিহ্ন ধরি' অরণ্য-কাণ্ডটি পড়ি'
দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।
হীন শূদ্র বটছায় তব গীতি নিতি গায়,
গুরুর গরিমা সে-ও পায়।
গৃহে ফিরে চাষী নেয়ে দিবসান্তে শান্তি পেয়ে
মেতে রয় সে গীতিসুধায়।
তব গীতি সুমধুর মোদকের খইচূড়
আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই
দাম নিতে মুদী যায় ভুলে ॥

তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা ;
স্নিগ্ধ করে নিদাঘের খরা।

জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি রস তাতে না জানি—
শিবজটা যেন গঙ্গাভরা
জমিদার দর্পভরে প্রজারে পীড়ন করে,
তব পুঁথি পড়ে মাতা তার
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর,
গ'লে যায় তায় কর-ভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায়
অযোধ্যার নির্বোধ প্রজারা,
যেন বঙ্গে চিত্ততলে তারি প্রায়শ্চিত্ত চলে,
নেত্রে গলে সরযূর ধারা॥

তোমারেই শুধু জানি মানি শুধু তব বাণী,
শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি নবীন জীবন লভি'
অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরি মত সেধেছে কেঁদেছে কত
নিয়তিরে দিয়াছে ধিক্‌কার,
করিয়াছে ভক্তিনত এ রাম মোদেরি মত
নীলপদ্মে পূজা অম্বিকার॥

এ রামে আপন জানি লইয়াছি বক্ষে টানি,
দুঃখে তার হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে
পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
তুমি রস-গঙ্গা হ'তে আনিলে নূতন স্রোতে
শঙ্খনাদে দেখাইয়া পথ,

নব রস-ভাগীরথী, সিন্ধুমুখী তার গতি,
তুমি তার নব ভগীরথ ॥

সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খালবিল,
একাকার গোষ্পদ পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতাতৃণে শস্যফুলে
ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরী ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
'জয় রাম' গায় নরনারী ॥

সেই রসধারা বাহি' জয় সীতারাম গাহি'
ভাসে কত পোত মধুকর।
লঙ্কায় বিজয় তরে যুগে যুগে যাত্রা করে
ধনপতি চাঁদ সদাগর,
শত শাখাপ্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায়
অভিশপ্ত তরণের টানে।
'এহো বাহ্য' নহে শেষ, চলে যায় নিরুদ্দেশ
শেষ ধারা অনন্তের পানে ॥

নাগ

সাহিত্যে নগণ্য নয় তব দান আজো,
উপমায় সমাদর আছে তব, নাগ।
নামে উপাধিতে তুমি আজিও বিরাজো,
বাড়াইল বিষ তব জন্মেজয়-যাগ।

সাহিত্যের নাগলোক সে ত অবাস্তব,
এ বঙ্গই বাস্তবিক ‘বড় নাগপুর’।
আজিও সমানই চলে তব উপদ্রব।
আজো মোরা ডাক ছাড়ি ‘গরুড়, গরুড়’।

পরশি প্রিয়ার বেণী ভয়ে চমকাই,
প্রেমের গতিটি শুনি তোমারি মতন।
ছবিতে তোমারে দেখি নয়ন জুড়াই,
বেণু করে ফণা ’পরে কানুর নাচন।

আজো নাগপঞ্চমীতে বিষহরী পূজি
রজ্জুখণ্ডে সর্প ভাবি লাফিয়ে পালাই,
দুধকলা দিয়ে পালে বেদে কেন বুঝি,
দেখাও যে খেলা তাই ভাবি না বালাই।

পরীক্ষিৎ মৃতসর্প ঋষির গলায়
জড়ায়ে হারালো প্রাণ আপনার দোষে।
অর্পিয়া জীবন্ত সর্প মনসাতলায়
ভক্ত কেন মরে হায় দেবতার রোষে?

শাজাহান শেখ

আগ্রা আসি মনে পড়ে,—গিয়েছিনু দূরবর্তী গ্রামে,
শুক্লা-অষ্টমীর চাঁদ যখন সে অস্তে নামে-নামে,—
ফিরিয়া আসিতেছিনু আলি-পথে ; সম্মুখেই গ্রাম,
কোনো সাড়া-শব্দ নাই, জীবলোক করিছে বিশ্রাম
নিদ্রার বৎসল অঙ্কে। পাশে এক তেঁতুলের গাছে
বাদুড়েরা জানাইল একমাত্র তারা জেগে আছে।
সহসা পড়িল চোখে ভয়ে ভয়ে কে যেন লুকায়
শুষ্ক পত্র মর্মরিয়া, ত্রাসে মোর পরাণ শুকায়।
'কে রে' বলি চীৎকারিয়া ত্রস্তকণ্ঠে, দাঁড়ালাম থামি,
নিশাচর এল কাছে, সেলাম করিয়া কয়, "আমি,
শাজাহান শেখ, কত্তা। বড় মশা, গরম বেজায়
বেড়াতে বেড়াতে তাই জোছনায় এলাম হেথায়।"
কুণ্ঠিত জাহান যেন করিয়াছে কত অপরাধ !
অন্যমনা হ'য়ে চলি। মনে মোর বিস্ময় অগাধ,
তার কালো কপোলের তলে হেরি একবিন্দু জল
চন্দ্রালোকে মুক্তা-সম তখনো করিছে ঝলমল্।
চলিয়াছি নিরুত্তর। কত কথা শুধায় জাহান।
আমি ভাবি শুধু এই জাহানের প্রেম কি মহান্ !
এক বর্ষ হ'ল গত হারায়েছে বেচারা প্রিয়ায়,
এখানে কবর তার গোরস্তানে অশথতলায়
শুষ্কপত্রে সমাচ্ছন্ন ; তার 'পরে তুলিছে মর্মর
বেজি কাঠবিড়ালীরা। জ্যোৎস্নারাতে গড়ালে দু'পর
আসে সে, ভোলেনি আজো। প্রেম তার রহিল না ছাপা
হৃদয়-কালিন্দীকূলে, কথা দিয়া যত দিক্ চাপা॥

ওপারের স্বপ্ন

যাহাদের সাথে ছিল ভালবাসা,
সম ভাবরুচি, সম তৃষা আশা,
কে জানে কোথায় নবোপনিবেশ রচনা করেছে তারা।
এসেছে জগতে কত নরনারী,
তাদের সবারে ভাবিতে না পারি
আপনার জন, ব্যবধান টুকু হয়না কিছুতে হারা।
প্রয়াতগণের যদি দেখা পাই,
তাহাদের মাঝে যদি ফিরে যাই,
মনে হবে যেন প্রবাস হইতে স্ববাসে এলাম ফিরে।
বিদায় লইয়া এ জগৎ হতে
ভাসিতে ভাসিতে কালধারাস্রোতে
তাহাদের ঘাটে ভিড়িতে এখন ভাসিব না আঁখিনীরে।
মধুময় দিনগুলি এ জীবনে
যাপন করিনু যে সুখভুবনে,
সে ভুবন আর নাই, তাই এরে ছাড়িতে পাব না ব্যথা।
হাতসানি তারা দেয় অবিরত,
দোটানায় পড়ি' হই বিব্রত,
সকল কাজেই আনমনা হই স্মরি' তাহাদের কথা।
নিশীথ স্বপনে দেখি বারবার
চলে গেছি আমি ভবনদীপার,
যেখানে সকলে আছে পথ চেয়ে আমারি প্রতীক্ষায়।
আগাইয়া আসি মোরে নিয়ে যায়
বাঁধি বাহুডোরে চমকি শুধায়—
'পথে এত দেরি কেন? একি হেরি বেড়ি যে তোমার পায়!

অভক্তের নিবেদন

সুখের সময়ে তোমার কথাটি সহজে ভুলিয়া যাই,
সুখসম্পদ যত পাই তত প্রাপ্য বলিয়া চাই।
তখন দিবস রাতি
ধন জন নিয়ে করি শুধু মাতামাতি।
ভাবি চিরদিন অমনিই যাবে চ'লে
উৎসব কলরোলে।
তোমার দান যে তোমারে ভুলায় এযে বড় অঘটন!
যাহা কিছু পাই ভাবি সবি মোর নিজগুণে অর্জন॥

দুঃখের দিনে তোমারে স্মরার কথা,
তোমা হ'তে হই বিমুখ ততই যত পাই নানা ব্যথা।
ভাবি তুমি বুঝি করিতেছ অবিচার,
আমারে দিয়েছ মুষ্টিভিক্ষা, অপরেরে ভাণ্ডার।
আবিল করিয়া তোলে যে চিত্তে তামসিকতার গ্লানি।
সেই পরিবেশে তোমারে কি ক'রে টানি?
এটা চাই সেটা চাই বলি তোমা ডাকে কত শত লোক,
সে ডাকেরে কভু ভক্তি বলি না, আর যাই হয় হোক॥

বিপদ যখন ঘটে,
তোমাকে তখন ডাকার সময় বটে।
তখন আবার ভাবি
কোন দিন তোমা ডাকেনি যে তার ডাকার কি আছে দাবি?
লজ্জা তখন চিত্তে বিবশ করে,
করি প্রতীক্ষা অনিবার্যের তরে।
ত্রাণ কর তবু, ভাবি শুধু প্রভু এতও তোমার সয়?
মিথ্যা বলে না লোকে যবে বলে তোমারে করুণাময়॥

বাগান

বাগান নয়ত এযে পুঁথি কবিতার,
পরশ করিছে তাই মরম আমার।
প্রতি লতা যেন হেথা গীতিকবিতা,
রূপে রসে সুরে যেন বিস্ফারিতা।
কারো-বা ছন্দোদোলা পাখীরে নাচায়,
কেহ নবরূপ ধরে নতুন মাচায়।
প্রতি তরু, স্থায়ী ভাব তার বিস্ময়,
কে জানে কি ক'রে রস করে উপচয়।
কেউ দেয় তাপহরা ছায়া সুশীতল,
মধুভরা ফুল, কেউ ভাবভরা ফল।
কেহ-বা ছন্দ-শ্রীতে জুড়ায় নয়ন,
কারো কলাকৌশলে পর্ণ বয়ন।
কবিতারই মতো এরা, নয় কেউ হেয়,
কেউ দেয় প্রেয় যাহা, কেউ দেয় শ্রেয়।
কাঁচিছাঁটা গুল্মেরা সনেট খালি,
ছড়ানো রয়েছে কত ছড়া পাঁচালী।
প্রকৃতি হইতে পেয়ে নানা উপাদান,
কবিতারই মতো এরা হয় প্রাণবান্।
খাঁটি কবিতার মতো এদের জীবন,
মাটি করে নিজ রসে সতত পোষণ।
মাটির তলায় যদি মূল নাহি রয়,
কবিতা বা তরুলতা দুইই নাহি হয়॥

সেই পথখানি

গৃহ আর বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান
মাঝখানে বনপথ আছিলে শয়ান।
গৃহ মোর নিরানন্দ দৈন্যাহত ব্যাধির আশ্রয়
নানা দুঃখময়।
বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সেও নয় লীলানন্দ-নিকেতন ;
শ্রমক্লিষ্ট জীবনের 'পরে সেথা উদ্যত শাসন॥

মাঝখানে বনপথে লভিয়াছি মুক্তির আস্বাদ—
প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে নিত্য আশীর্বাদ,
সে যেন শ্যামল গঙ্গা ধুয়ে দিত সব গ্লানিভার,
আসিতে যাইতে দুইবার॥

ভুলিনিক বিদ্যাপীঠে যাতে মোর এই চিত্ত গড়া,
ভুলিনিক গৃহ মোর মার স্নেহে ভরা।
এই কবি-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান—
বনপথ, তোমা স্মরি—তুমি তার দিয়াছ সন্ধান

তুমি কি তেমনি আছ ছায়াচ্ছন্ন বিহগকূজিত
মোদিত সৌরভে বনকুসুমের কেশরে পূজিত ?
চূতমঞ্জরীর রজঃ এখনো কি স্নিগ্ধ করে ধূলি ?
কর্ণিকার বকুল কি ছায়া দেয় পুষ্পধ্বজা তুলি ?

অথবা তোমারে পিষ্ট করিতেছে ট্রাক, বাস, লরি,
বস্তুভারে নিপীড়িত কাঁদিছ গুমরি।
যে দশায় রও তুমি, তুমি মোর পুণ্য তীর্থপথ
মোর চোখে সুখস্বপ্নবৎ।

ষাট বর্ষ আগে বন্ধু মোর সাথে তব পরিচিতি,
ও মানসে আছে তার স্মৃতি ?

বড় ভালোবেসেছিলে একটি কিশোরে,
বেঁধেছিলে প্রীতিলতা-ডোরে।
আমি সেই শাশ্বত কিশোর
যদিও স্থবির জরাজীর্ণ দেহ মোর।
দেখ যদি মনে পাবে ব্যথা,
দেখা দিতে নাই তাই সাগ্রহ ব্যগ্রতা,
স্বপ্ন তব ভাঙিব না। কল্পনায় তব
চিরকিশোরের রূপে মৃত্যুর পরেও আমি র'ব॥

তোমার প্রেমের চোখে ওগো প্রিয়তম,
নাই নাই জরামৃত্যু রূপান্তর লোকান্তর মম।
জানিতে চাব না আমি হ'ল কিনা তব রূপান্তর,
জানি তব তরুলতা নয়ক অমর ;
তব তরুলতা নিয়ে মোর মনে সেই ধূলিভরা
বনফুল-সুবাসিত ছায়াপথ মাটি দিয়ে গড়া
কৈশোরের পথখানি, প্রতি পদক্ষেপে
যার স্পর্শ সঞ্চারিত শিহরণ সারা অঙ্গ ব্যেপে॥

বর্ষার দিনে

এলোমেলো বাতাস বহে দুরন্ত তার বেগ,
রবিহারা দিবস বিবশ, গর্জে কালো মেঘ।
মাঝে মাঝে বৃষ্টিধারা নামে,
হাজার পাখী উঠছে ডাকি বৃষ্টি যখন থামে।
নিঝুম সারা পাড়া,
পথে কেউই বেরোয়নি আজ এক ভিখারী ছাড়া॥

মাঝে মাঝে চিকুর হানে চক্ষে লাগায় ধাঁধা।
দূরে দেখি নদীর চড়ায় নৌকাগুলি বাঁধা।
জানালাতে বসে আছি উদাস আমার মন,
কত স্মৃতিই মনকে আমার করছে উচাটন॥

মনে পড়ে বাবার আঁখি কাতর জলভারে
দূর বিদেশে গেলাম যখন প্রণাম করি তাঁরে।
মনে পড়ে নিদ্রাহারা মায়ের আঁখি লাল
রোগশিয়রে, আর্ত যখন ছিলাম কিছুকাল।
মনে পড়ে দিদিরে মোর, যেদিন বিয়ের পরে
আঁচলে চোখ চেপে কেঁদে গেল শ্বশুরঘরে॥

মনে পড়ে পুতুল ভেঙে ফেলে
খোকন কবে কেঁদেছিল পা-দুটি তার মেলে।
অভিমানে অশ্রু-ছলছল,
মনে পড়ে প্রিয়ার দুটি নয়ন-শতদল॥

আত্মপরিচয়

দীর্ঘপথযাত্রী আমি, রৌদ্রদগ্ধ পথ সে দুর্গম,
মাঝে মাঝে বটচ্ছায়ে দূর্বাভূমি সবুজ নরম
দিয়াছে বিশ্রাম মোরে, তপ্তপ্রাণে পেয়েছি আরাম।
ভক্ত নই, মুখে তবু আসিয়াছে স্বতঃ তাঁর নাম॥

এই মোর সাহিত্য-সাধনা,
বঞ্চনায় লাঞ্ছনায় নানা দুঃখে ব্যথায় সান্ত্বনা।
দেয়নি প্রেরণা এই উদাসীনে অন্তরের বাণী,
দূর অনাগত কাল দেয়নি আমারে হাতসানি॥

ভালবাসিবার মতো কিছু মোর ছিল না জীবনে,
অথচ সে ভালবাসা পাইবার তৃষা ছিল মনে।
খুঁজিনু কবিতা লিখি ভালবাসা। মিটিয়াছে ক্ষোভ,
পাইয়াছি ভালবাসা, প্রেতপিণ্ডে নাই মোর লোভ॥

নই কারো প্রতিযোগী, নই কারো স্থানাবরোধক,
উপেক্ষার পাত্র যেবা তার কেন রহিবে হিংসক?
মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে লয় যেবা স্বতই বিদায়,
লাঠি-সোটা ঝাঁটা-কুলা গলাধাক্কা লাগেনাক তায়॥

কি হবে খাঁড়ার ঘায়ে জীবিত থেকেই যেবা হত,
বৃথা গতপ্রাণ-দ্রোণবধ-পাপ দ্রৌপদের মতো।
মৃগয়ার জন্য আছে বহু বন সিংহাদি-সেবিত,
আশ্রমমৃগের অঙ্গে শরাঘাত নহে বীরোচিত॥

পঁচিশে বৈশাখ

(১২৬৮)

একশত বর্ষ আগে ক্ষণজন্মা হে পুরুষোত্তম,
কৃতার্থা পৃথ্বীর অঙ্কে একদিন লভিলে জনম।
কেহ কি ভাবিয়াছিল সেদিন স্বপনে
কে এলো গোপনে?
জননান্তরীণ মৈত্রী যাহাদের সাথে
তাহারা কি বুঝে নাই কে এলো ধরাতে?
বীণাপাণি বাজাইয়া বীণাখানি কোন রাগিণীতে
বরণ করিল তোমা কোন দিব্য গীতে?
সূতিকাগৃহের দ্বারে কে করিল শুভ শঙ্খনাদ,
গ্রহে গ্রহে যেই ধ্বনি প্রচারিল আনন্দ সংবাদ?
শ্যাম কল্পধেনু এই মাতা মেদিনীর
বৎসল আপীন উৎসে ছুটেনি কি অমৃতের ক্ষীর?
বৈশাখের রবি করি খর করশর সংহরণ
মাঘের অরুণ রূপে আশিস কি করেনি বর্ষণ?
সোমলক্ষ্মী ব্যোমাঙ্গনে গাঁথেনি কি নীহারিকা-হার
দুলাইতে শ্রীকণ্ঠে তোমার?
চাহেনি কি ত্রিদিবের ইন্দ্র নামি গগনপ্রাঙ্গণে
ধরণীর সদ্যোজাত ইন্দ্র পানে সহস্র লোচনে?
একখানি বারিদ সে পাঠালো কি ইন্দ্রচাপাঙ্কিত
তব জন্মগৃহ 'পরি হইবারে চন্দ্রাতপায়িত?
মগ্ন করি শুষ্ক বালুচর
পদ্মা কি উঠিয়াছিল, উদ্বেলিয়া উল্লাসে মুখর?
শুষ্ক যত তৃণাঙ্কুর বৈশাখের ধূলিতলে লীন
আষাঢ়িয়া রূপ তারা ফিরিয়া কি পাইল সেদিন?

সহসা কি বনভূমি উঠিল শিহরি ?
সমীরে কি সে বারতা কহে নাই কাঞ্চনমঞ্জরী ?
সহসা সুস্বপ্ন দেখি না মানিয়া ঋতুর শাসন
মেলিল কি সব গুল্ম তরুলতা সুরভি লোচন ?
বঙ্গেরে বলেনি সিন্ধু, তুমিও তো রত্নাকর হ'লে,
দেশে দেশে এই রত্ন দেখাইব, দিও মোর কোলে ?
পশ্চিমের জ্যোতিষীরা দূর ব্যোমে নব তারা হেরে
আসেনি কি অর্ঘ্য দিতে নবজাত রাজাধিরাজেরে ?

পাখীর ডাকে

তপনের তাপ দহিতেছে মহীতল
সহিতে পারিনা গৃহতলে শুয়ে রই।
চাতক-কণ্ঠে শুনিয়া ফটিক জল
জেগে উঠি বটে আবার সুপ্ত হই ॥

ঝরে বারিধারা গগন বিজলী হানে,
বাতায়ন পাশে শিখী নাচে যায় দেখা।
সাধ যায় উঠি চাহি আকাশের পানে
ঘুমাইয়া পড়ি কানে শুনি তার কেকা ॥

শরতের রবি হেমকর পরশনে
জাগায় আমারে কার যেন সাড়া পাই।
মরালের স্বর কানে পশে খনে খনে
উঠি উঠি করি আবার ঘুমায়ে যাই ॥

আসে হেমন্ত কুঞ্জে পারাবত ছুটি
গৃহ-বলভিতে, মিঠে রোদ আসে ঘরে।
জেগে রই বটে, সাধ যায় নাক উঠি,
ঘুমের আলস আবার নয়ন ভরে॥

শীতের প্রভাতে শুক্‌নো শাখায় কাক
জানালার পাশে চোখে ঘুম লয় কাড়ি:
শুয়ে শুয়ে শুনি তাহার জরুরী ডাক
গরম বিছানা তবুত ছাড়িতে নারি॥

শীত চলে যায় একদা মলয় বায়
কুহু কুহু স্বর সহসা পশে এ কানে,
শর হয়ে বেঁধে ঘরে থাকা হয় দায়,
ছুটিয়া বাহির হই বনপথ পানে॥

কোকিলের পালা শুধু ছুটি মাস থাকে,
ছুটি মাসই শুধু আমার উজ্জীবন।
জাগি বটে আমি সকল পাখীরই ডাকে,
তাতায় মাতায় শুধু পিক-কুহরণ॥

কোকিলের যুগ ফুরালো বলিছে সবে
এসেছে এখন চিলপেচকের দিন।
আমার প্রভাত হবেনাক আর তবে,
আসিছে সুপ্তি স্বপ্নজাগরহীন॥

চিড়িয়াখানা

ফিরে এসে আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে
মনটা বড় খারাপ হ'ল বাসিন্দাদের দেখে।
বাগানী জীব হ'ল যত বনের পশুপাখী,
আমার পানে চাইল তারা মেলে করুণ আঁখি।
কেউবা খাঁচায়, কেউবা মাচায়, কেউবা ঝোলে গাছে,
অবোলা জীব, সবার যেন বলার কথা আছে।
অলস জীবন, মুক্ত আকাশ, প্রখর দিনের আলো,
মানুষের ভিড়, তাদের চোখে লাগছে কি আর ভালো?
বনে অনেক দুঃখ ছিল, কাঁপত শীতে তারা,
উদ্বেজিত করত তাদের বৃষ্টিজলের ধারা।
কতদিনই খাদ্য তাদের জুট্‌ত না ক্ষুধায়,
হিংস্র পশুপাখীর তাড়ায় থাকৃত আশঙ্কায়।
হেথায় ক্ষুধার খাদ্য যোগায় সেবক কত জন,
চিরদিনের সুরক্ষিত মিলেছে ভবন।
এমন সদয় সেবাব্রতে সুখে থাকার কথা,
তবু তারা কাতর কেন? হায়রে স্বাধীনতা!
মাঝে মাঝে আওয়াজ করে, তাই কি হাহাকার?
দীর্ঘশ্বাসের বদলে কি হাই তোলে বারংবার?
মনটা কেমন বিষিয়ে গেল, ভাব্‌না হ'ল শেষে,
মানুষেরো এই দশা কি হবে সকল দেশে?
হাজার হাজার আইনজালে বন্দী হয়ে থাকি'
মানুষও কি হবে কয়েদবাগের পশুপাখী?
বিনাশ্রমেই পশুপাখী পাচ্ছে আহার ঠাঁই,
মানুষের শ্রম বেড়েই যাবে, কমবে না এক পাই॥

সুন্দরের পূজারী

সুন্দরের উপাসক আমি চিরদিন।
যা কিছু সুন্দর মোরে রেখেছে বিমুগ্ধ ক'রে
সুন্দরের দিব্যাসন এ চিত্ত-নলিন।
যেই পঙ্কে সে নলিন আজো আছে সমাসীন,
ভুলিয়া ছিলাম তার সহজাত ঋণ।
হইনিক দর্পণের কভু সম্মুখীন॥

সে ঋণ ভোলার আর নেইক উপায়!
জরায় জর্জর হয়ে অসহ্য কুশ্রীতা লয়ে
সতত তাহার ঋণ আমারে স্মরায়।
চাহিতে তাহার পানে ঘৃণা মোর জাগে প্রাণে
সুন্দরে আবরি সে যে নয়ন মুদায়।
ত্যজিতে তাহার সঙ্গ এবে সাধ যায়॥

সুন্দরের অর্চনার একি পরিণাম?
অসুন্দর দেহটার সঙ্গ যে সহে না আর,
সুন্দরে পূজিতে বাধা দেয় অবিরাম।
এ দেহ চিতারই যোগ্য অথবা কীটের ভোগ্য।
ভাবি আমি, নাই যাতে কিছু অভিরাম—
এত কাল কি করিয়া তারে সহিলাম॥

উত্তর পাইনি আজো এই জিজ্ঞাসার,
গীতার সে মহাবাণী— উত্তর কি? নাহি জানি,
এই জীর্ণ বস্ত্রখানি করি পরিহার
পাব কিনা নব বাস কেবা দিবে সে আশ্বাস?

নব দেহে নব জন্ম লভিয়া আবার
পাব কি শ্রীসুন্দরের পূজা অধিকার ?

ঘটে যদি চিতানল সহিত নির্বাণ,
রোগ-শোক জরা তাপ সকল মালিন্য পাপ
সব হ'তে তাতে পাব চির পরিত্রাণ,
তাও লোভনীয় বটে ভাগ্যে যদি তাই ঘটে,
সুন্দরের অর্চনার স্তবনান্দী গান
রচনারও চিরতরে হবে অবসান !

সুন্দরে সেবার তবে নেই পুরস্কার ?
শ্রীমান সুন্দর দেহে জনমি 'শ্রীমতাং গেহে'
ছন্দের শৃঙ্গার বেশ রচিব না আর ?
সুন্দরের শ্রীচরণে সেই দেহ সমর্পণে
হবে নাকি সুন্দরের যোগ্য উপহার ?
চাই সেই চিরন্তন পূজা উপচার ॥

ছায়ালোকের লীলা

বনের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া ও আলোকের মধুর লীলা চুপে চুপে,
অনাদিকাল হ'তে সবার অগোচরে চলে।
ভক্তজনমনো-বৃন্দাবনমাঝে তেমনি শাশ্বত রূপে
-কৃষ্ণরাধিকার প্রণয়লীলা পলে পলে ॥
ছায়া ও আলোকের নিত্যলীলা নিয়ে এঁকেছে কত শত ছবি
রেখা ও রঙে রূপে শিল্পী কত দেশে দেশে।
কৃষ্ণরাধিকার নিত্যলীলা রসে বন্দী করে শত কবি
আমরা তাই পাই মধুর পদাবলী-বেশে ॥

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

কেহ বলে, বলি সত্য তব কাব্যে নাই তত্ত্ব,
কোনরূপ বিশেষত্ব, গূঢ় মতবাদ ।
কেহ বলে বীরব্রত কাজীর কাব্যের মত
তব কাব্যে মদোদ্ধত কই সিংহনাদ ?
ভৃঙ্গনাদ চলিবে না, যুগচিত্ত টলিবে না,
ছন্দোবন্ধে গলিবে না পাঠকের মন।
সমাজ-সচেতনতা বর্তমান কাব্য-প্রথা,
কেহ বলে সেই কথা করিতে স্মরণ।
ইংরাজির ভাবে ঠাসা চাই একালের ভাষা,
নতুবা নেইক আশা, সবি বৃথা শ্রম।
শুধু বাংলা দেশ লয়ে কূপের মণ্ডূক হয়ে
চিরদিন গেলে রয়ে, ঘুচিল না ভ্রম।
পুরাতন রীতিপ্রথা অসভ্য গ্রামের কথা,
ছেড়ে দাও বৈষ্ণবতা,—কয় কেহ কেহ।
আমি বলি,—"যাই কহ পরধর্ম ভয়াবহ,
স্বধর্মে সৃষ্টির সহ নিধনইতো শ্রেয়ঃ।
চাহি না সুলভ যশ, সঙ্গীতে না দিয়া রস
ভঙ্গীতে হবে কি বশ চিত্ত সবাকার ?
ঝিমন্তেরে চেতাইতে আমার রচিত গীতে
চোখে কি আঙুল দিতে হবে বারবার ?
ফুরায়ে গিয়াছে দিন, এবে জলহারা মীন
উপদেশ সমীচীন কেন মনে করো ?
যশ হোক, মান হোক, ইহলোক, পরলোক,
আমার স্বধর্ম হো'ক সবচেয়ে বড় !"

শেষকথা

সাহিত্য ঠিক নহ, কারণ স্থায়িত্ব তো নাই,
তোমার অনুশীলনে মোর দায়িত্বও নাই।
কারণ, তুমি বিজ্ঞান কি রাজনীতিও নও,
যখন তখন সঙ্গ দিতে সঙ্গী হয়ে রও।
এমন কিছু নওতো তুমি যাহার অজুহাতে
পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হবে জেগে গভীর রাতে।
উক্তিতে মোর চাই না হেতু, যুক্তি, মতামত,
কারো কাছে দাখিল করতে হয় না কৈফেয়ত।
শুষ্ক নীরস জীবনটারে সরস ক'রে রাখো,
অনেক দুঃখ অনেক জ্বালা ছন্দ দিয়ে ঢাকো।
তোমারি আশ্রয়ে আমি তাইত অবিরত
ভুলে থাকি এই জীবনের অনেক ক্ষতি ক্ষত।
যত ত্রুটী ভ্রান্তি প্রমাদ ঘটে এ সংসারে,
'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' চাপাই তোমার ঘাড়ে।
আত্মীয়গণ বলে ডেকে, তাড়িয়ে দাও ওরে ;
তুমি যে হায় বাঁধলে আমায় সখ্য প্রেমের ডোরে।
তোমার সাথে পরাণ খুলে যে সব কথা কই
সে সব কথা শোনার ধৈর্য কাহার তুমি বই !
কুপিতা মা মারতে এলে নেহাৎ শিশুকালে
লুকিয়ে যেতাম বৃদ্ধবটের ঝুরির অন্তরালে।
আজও করি তাই,
তোমার অন্তরালে সকল শাসনও এড়াই ॥

রাজর্ষি ভরত

পরিহরি' পরিজন গৃহসুখ রাজ্যধন,
মৃগশিশু, তোরে ভালবেসে
বহু বরষের তপ, হোম যাগ ধ্যান জপ
হায় হায় যায় সব ভেসে।
খেয়ে নিস্ তুই সব সোম চরু কুশ যব,
কোশাকুশী হ'তে গঙ্গাজল,
স্থণ্ডিলে সমিধ্ 'পরে ঘুমাইবি অকাতরে,
কেমনে জ্বালিব হোমানল ?
একি উপদ্রব তোর, মন্ত্রপূত হবি মোর
স্রুক্ হ'তে তুই নিস কাড়ি;
যোগে সমাহিত হ'লে আসিয়া শুইবি কোলে,
স্পন্দহীন হ'তে যে না পারি।
তরল আয়ত চোখ ভুলাল' রে সূক্ত শ্লোক,
দাঁতে ধ'রে টানিস্ বাকল।
সর্বাঙ্গ লেহন করি' সব তপ নিলি হরি',
শেষে কি রে করিবি পাগল ?

পরিহরি' ঘনসার, কুসুম, কুঙ্কুম আর
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
সুগন্ধ-বিলাস সবি ছেড়ে এসে, এ সুরভি
'মৃগমদে' মজিল রে মন।

রূপতৃষা, রসতৃষা, জয়তৃষা, যশ-তৃষা
সর্বতৃষা গর্বে জিনি, হায়,
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি' শ্রান্ত আজি পন্থা ঢুঁড়ি
মরুভ্রান্তি মৃগতৃষ্ণিকায়।
ছিঁড়ে এসে মায়া-ডোর ওরে মায়ামৃগ মোর
তোর লাগি ঘোর অধোগতি,—
প্রতিহিংসা প্রকৃতির, এ যে দণ্ড বিদ্রোহীর!
মায়াধীশ! দাও স্থির মতি!

* * *

থাক্ তুই রে শাবক অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক্
চতুর্বর্গ-ফলের পাদপ।
জীবন্ত সবার চেয়ে যে বাৎসল্য তারে পেয়ে
হত্যা করি করিব কী তপ?
যদি যোগ-তুষানলে শাসন-শোষণবলে
রসলেশশূন্য সারা প্রাণ,
অন্তরে বাহিরে জটা, তবে মিছে তপোঘটা
বৃথা রস-ব্রহ্মের সন্ধান।
বৈরাগ্যের শ্যেন যদি অনুসরে নিরবধি
প্রেম-শুক ত্রাণ কোথা পায়?
সব ঠাঁই হ'তে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায়॥

মা মেনকা

মা মেনকা, অশ্রু তোমার ডুবালো আজ বঙ্গভূমি,
গলায়ে হায় শিলার হিয়ায় কত কাঁদন কাঁদবে তুমি?
বছর যে প্রায় হ'ল গত, প্রতিটি মাস যুগের মত,
দিলে বিদায় সেই বিজয়ায় প্রাণ-দুলালীর বদন চুমি'।
আজ ভাদরের বাদর-ধারায় ডুব্‌ল বুঝি বঙ্গভূমি॥

প্রাণ-কুমারের পক্ষশাতন নূতন ক'রে পড়ল মনে?
অকারণে বন্দী সে যে সিন্ধুতলে নির্বাসনে।
চিরি' শিখর, পাথর ভাঙি,' গিরিহৃদয় রক্তে রাঙি',
ছুট্‌ল তোমার ব্যথার পাথার হারাধনের অন্বেষণে।
বাজের ধ্বনি বজ্রপাণির নির্যাতনে জাগায় মনে॥

এলায়ে কেশ বেলা যে যায় শৈলচূড়ার পৈঠা 'পরে,
মেঘের ডাকে কণ্ঠাগত প্রাণটা তোমার কেমন করে?
রিক্ত মা সাজসজ্জা শোভন, তিক্ত লাগে রাজ-আয়োজন,
পাষাণ-পতির চরণতলে চোখে ঝোরার ঝর্ণা ঝরে।
ভাসায়ে ঘরকর্ণা জাগো ক্ষুণ্নমনে শূন্য ঘরে॥

ব্যথা তোমার তিতাল সব মাতার হৃদয় বঙ্গভূমে,
জননীরা চম্‌কে কেঁপে বক্ষে চেপে বাছায় চুমে।
বাছনি যার নেই মা কাছে কেমনে আজ সেই মা বাঁচে
অশনিরাজ শাসনে আজ হরেছে তার চোখের ঘুমে।
শিহরে আজ সব কুসুমের মাতৃকেশর বঙ্গভূমে॥

দেশজননীর বুকটি আজি স্তন্যরসের আশায় ভরে।
ক্ষেত্রবালার নেত্র নীরব ভালবাসার ভাষায় ভরে।
বনজননীর ভুজ-লতায় ফুট্‌ল স্নেহ সুজলতায়,
গোষ্ঠমাতার ওষ্ঠসুধায় শ্যামল সোহাগ উথ্‌লে পড়ে।
হাম্বাডাকে বৎসলতায় ধেনু আজি বৎসে স্মরে॥

পক্ষিমাতা বুকের পাখায় শাবকগুলি আগ্‌লে রাখে;
গর্ভাধানে বলাকা ধায়, চখী প্রসব-ব্যথায় ডাকে।
মীনজননীর ডিম্ব ফুটে অম্বুতে তার বিম্ব উঠে,
মক্ষীমাতা অসঞ্জাত বংশধারার জন্য চাকে
আপনি র'য়ে বঞ্চিত যে প্রাণের মধু সঞ্চি' রাখে॥

অশ্রু তোমার বন্ধ্যা-বুকেও দিল অকাল-স্তন্য এনে;
সৎমা হঠাৎ সৎ-মেয়েরে অঙ্কে টানে আপন জেনে।
পুত্রহারা বিড়ালছানায় বক্ষে চেপে আদর জানায়,
কন্যা যাহার গলগ্রহ সেও তারে নেয় গলায় টেনে।
অশ্রু তোমার ফল্গু-বুকে দিল স্নেহের বন্যা এনে॥

উমার মা গো, সদাই জাগো আমার দেশের গেহে গেহে,
বৎসলতার উৎস রচি' প্রসূতিদের দেহে দেহে।
পুত্র যাপে ভাগ্যফলে বন্দিজীবন সিন্ধুতলে,
গঙ্গাসাগর হ'ল লোনা নয়নঝরা তোমার স্নেহে।
কাঁদ্‌ছ মাগো যুগে যুগে বাংলা দেশের গেহে গেহে॥

পিণ্ডদান

আনন্দরাম রায়,
তোমারে একটি প্রশ্ন করিতে মোর আজি সাধ যায়।
পিতামহস্য তুমি ছিলে পিতামহ—
কহ মোরে দাদু কহ,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কেমনে বাঁচিলে তুমি,
পাষাণ যখন হ'ল রাঢ়ী মাটি, শ্মশান বঙ্গভূমি?

তুমি ত তখন বারো বছরের ছেলে!
রেশন ছিল না, চা'ল গম কোথা পেলে?
বাপ-মা তোমার উপবাসী র'য়ে কত দিন কত রাত
যোগাইল তব মুখে দুই মুঠা ভাত?
ঘরে তোমাদের ছিল সম্বল? লুটে লয়নিক লোকে?
কি ভাবিতে তুমি অনাহারীদের প্রাণহারা দেখি চোখে?

ক্ষুধিতে হয় তো সঁপিয়া মুখের গ্রাস,
শুধু জলপানে করিয়াছ উপবাস।
দুধ খেতে বুঝি পোষা রোগা গাভীটার?
তৃণটি ছিল না, চাল টেনে খেয়ে দুধ শুকায় নি তার?
ভাদরের রাতে ক্ষুধা মিটাইতে পাকা তাল বুঝি খেলে?
তালকুড়ানীর অভাব ছিল না, তাই বা কোথায় পেলে?
ক্ষুধার জ্বালায় মরিল কি তব মাতা?
কয় দিন তুমি চিবালে গাছের পাতা?
তেঁতুল গাছেও পাতাটি ছিল না, পাতা দিল কোন্ তরু?
কেমনে তরিলে ছিয়াত্তরের মরু?

মোর পিণ্ডের অতীত যদিও হয়েছ পিতৃলোকে,
নান্দীমুখের আসনে অশ্রু ঝরিছে তবু এ চোখে।
অশ্রুমাখানো পিণ্ড তোমায় আগে দিব পিতামহ,
তব পৌত্রের পৌত্রের এই তণ্ডুল ক'টি লহ।
বহু ক্লেশ সয়ে একদা পিণ্ডাভাবে
বেঁচে গেলে, তাই ধন্য হয়েছি পিণ্ডাধিকার লাভে।

বন্দী শাজাহান

কোথা আজি সম্রাট্,
শাহী সমারোহ ঘটা অহরহ কোথা নওরোজী হাট?
তোমার রচিত শুক্তি-খচিত মীনার স্বর্ণচূড়
করে উপহাস, শোকের বিলাস বেদনা কি করে দূর?
আপন প্রাসাদে বন্দী রহিয়া হেরিতেছ ভাবাকুল
আপন কীর্তি, তাহা কি তোমার নয়নে হানে না শূল?
কালের রথ কি থামে রাজভয়ে? নিঠুর চক্রতলে
হুজুর মজুর আমির ফকির সবারে পিষিয়া চলে।
রাজার প্রাসাদ দীনের কুটীর সমান দাগাই পায়,
গম্বুজে ব্যথা করে 'গমগম', মাঠে মাঠে 'হায় হায়'।
বাদশা তাহার বেগম হারায়, কৃষক কৃষানী তার,
রাজা ও রায়তে আনে একঘাটে বুকফাটা হাহাকার।
গরীব কাঁদিলে গোরের মাটিই তিলে তিলে যায় টুটে,
বাদশা কাঁদিলে মণিমুক্তাতে তাজখানি গ'ড়ে উঠে।
প্রাণ কাঁদে পথে পথে,
ব্যথার শৈল ঢাকা পড়ে ধন-দৌলতে ইমারতে?

কুড়ানী

ভরা কুয়াসায় পোষের বেজায় হাড়-কনকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকতে একেবারে,
চাটা ছেড়ে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠে মাঠে ধাই, যা পাই কুড়াই ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতের নাড়ায় শামুক খোলায় খুঁটে খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে প'ড়ে উথলিয়ে ওঠে প্রাণ।
হেঁটে হেঁটে জোরে সারা মাঠ ভ'রে সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার চাষীরা আঁটি আঁটি বোঝা বোঝা।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জর-জর, পা দুখানা ফুটি-ফাটা,
মানি না কুচল উচল নীচল মাঠের কাঁকর-কাঁটা।
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চূড়-চূড়, ভ'রে যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয়,—চাষে কি করবি তোরা? কুড়ুনী বাঁধবে গোলা।

শীত যায় যেই ক্ষেতে ধান নেই, সারা মাঠ করে ধু ধু,
গাছতলা ছায় শুক্‌নো পাতায়, মরমরি ওঠে শুধু।
ছোট্ট ঝুড়িটি রেখে এইবার বড় ঝাঁকা তুলি কাঁখে,
শুকনো পাতায় মোর আঙিনায় জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়ি নিয়ে ফিরি রাখালের পাছে পাছে
গল্প শুনিয়ে, ঘুরি মোষ গোরু বাছুরের কাছে কাছে,—
করা চাই পুঁজি কাঠ খড়ি খুঁজি বনে বনে মাঠে মাঠে।
পড়সীরা কয়—শোবে একদিন কুড়ুনী রুপোর খাটে॥

বরষায় বাধা পথঘাটে কাদা, কিলবিল করে সাপ,
তালপাতা খড়ে ছাওয়া চালাঘরে জল পড়ে টুপটাপ।

কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে নিয়ে ঝুড়ি ঝাঁকা।
সারা খরানিতে কুড়িয়ে জমাই যত কাঠি পাতা ঘুঁটে,
বাদলের দিনে তাই লোকে কেনে, তাতে মোর ভাত জুটে।
নালীর পাউষে জালি পেতে ব'সে থাকি সারাদিন ঠায়,
চুনোচানাপুঁটি ধ'রে মুঠি মুঠি ফিরি কাদামাখা গায়।
আধা তার খাই টক রেঁধে, বাকি আধা বেচে চা'ল আনি।
পড়সীরা কয়,—খাই নিরিমিষ, কুড়ুনী মাছের রানী॥

বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভ'রে,
পুকুরডোবায় কলমী শুশুনী তুলে আনি ঝুড়ি ক'রে।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায় মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
কুড়াই ঝিনুক গুগলি শামুক জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ হাঁ করে আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয় লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় যা যা খুঁটে॥
এম্‌নি ক'রেই তিলটি কুড়িয়ে তালটি ক'রেই জড়ো,
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছি তো এত বড়!
পড়সীরা কয়—গতর দেখ না, হাত মুখ গোলগাল,
এত যে খাওয়াই মোদের মেয়ের শুকুনীর মতো হাল॥

খোঁড়া মা আমার ঘরে প'ড়ে রয়, বাপ-মরা মনে নাই।
ঘর পুড়ে গেলে পাড়াপড়সীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দিই না পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
বাসনও মাজি না, ভিখারী সাজি না, এমনি ক'রেই রই।
চলি এইবার, আজ হাটবার ডেকোনাক আর পিছু,
যাই হাটতলা সেথা শেষবেলা কুড়ালে মিলবে কিছু॥

মৃগ

আয় মৃগ কাছে আয়,
ভয় নেই তোর আমি ব'সে আছি মালিনীর কিনারায়।
হাতে দেখ্ মোর দূর্বার দল, পাশে নেই ধনু-শর,
তবে কেন তোর ডর ?
তোর চোখ দুটি কবির স্বপ্নে গড়া,
কত না আকূতি আরতি কাকুতিভরা।
মনে যে জাগায় সরল তরল মায়ামাখা দুটি চোখ,
অতীতের সেই ফেলে-আসা মায়ালোক।
জড়ভরতের মুগ্ধ মমতা ও-নয়নে হেরি আঁকা,
যমুনাকূলের ব্রজের মাধুরী-মাখা।
ও আঁখির দরপণে—
হেরিতেছি আমি গোদাবরী-তীর মালিনী-তীরের সনে।
হেরিতেছি তায় ঋষিদের আশ্রম,
তোর দুটি চোখ দিব্যচক্ষু বলি হয় মোর ভ্রম।
ও দৃষ্টি তোর নেই যেন ইহলোকে,
ঋষিরা তাদের পরম তৃষা কি রেখে গেছে ঐ চোখে ?
দেশকালাতীত তোর ও-দৃষ্টি কোন্ সে অসীমে ধায়,
চোখে চোখ দিতে প্রাণ কেন চমকায় ?

অঙ্গ আমার লেহন করিয়া ক'রে দে আমায় শুচি,
যুগ যুগ হতে জমা মালিন্য সবি যাক তায় ঘুচি।
আপন ভবনে যেতে চাই পুন ফিরে
তোরে সাথে ক'রে সেই বিন্ধ্যের পাদমূলে রেবা-তীরে।

শৃঙ্গ-শিখরে অঙ্গ আমার করে দে কণ্ডূয়ন,
ঢুলিয়া পড়ুক রসাবেশে ছু'নয়ন।
বুক করে ছুরুছুরু,
প্রেমের ভারতে স্বপ্নের পথে যাত্রা হউক শুরু।
আয় মৃগ কাছে আয়,
তোর রোমাঙ্গ পরশ করিতে রোমাঞ্চে ভরে কায়॥

লতার বাঁধন

বহুদিন পরে বাগানে যাইয়া দেখি—
তেলাকুচা লতা উঠেছে দাড়িম গাছে।
বলিনু মালীরে, এই দিকে আয়। একি
ছিঁড়ে দে এখুনি ও-লতা রাখতে আছে?

দেখি ডালে ডালে ডাগর ডালিম দোলে,
তেলাকুচা তায় পেকে করে টুকটুক,
মালী জোর টানে লতার বাঁধন খোলে।
কহিনু মালীরে,—কি করিস্ উজবুক!
কালা হলি নাকি? গাছটার চারিভিতে
বললাম শুধু ঘাসগুলো ছিঁড়ে দিতে॥

বরুণ

হে বিরাট বারীন্দ্র বরুণ,
চাহে সৃষ্টি তব দৃষ্টি স্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্ন করুণ।
উগ্রতপ করে মরু তব কৃপাকণার ভিখারী,
মেরু তব পুঞ্জীভূত অট্টহাস্য-রজত-ভাণ্ডারী।
তব বিশ্বরূপ-দেহে নদনদী শিরা উপশিরা,
বহে রসধারা মৃতসঞ্জীবনী বারুণী মদিরা।
তাপদগ্ধ জীবলোক তব কৃপা-ভৃঙ্গারে স্নাতক,
রসগঙ্গাধর, এই শুষ্ক ধরা প্রসাদ-চাতক।
ঢালো ঢালো আশীর্বাদ প্রস্রবণে, প্রপাতে, সরিতে,
গিরিগাত্র বিদারিয়া মৃত্তিকার তৃষার্তি হরিতে।
নিঃস্ব বিশ্বনরগণে অন্নজল দাও মাতামহ,
হর' তব করস্পর্শে দাবদাহ দারুণ দুঃসহ॥

প্রভঞ্জনে বিশৃঙ্খল ঘনপুঞ্জে তব কেশপাশ,
ধূসরে শ্যামল করে সঞ্জীবন তোমার নিশ্বাস।
শিশুমার তুলে জয়ধ্বনি,
রক্ষে তিমি তিমিঙ্গিল তিমিরান্ধ তব রত্নখনি।
কণ্ঠে তুলে শুক্তিমাল্য, রচে বেদী মকর-মকরী,
দিগ্‌বধূরা শঙ্খনাদে বন্দে তোমা দিবস-শর্বরী।
পুষ্পিত প্রসন্ন দৃষ্টি কুবলয়ে, কুমুদে, কহ্লারে,
বাণী তব বিদ্যুদ্দামে সংঘোষিত দীপকে মল্লারে!
পুষ্কর ধরেছে ছত্র জলস্তম্ভে সন্ধ্যাভ্র-স্বপনে,
পর্জন্যের হস্তে উড়ে ইন্দ্রায়ুধ-ধ্বজা দিগঙ্গনে॥

দেবরথী, নমি তব পায়,
শিবরূপে প্রেয় দাও, শ্রেয়ঃ দাও রুদ্র চণ্ডিমায়।
উর্মিরথে জয়যাত্রা, প্রভঞ্জন রথ-বল্গাধর,
ছুটে সিন্ধুবাজি-রাজি, উৎক্ষেপিয়া ফেনিল কেশর।
সীমারেখা হারাইয়া একাকার অষ্ট চক্রবাল,
দিগ্বিজয় অভিযানে, পাশায়ুধ মহাদিক্‌পাল!
চূর্ণ করো দুর্দম উন্মদে—
অবিদ্যার সমারোহ দুর্গসৌধ পুরজনপদে.
কল্পান্ত-প্রলয়সম ত্রস্ত ধ্বস্ত করি সৃষ্টি-লীলা—
নক্রধ্বজ রথচক্রে গলাইয়া শৈলমনঃশিলা।
বিজ্ঞানের বালুবন্ধ ভেঙে ছুটে প্লাবনের স্রোত,
দূর্বাদর্ভখণ্ড-সম ডুবে তায় কত শত পোত।
তব বলি-পুষ্পপ্রায় ভাসি মোরা উল্লোল কল্লোলে,
এ বিশ্ব প্রহ্লাদসম মত্ত দন্তিশুণ্ডে যেন দোলে॥

তোমার দিঙ্‌নাগ-শিরে মগ্নপ্রায় মিহির-সংঘাতে
ধ্বক ধ্বক গজমুক্তা পিঙ্গোজ্জ্বল ময়ূখ-সম্পাতে,
যেন-বা নূতন সূর্য। অভ্রভেদী বাড়বাগ্নি জ্বলে,
দ্বীপে দ্বীপে সেতুস্তম্ভ, জতুগৃহসম তায় গলে।
অবিচ্ছিন্ন সিন্ধুব্যোম যায় ধূম্র তমিস্রায় ঢেকে,
বারুণী-সেবনমত্ত গ্রহতারা টলে কক্ষ থেকে॥

তব ভৈরবতা মাঝে আছে তবু প্রচ্ছন্ন আশ্বাস।
এ মূর্তি হেরিয়া তব, দাহদৈত্য পাইয়াছে ত্রাস,
তোমার যাত্রার পথে বিদলিত ধূলির বাহিনী
লুণ্ঠিতে শ্যামল ঋদ্ধি আক্রমিল যারা এ মেদিনী।

প্লাবন-উর্বরা উর্বী করে পুন গর্ভাধান-স্নান,
মুক্তাগর্ভ শুক্তিসম ভ্রূণে ধরে নব নব প্রাণ ॥

দূর কর নির্মোক-জীর্ণতা ;
তোমার নিগ্রহে পাই নবোদ্ভব সৃষ্টির বারতা।
যুগে যুগে চূর্ণ করি জীর্ণরূপ গড়ো বিশ্বভূমি,
শ্রীতারুণ্যে স্বাস্থ্যে নবকলেবর দাও তারে তুমি।
বসু-সিদ্ধ-রুদ্রগণ বিশ্বহিতে আ-নাসাগ্র ডুবে'
'সম্বর, সম্বর রোষ অম্বুরাজ' উচ্চারে ত্রিষ্টুভে।
তব ভীম তাণ্ডবের বিশ্বগ্রাসী চণ্ডিমার মাঝে,
ধ্রুবের শাশ্বতমন্ত্র কল্পশেষে বজ্রতূর্যে বাজে ॥

ভীমকান্ত রসব্রহ্মরূপ,
এ নেত্রে প্রেমোৎস রচি মোর চিত্তে করো রসকূপ
রস-সরস্বতী মোর রসনায় হোক সমাসীনা,
এই বাগ্‌যন্ত্র তার হোক রস-মূর্ছনার বীণা।
তোমার মঙ্গল-ঘটে কর মোরে নারিকেলসম
রসগর্ভ, হোক্ তায় রসালের শাখা ছন্দ মম।
নির্বাণেপ্সু জীবনের ধূপভস্ম লও বেদীমূলে
মরণের অর্ঘ্য নিও চিতাভস্মে জাহ্নবীর কূলে ॥

যৌবন-বিদায়

জানি তুমি যাবে, ধরিয়া তোমারে যায় না রাখা,
এত তাড়াতাড়ি তবু যাবে ছাড়ি ভাবিনি ভুলে।
অসীমের পানে উড়িতে গগনে মেলেছ পাখা,
অশ্রু বৃথাই করে থই থই এ আঁখি-কূলে।
শুরু করেছিনু জীবন-যাত্রা যাদের সাথে,
এখনো তারা যে নিতি নব সাজে আমোদে মাতে
শীতল ও-হাত রাখিলে সহসা আমারি হাতে,
বিদায়ের কথা একদা নিভৃতে বলিলে খুলে।
দেরি হ'য়ে গেল আয়োজনে মোর জীবন-প্রাতে,
বহু বাকী তাই, তবু আঁখি ভাই পড়িল ঢুলে॥

ঝ'রে যায় ফুল, মধুকরকুল সময় বুঝে
মৌচাক ছাড়ি একে একে দূরে উড়িয়া যায়।
কোকিলকণ্ঠে সে কাকলী আর পাই না খুঁজে,
জ্যোছনা মলয়ে এ দেহ এখন পুড়িয়া যায়।
মুখের মশানে দশনের পাঁতি পড়ে যে ঝ'রে,
তুষারে তুষারে গেল যে আমার এ শির ভ'রে,
এসেছিল ঢল, ভাটি-টানে জল আসে যে ম'রে,
আত্মা আমার দেহের নিকটে হিসাব চায়।
দেনার তাগিদে ব্যাধিরা দুয়ার নাড়ে যে জোরে,
প্রিয়ার আদরে সে মাধুরী আর মিলে না হায়॥

যাবে চলে চোর, কত কথা মোর হয়নি বলা,
কত কাজ আমি করিয়াছি শুরু, হয়নি সারা।
গেল যে সময় তন্ত্রী বাঁধিতে সাধিতে গলা,
কত গান গাওয়া হ'ল না, অগীত রহিল তারা।
কত আশা মোর মুকুলে মুদিত ফুটেনি ফুলে,
কত কল্পনা এখনো স্বপনে গোপনে বুলে।
পিয়াসা এখনো জ্বলিছে আমার কণ্ঠমূলে,
তুমি নিয়ে যাবে ভৃঙ্গারভরা পানীয় ধারা।
হরিলে শকতি, পৌরুষ, মতি কর্মফলা,
জীবনের গুরুভার শিরে এবে র'ব কি খাড়া?

কাঙালের গেহে অতিথি হইয়া পেয়েছ হেলা,
রাখিতে পারিনি তোমারে এ দেহে সগৌরবে,
মধুমাসে তব জমাতে পারিনি মোহন মেলা,
মাতিতে পারিনি প্রাণ খুলে তব রসোৎসবে।
কমলাভারতী-ইন্দ্রাণী-রতিপূজায় তব,
যোগাতে পারিনি ষোড়শোপচার নিত্য নব।
কত ছিল দাবি, তাই মনে ভাবি, কতই ক'ব?
তোমারে তুষিতে ভূষায় ভূষিতে পেরেছি কবে?
না হ'তে সময় তাই কি অতিথি ভাঙিয়া খেলা,
নিদয় হৃদয়ে এ দেহ হইতে বিদায় লবে?

দিয়াছিলে যাহা সবি আজি তাহা লইলে লুটে,
দাও নাই যাহা তাও নিলে স্নায়ুবাঁধন খুলি।
ফুল ঝরে যায়, ফল রয়ে যায় বৃন্তপুটে।
কি ফল রাখিলে ? বিফল ফুলের পরাগধূলি ?
শ্লথ বাহুপাশ ভাঙা গলা শুধু রেখেছ বাকী,
আশাহীন বুক, হাসিহীন মুখ, অরুণ আঁখি।
খাঁচাটি রাখিয়া সাথে নিয়ে গেলে প্রেমের পাখী,
রঙ নিয়ে গেলে রেখে গেলে শুধু শুষ্ক তূলী।
দেখ পিছু ফিরে এ দেহ-কুটীরে কি গেলে রাখি—
পঙ্গু লেখনী, হৃদ্‌ঘন মসী, স্মৃতির ঝুলি !

তুমি যাবে জানি মরণেরে টানি আনিয়া দিতে,
এ বিদায়ে তাই তারি আগমনী গাহিতে হয়।
তুমি এলে সব দিয়ে থুয়ে শেষে হরিয়া নিতে,
নিঃস্বের কভু বিশ্বে তো নাই দস্যু-ভয়।
তুমি চলে গেলে জীবনের সার মাধুরী হ'রে,
সে আসে আসুক তার ভয়ে আর রবো না ম'রে।
তোমার মতন একলা ফেলে সে যাবে না স'রে,
সাথে নিয়ে যাবে, জরা-যন্ত্রণা করিয়া ক্ষয় ;
তুমি দিলে জরা, নবীন জীবন সে দিবে মোরে,
তোমার মতন মরণ এমন নিঠুর নয় ॥

প্রথম চরণের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অ

আ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ঐ

ও

ক

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ছ

জ

ত

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

থ

দ

ধ

ন

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

প

ফ

ব

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ভ

ম

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

শ

স

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন [পৃষ্ঠা, চরণ ও বিশুদ্ধরূপ দেওয়া হইল]

পৃঃ ৬২, চ—১০—তৃষাহরা।

পৃঃ ২০৪—শিরোনাম—বাসন।

পৃঃ ২৭৩—শেষ চরণ—অন্তর্দ্রোহ।

পৃঃ ২৯৮—মণিকার চ—৬— কুরে কুরে।

পৃঃ ৩৭৫—চ—২—মেঘে মেঘে।

পৃঃ ১৭০, চ—১৬—আর বাদ যাইবে।

পৃঃ ২৩৯—চ—১৫—কল্লবনে। ১৯—লক্ষ্য হানে।

পৃঃ ২৯১ চ—১—অর্জিব।

পৃঃ ৩১৯—শিরোনাম—সমর্পণ।

পৃঃ ৩৯৬—চ—১৮—বারবার।